রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

কবিতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৯০
নভেম্বর ১৯৮৩

প্রকাশক
শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রাকর
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

পাণ্ডুলিপিচিত্র

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী-প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রভবন শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত-সংগ্রহ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মীগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

'কবিতা' খণ্ডত্রয় প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য

রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের সূচনায় 'সম্পাদকমণ্ডলীর নিবেদন'-এ 'সন্ধ্যাসংগীত' দিয়ে শুরু করে কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রকাশক্রম অনুযায়ী 'শেষ লেখা' পর্যন্ত 'কবিতা' খণ্ডের প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তদনুযায়ী প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যা-সংগীত' থেকে 'স্মরণ', দ্বিতীয় খণ্ডে 'শিশু' থেকে 'পরিশেষ', এবং 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষ লেখা' তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২)-এর পূর্বকালের রচনা তিনটি কাব্যগ্রন্থ কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বন-ফুল (১৮৮০) এবং শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪[১]), যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় পুনরায় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি[২], রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'পরিশিষ্ট'-এর প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরিশিষ্টের দ্বিতীয় বিভাগে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্বে রচিত, রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে অসংকলিত, সাময়িকপত্রে বিধৃত বা অপর লেখকের কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, স্বাক্ষর-যুক্ত ও স্বাক্ষরহীন আটটি কবিতা[৩] সংকলিত হয়েছে। এই আটটি কবিতার মধ্যে একটি কবিতার (প্রকৃতির খেদ) দুটি বিভিন্ন পাঠ এবং অপর একটি কবিতার (প্রলাপ) তিনটি স্বতন্ত্র অংশ আছে। এই পর্যায়ের এই আটটি কবিতা ছাড়া বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত স্বাক্ষরহীন কয়েকটি কবিতার রচয়িতা যে রবীন্দ্রনাথ, এ সিদ্ধান্তে সংশয়মুক্তভাবে উপনীত হওয়া যায় নি বলে আপাতত সেগুলি সংকলন করা গেল না। সংশয়ান্বিত কবিতাসমূহের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর ১২৮০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতভূমি", 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮১ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'র' স্বাক্ষরিত "হোক্ ভারতের জয়" এবং 'ভারতী'র ১২৮৪ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "আগমনী" উল্লেখযোগ্য।[৪]

পরিশিষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের কবিতাগুলি 'প্রথম বয়সের...কপিবুকের কবিতা' বিচারে প্রথম মুদ্রণের বানান ও যতিচিহ্ন যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

পরিশিষ্টের তৃতীয় বিভাগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত (পাণ্ডুলিপি, সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন স্বাক্ষরসংগ্রহ খাতা থেকে সংকলিত) 'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৫২),

---

[১] শৈশব সঙ্গীতের প্রকাশকাল ১৮৮৪ হলেও এর কবিতাগুলি ১৮৭৯ বা তার পূর্ববর্তীকালের রচনা ('আমার তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের')। এবং চারটি কবিতা বাদে অপরগুলি ১২৮৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে প্রকাশিত।

শৈশব সঙ্গীতের দশটি কবিতা ও গান, কিছু পরিবর্তনান্তে 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩)-র 'কৈশোরক' অংশে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছিলেন। একটি কবিতা (পথিক) কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জনান্তে প্রথম খণ্ড কাব্যগ্রন্থেও (১৩১০) 'যাত্রা' বিভাগে স্থান পেয়েছিল। শৈশব সঙ্গীতের গানগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত গীতসংগ্রহ-সমূহে সংকলিত হয়েছে।

[২] বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৩৪৭ সালে এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণা সুগভীর জেনেও 'রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়...তাহার বিচারভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না' এই যুক্তিতে সে বিচারের ভার 'ভাবীকালের উপরে' রেখে 'অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে অপরাপর কয়েকটি গ্রন্থের সঙ্গে এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

[৩] ১। অভিলাষ (দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা। স্বাক্ষরহীন), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক (১৮৭৪); ২। হিন্দুমেলায় উপহার, অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫; ৩। প্রকৃতির খেদ (স্বাক্ষরহীন), প্রতিবিম্ব, বৈশাখ ১২৮২ (প্রথম পাঠ), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১২৮২ ('বালকের রচিত', পরিবর্তিত পাঠ); ৪। জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত 'সরোজিনী' নাটক ষষ্ঠ অঙ্ক, ১৮৭৫; ৫। প্রলাপ ১-৩, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, অগ্রহায়ণ ১২৮২, মাঘ ১২৮২, বৈশাখ ১২৮৩; ৬। দিল্লী দরবার, ১৮৭৭ সালে হিন্দুমেলায় পঠিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকে ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ; ৭। হিমালয় (স্বাক্ষরহীন), ভারতী, ভাদ্র ১২৮৪, মালতী পুঁথি; ৮। অবসাদ (স্বাক্ষরহীন), বালক, চৈত্র ১২৯২, মালতী পুঁথি।

[৪] এ ছাড়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র ১২৮৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্মশানে রজনীগন্ধা" এবং 'ভারতী' ১২৮৪ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতী" কবিতাকে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে অনুমান করেন।

ছোটোদের উপযোগী সংকলনগ্রন্থ 'চিত্রবিচিত্র'র (১৩৬১) ১২টি কবিতা যা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি[৬] এবং নানা গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে সমাহৃত ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত কাব্যানুবাদ সংকলনগ্রন্থ 'রূপান্তর' (১৩৭২) অন্তর্ভুক্ত। স্বাক্ষরসংগ্রহের খাতা বা নানা উপলক্ষে রচিত শুভেচ্ছা বা আশীর্বাদ-কবিতিকা সংগ্রহ স্ফুলিঙ্গের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৩৬৭) সম্পূর্ণ হয় নি বলা বাহুল্য। এ জাতীয় রচনা এখনও নানা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে পাণ্ডুলিপি আকারে বা সাময়িকপত্রে বিধৃত রয়েছে।[৮] বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এই কবিতাসমূহ সংকলিত না হওয়ায় আপাতত স্ফুলিঙ্গের ১৩৬৭ সংস্করণভুক্ত কবিতিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা গেল। রূপান্তর পর্যায় ক্ষেত্রেও অভারতীয় ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথকৃত কাব্যানুবাদসমূহ ইতস্ততঃ মুদ্রিত হলেও বিশ্বভারতী-কর্তৃক গ্রন্থাকারে সংকলিত না হওয়ায় বর্তমান খণ্ডে সেগুলির প্রকাশ সম্ভব হল না। তবে বর্তমান রচনাবলীর প্রথম খণ্ডভুক্ত 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' অংশে এবং তৃতীয় খণ্ডভুক্ত 'পুনশ্চ' গ্রন্থে অনুরূপ কয়েকটি অনুবাদ কবিতা স্থান পেয়েছে। এই সূত্রে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় বালক রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ 'ম্যাকবেথ' অনুবাদের কথা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকদের মনে পড়বে।[৭] রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' (১৩০৬) 'নাট্য' গ্রন্থের অন্তর্গত "পতিতা" ও "ভাষা ও ছন্দ" কবিতা দুটি কবিতা খণ্ডের সম্পূর্ণতা-বিধানকল্পে পরিশিষ্টের চতুর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যে খণ্ডে 'কাহিনী' সংকলিত হবে এ কবিতা দুটি সেখানে উক্ত গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য পুনরায় মুদ্রিত হবে।

নানা স্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং বিভিন্ন শতবর্ষপূর্তি বা সংবর্ধনা, অভিনন্দন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল কবিতা রচনা করেন তার কিছু কিছু কবির মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী-কর্তৃক সংকলিত কোনো কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ ভাষণ-সংবলিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাগুলি উদ্দিষ্টগণের আবির্ভাবকালের পরম্পরায় পঞ্চম বিভাগের ক-শাখায় সংকলিত হল। এই শ্রদ্ধার্ঘ্য-গুচ্ছ এজাতীয় কবিতার সম্পূর্ণ সংকলন বলে দাবি করা যাবে না। কবিতাগুলি 'অবিস্মরণীয়' শিরোনামে সাময়িক-পত্রে এবং ১৯৬১ সালে প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রচনাবলীতে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কোনো স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, অথচ কোনো কাব্যসংকলন বা গদ্যগ্রন্থ, 'চিঠিপত্র'-এর কোনো খণ্ডের বা বিশ্বভারতী-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত আছে এরূপ ১১টি কবিতা পঞ্চম বিভাগের খ-শাখার অন্তর্ভুক্ত হল।

পরিশিষ্টের ষষ্ঠ বা শেষ বিভাগে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ইংরেজি কবিতা The Child যা গ্রন্থ বা পুস্তিকাকারে প্রচারিত হলেও দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য থাকায় বর্তমানকালের পাঠকের গোচর-বহির্ভূত রয়ে গেছে। এই কবিতাটি কবির একমাত্র না হলেও একটি প্রধান মৌলিক ইংরেজি কবিতা যা মূল রচনার (১৯৩১) অব্যবহিত পরেই কবি

---

[৬] 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাসমূহ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থভুক্ত হয়েছে : ঊষা (সহজ পাঠ ১), আমাদের পাড়া (সহজ পাঠ ১), মোতিবিল (সহজ পাঠ ১), ছোটো নদী (সহজ পাঠ ১), ফুল (সহজ পাঠ ১), সাধ (সহজ পাঠ ১), শরৎ (সহজ পাঠ ১), নতুন দেশ (সহজ পাঠ ১), স্বপন (সহজ পাঠ ১), হাট (সহজ পাঠ ২), আগমনী (সহজ পাঠ ২), ভুপু (খাপছাড়া ৪৬), ভোতন-মোহন (খাপছাড়া, সংযোজন ২), অগ্নিকাণ্ড (খাপছাড়া ৭), খাপছাড়া (খাপছাড়া, সংযোজন ৮), উল্টারাজার দেশ (খাপছাড়া ৮২-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর), খেয়ালী (প্রহাসিনী, 'খাপছাড়া' অংশ ২), বিষম বিপত্তি (প্রহাসিনী, 'খাপছাড়া' অংশ ৩), এক ছিল বাঘ (সে), সুন্দরবনের বাঘ (সে), পিয়ারি (গল্পসল্প), চলচ্চিত্র (ছড়া ৫-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর)।

[৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কাজী নজরুল ইস্‌লাম-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১২ আগস্ট ১৯২২) মুদ্রিত কবিতা (আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু), 'জয়শ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৩৯) কবিতা (বিজয়িনী নাই তব ভয়, ফাল্গুন ১৩৩৮), ১৩৩২-এর বার্ষিক মুকুল পত্রিকা (মাটি আঁকড়িয়া ধরিবারে চাই) এবং আরও কিছু বার্ষিক পত্রিকায় প্রেরিত আশীর্বাদ- কবিতা এযাবৎ রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। অসংগৃহীত কবিতা সংখ্যা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লিখিত কবিতা কয়টির মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ নয় তা বলাই বাহুল্য।

[৭] এই অনুবাদের 'ডাকিনীদের অংশ' 'ভারতী'তে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বাংলায় রূপান্তরিত করেন।* বর্তমান রচনাবলীতে কবির অপর মৌলিক ইংরেজি কবিতা বা তাঁর নিজের বা অপরের রচনার ইংরেজি অনুবাদ স্থান না পেলেও এই কবিতাটির ক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম করা হল আশা করি পাঠকবর্গ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

প্রথম খণ্ডের সূচনায় সম্পাদকমণ্ডলীর নিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এ-যাবৎ প্রকাশিত সংস্করণ-সমূহে রচনার পাঠে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা যতদূর সাধ্য নিরসন-কল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী[১] এবং তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহের শেষ সংস্করণের পাঠকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হতে থাকলে পাঠ নির্ণয়ের কাজে ব্যাপক-ভাবে পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা সম্ভব হয়। রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণের ক্ষেত্রে যেখানে পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা সম্ভব হয়েছে সেখানে পাণ্ডুলিপির পাঠ বা পূর্ববর্তী সংস্করণের পাঠ, কবি-কর্তৃক দৃষ্ট প্রুফের সাহায্যে স্পষ্টত মুদ্রণপ্রমাদ স্থলে পাঠ সংশোধনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সম্পাদকমণ্ডলীর নিবেদনে পাঠসংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উক্ত খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড থেকে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত চয়ন করা গেল :

দ্বিতীয় খণ্ড

'খেয়া' গ্রন্থের "শেষ খেয়া" কবিতার (পৃ. ১২৫) যথাক্রমে প্রথম স্তবকের পঞ্চম ছত্র এবং তৃতীয় স্তবকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের পাঠ পাণ্ডুলিপি, বঙ্গদর্শন (আষাঢ় ১৩১২) ও স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (১৩১৩) অনুযায়ী :

> 'নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা'
> 'ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না'
> 'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়'।

কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) এবং কবির জীবিতকালে মুদ্রিত 'খেয়া'র শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণের (১৩৩৫) পাঠ রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে গৃহীত। কিন্তু 'খেয়া'র "কুয়ার ধারে" কবিতার (পৃ. ১৫০) তৃতীয় ছত্রের কবির জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী পাঠ 'তুমি যখন বিদায় দিলে' স্পষ্টত মুদ্রণপ্রমাদবিচারে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী সংশোধিত হয়েছে।

'গীতাঞ্জলি'র ১০৭-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ২৫৭) দ্বিতীয় স্তবকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র ক্ষিতিমোহন সেন-সংগ্রহ মূল পাণ্ডুলিপি এবং 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র ১৩১৭) অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কবির জীবিতকালে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি'র কোনো সংস্করণে গৃহীত হয় নি। সহজেই অনুধাবন করা যায় যে ছত্র দুটি অনবধানতাবশত গ্রন্থে ভ্রষ্ট ছিল। কারণ ছত্র দুটি ব্যতিরেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে সমসংখ্যক ছত্র হয় না, কবিতাটির গঠনের বিচারে ছত্রদ্বয় বর্জন কবির অভিপ্রেত মনে হয় না।

'গীতিমাল্য'-এর ১৫-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ৩০৮) দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র ১৩১৯) 'এই তো তোমার মায়া' দৃষ্ট হলেও কবির জীবিতকালে স্বতন্ত্র গ্রন্থের সকল সংস্করণে 'এই তো আমার মায়া' পাঠ মুদ্রিত। কবি-কৃত ইংরেজি গীতাঞ্জলির (১৯১২) 71-সংখ্যক কবিতায় অনুবাদ Such is thy *maya*। 'আমার মায়া' পাঠ স্পষ্টত মুদ্রণ-প্রমাদ, বিশ্বভারতীর পরবর্তী সংস্করণ অনুযায়ী সংশোধিত। 'গীতিমাল্য'-এর ১৮-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ৩১০) দ্বাদশ ছত্রটি যে কবির জীবিতকালে অনবধানতাবশত বর্জিত ছিল তা অন্যান্য স্তবকের গঠন বিচার করলে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

'গীতালি'র ৭৫-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ৪০৩) দ্বিতীয় স্তবকের সপ্তম ছত্রের পাঠে কবির জীবিতকালে সকল সংস্করণে যে স্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদ ('লতা' স্থলে 'পাতা') ছিল, পাণ্ডুলিপি ও 'প্রবাসী'র (অগ্রহায়ণ ১৩২১) পাঠ অনুযায়ী তা বিশ্বভারতীর পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত। ১০৬-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ৪২১) তৃতীয় স্তবকের প্রথম ছত্রে স্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদ ('তার' স্থলে 'তোর'), যা প্রথমাবধি কবির জীবিতকালে, এমন-কি পরেও

---

* বাংলা কবিতাটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ ভাদ্র সংখ্যায় 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদসমং পুনর্ণবঃ' নামে মুদ্রিত। 'পুনশ্চ' গ্রন্থে "শিশুতীর্থ" নামে অন্তর্ভুক্ত।

[১] বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩৪৬) থেকে সপ্তম খণ্ড (আষাঢ় ১৩৪৮) এবং অচলিত সংগ্রহ ১ (আশ্বিন ১৩৪৭), কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দুটি পুনর্মুদ্রণও কবির জীবিতকালের মধ্যে প্রকাশিত।

দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল তা পাণ্ডুলিপির সমর্থনে সংশোধিত হয়েছে।

'বলাকা'র ৮-সংখ্যক কবিতায় (পৃ. ৪৫০) সপ্তম ছত্রের পর শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সমর্থনে কবির মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৯) নিম্নলিখিত ছত্রটি সংযোজিত হয় :

'ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।'

কবির জীবিতকালে 'বলাকা' স্বতন্ত্র গ্রন্থ বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও এই ছত্রটি তখন সংযোজিত হয় নি, সেই বিবেচনায় রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে ছত্রটি বর্জিত; ১৮-সংখ্যক কবিতায় (পৃ. ৪৬৩) অষ্টম ছত্রের পর সংযোজিত নিম্নলিখিত ছত্রটি একই কারণে রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে বর্জিত :

'চারি দিকে নেমে নেমে আসে আবরণ,'

'পূরবী'র "তপোভঙ্গ" কবিতায় (পৃ. ৬০০) দ্বিতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ছত্রে 'মঞ্জিরা' পাঠ প্রথমাবধি প্রচলিত। যদিও 'সঞ্চয়িতা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৪০) 'মন্দিরা' পাঠ দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'সঞ্চয়িতা'-ধৃত বহু কবিতার পাঠ ও স্বতন্ত্র সংস্করণ বা বিশ্বভারতী-রচনাবলী-ধৃত পাঠে প্রভেদ আছে। 'সঞ্চয়িতা' প্রথম সংস্করণ (১৩৩৮) প্রকাশকালে কবি স্বয়ং কোনো কোনো কবিতার অংশবিশেষ পরিবর্জনান্তে সম্পাদনা করেন। তবে এই বিশেষ পরিমার্জিত পাঠ 'সঞ্চয়িতা'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয় খণ্ড

'পত্রপুট' গ্রন্থের তিন-সংখ্যক কবিতাটির (পৃ. ৩৫০) পাঠ কবির জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণ (২৫ কার্তিক, ১৩৪৫) অনুযায়ী গৃহীত। এই কবিতার ৫৮ ছত্রের পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ (১৩৪৩) অনুযায়ী পাঠ 'ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী' কবির মৃত্যুর পরবর্তী সংস্করণে পুনর্গৃহীত হয় (দ্রষ্টব্য ১৩৭৪ সংস্করণ)। ৮০ ছত্রের পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী পাঠ 'বাতাসের স্পর্ধায়' কিন্তু ১৩৭৪ সংস্করণে পুনর্গৃহীত হয় নি। সেখানে জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ স্বতন্ত্র সংস্করণের (১৩৪৫) পাঠই রক্ষিত। ৮১ ছত্রের পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী পাঠ 'কল্লোলোচ্ছ্বাসে' আবার ১৩৭৪ সংস্করণে ফিরে আসে। তদ্রূপ ১০৭ ছত্রের পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণের পাঠ 'তোমার নির্মম পদপ্রান্তে' পুনর্গৃহীত হয়েছিল। 'পত্রপুট' গ্রন্থের এই কবিতা "পৃথিবী" শিরোনামে 'সঞ্চয়িতা'র (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৪৪) অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সঞ্চয়িতা'র পাঠ মূলত প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী।

'পত্রপুট' গ্রন্থের সংযোজন-অংশে এক-সংখ্যক কবিতার (পৃ. ৩৮১) ৪৫ ছত্রের পাঠ পাণ্ডুলিপি, প্রবাসী (চৈত্র ১৩৪৩), কবিতা পত্রিকা (আশ্বিন ১৩৪৪) অনুযায়ী 'যুগান্তের কবি' বর্তমান সংস্করণে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদে (*Poems* No. 102: Come, you poet of the fatal hour) এই পাঠ সমর্থিত। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠ 'এসো যুগান্তরের কবি' স্পষ্টত মুদ্রণপ্রমাদ।

'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের "ভ্রমণী" কবিতার (পৃ. ৫৩০) পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সংযোজিত। কবির জীবিতকালে 'ছড়ার ছবি'-র একটি মাত্র সংস্করণে (আশ্বিন ১৩৪৪) ছত্র দুটি ভ্রষ্ট ছিল। কবির জীবিতকালে 'ছড়ার ছবি'-র কোনো সংস্করণ না হওয়ায় এই পরিত্যক্ত ছত্র দুটি পুনঃসংযোজিত হওয়ার কোনো অবকাশ ঘটে নি মনে হয়।

'পরিশিষ্ট ৫'-এর 'আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুহৃদ্‌বরেষু' কবিতার (পৃ. ১২৯৩) একাদশ ও দ্বাবিংশ ছত্র পাণ্ডুলিপি এবং প্রবাসী (মাঘ ১৩৪২) দৃষ্টে সংশোধিত হল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠসংক্রান্ত সমস্যার বহু উল্লেখ করা যায়। বর্তমান রচনাবলীতে উপসংহারে গ্রন্থপরিচয়ে তার সবিস্তার উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে, এখানে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল। গ্রন্থপরিচয়ে মূলগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বহু কবিতার খসড়া, পাঠান্তরিত বা পরিমার্জিত রূপ উল্লেখ করা হবে, যেগুলি প্রায় স্বতন্ত্র কবিতার মর্যাদা দাবি করতে পারে।

মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
সম্পাদকমণ্ডলী

৩১ অক্টোবর ১৯৮৩

পুনশ্চ

উৎসর্গ

নীতু

ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।

২ আশ্বিন ১৩৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ওইখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিনরাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।

অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন,
এ দুইয়েই তার শোভা,
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,

যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই ক'রে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে ক'রে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি।
অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।

উর্বশী বললেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্ত্যকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্ত্যের।
তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্ত্যের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।

ভালো হয়েছে আমার লেখা।
ভালো হয়েছে, কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে।

কেন, দোষ হয়েছে কী।
সত্য কথাই বেরিয়েছে কলমের মুখে।
আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে—
বলছ, ভালো যে হয়েইছে জানলে কী করে।
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এক কালের ভালোটা
হয়তো হবে না অন্য কালের ভালো।
তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি
ভালো হয়েছে।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি, খুব ভালো।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা,
সেইজন্যেই, দোহাই তোমার,
অসংকোচে বলতে দাও আজকের মতো
এ লেখা হয়েছে ভালো।

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ বর্ষণে চার দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।

ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চল্‌তি কালের চাঞ্চল্য।

৯ ভাদ্র ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনাবেচা,
তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে—
তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরে নি।
তার পর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে;
কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না, সেও কত লোক—
সে কালের দিন হল সারা।

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে,
দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই-না কেন সামনের দিকে চেয়ে।
সেদিনকার উদ্‌বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।

দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।
তার পর শেষ দিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা।

তাই প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
এ কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,
তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়—
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আস নি তুমি—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ওই বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

তাই ফিরে আসতে হল আর-একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার'
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশ জনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে—
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

যেন গর্ব করে বলতে পার'
আমি তোমাদেরও বটে,
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে,
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।

তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

১ ভাদ্র ১৩৩১

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতাল-পাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক-দেখাবার ব্যাকুলতা।
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে,
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়;
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়,
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি-সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায় হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য;
ক্রন্দিত আকাশের নীচে ওই ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিনু বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্ ঝির্ ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপনমনে একলা।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ওই আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ও পার থেকে—
তার পরে?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ওই বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু।

রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।

৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে,
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা
সেইটেই পড়ে রইল পিছনে।

নিশীথরাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ব-বেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে,
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।
মনে করো একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটিমাত্র নীলকান্তমণি—
তাকে কি দেখতে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।
বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।
মন বলছে নিশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম—কী হবে ব'লে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা
আরাম-কেদারায় ব'সে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস।

১০ ভাদ্র ১৩৩৯

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টলটল করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কল্‌মি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ও পারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঁঠাতে,
ঘন্টার পর ঘন্টা যায় কেটে।

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবি লেবুর পাতা।
চেয়ে দেখি আর মনে হয়
এ যেন আর কোনো-একটা দিনের আবছায়া;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

শ্রাবণ ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ কর তুমি।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে দুষ্টু ব'লে দেখি,
দোষী ব'লে দেখি নে—
রাগও করি ওর 'পরে
ভালোও লাগে ওকে,
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো।

এক-একজন মানুষ অমন থাকে—
সে লোক নেহাত মন্দ নয়,
সেইজন্যেই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে;

তার দোষ স্তূপে বেশি,
ভারে বেশি নয়—
তাই দেখতে যতটা লাগে,
গায়ে লাগে না তত।
মনটা ওর হালকা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হূহু করে চলে যায় ভেসে;
ভালোই বলো আর মন্দই বলো
জমতে দেয় না বেশিক্ষণ—
এ-পারের বোঝা ও-পারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে;
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ।

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায়।
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি।
ওকে তুমি বল নিন্দুক—তা সত্য।
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়–
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে ব'লে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে ব'লে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা,
ও হল নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা ওর বুদ্ধি আছে, নেই বিবেচনা।
তাই ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে,
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারী,
সয় না বেশিক্ষণ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে।

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাসে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো,
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে,

সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া।
হেডমাস্টার দিলেন ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে,
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক।
তাঁর ভাবগতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার,
যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।

তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে—
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ ব'লে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখ দূরে ব'সে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে।
আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো ক'রে।
সাজা দিই, নির্বাসন দিই নে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে।

ভাদ্র ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল,
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও
মনে আনতে বাধে না।
পাখা কোথায়,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইমটেবিলটা,
এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
থার্মোমিটারে।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে।

বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধু ধু করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে,
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা—
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিট্‌ঠি?
হাত উলটিয়ে বলি, নাঃ।
ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল—
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন।
এ দিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা,
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।

মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ ক'রে।
মনে আনবার অনেক দিন-ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ন হয়ে;
তারি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে
কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়
অশ্রুত মূলতানে।
তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখি,
ছেলেটা ইস্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধ'রে
পুকুরের ধারে,
ঘাটের উপর একলা ব'সে,
সমস্ত বিকেল বেলাটা।
তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুরচির ফুল ঝরে তার ধুলোয়;

বাতাবিলেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি,
শজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটীরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে—
গাইতে বলি নে তাকে।
স্বামীটি তার লোক ভালো,
আমার লেখা ভালোবাসে—
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে।
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে।

আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির খেত।
বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন গুন গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ও পারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন—
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি,
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব-কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে।

বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুন গাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়াল মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সংকেত।
এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামল থম্‌থমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো,
ধৈর্য থাকে না তালের পাতায় বাঁশের ডালে।
একটু পরেই পালা হল শেষ
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

৪ ভাদ্র ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপেগাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝলমলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।
জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এ রকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।
তেমনি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন,
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুকনো ধুলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না।
এক ধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।

দূরে রান্নাঘরের চার ধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে।
আমাদের টেড়ি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে,
ঘেউ ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের পায়ে-দলা গরিব ধুলোর 'পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে,
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

সেবার বসন্ত এল।
কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণসাগরতীরের নবীন আগন্তুককে।
সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে এই—
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে।

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে বেগনি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা,
যতই ঝরে, ততই ফোটে,
হাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় ক'রে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

৫ ভাদ্র ১৩৩৯

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলতে হেসে, মানে কী।
মানে কিছুই যায় না বোঝা, সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা।
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে।
চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার,
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে—
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মীড়।

১৩ ভাদ্র ১৩৩৯

বিচ্ছেদ

আজ এই বাদলার দিন,
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
সময়ে যেন স্রোত নেই,
চার দিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর।

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পূবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বু-বনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে—
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে
মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ।

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।
অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে শহর।
তারি দূর কিনারায় নির্জনে
দিনের তাপ আগলে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারি দিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে।
ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।
মেঝের উপর হলদে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুক-ধারী বাঘ-মারা শিকারীর মূর্তি।
উত্তর দিকে সিসুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদা মাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো
খররৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়নির মতো।
সামনের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের খেত,
দূরে ঝক্‌মক্‌ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা নৌকো
কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রুপোর কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গির্‌ধারী দরোয়ান অনেকখন ধরে তার পাশে বসে আছে,
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকু-ধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

অপরাহ্নে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
তাপে কৃশ পান্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।
নীল রঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশোনো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।

আমার প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা।
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক—
পরের ঘরে মানুষ,
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি,
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।

লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে,
তলায় পাতা ছড়িয়ে শ্যাওলাগ্নলো দ্নলতে থাকে,
মাছগ্নলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।
ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে,
ওই সব্জ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
কী আছে দেখিই-না, সব তাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে খাবি খেয়ে তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোর্,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে,
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফ্নল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে.
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারি মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথীকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।'
ভারি ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথী রাজি হয় না,
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে ল্নকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।
বাড়ির লোকে বলে, লজ্জা করে না বাঁদর?
কেন লজ্জা।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝ্নড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে,
লজ্জা করে না?

একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, দেখ্-না ভিতর বাগে।

দেখল নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, 'দে-না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে,
আর দেব আমের কষির বাঁশি।'
দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই,
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
চুরি করলি কেন।
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
'ও কেন দিল না।'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ ক'রে,
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে—
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি,
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায়।
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া—
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।

আর সেই সঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।

একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াল,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা,
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগ্নে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানি।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্য এই গয়লানি মাসির 'পরে।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
দেখি-না কী হয়, তারই বিবিধরকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানির স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ওই ছেলেটারই।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর।'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,

তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি।'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সহযাত্রী

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুর্‌ফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো আনা অংশীদার।
কপালটা মস্ত—
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু।
দাড়িগোঁফ-কামানো মুখে .
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা।

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আলপিন টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়—
তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা;
পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে.
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি; .
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।
আহারে অত্যন্ত সাবধান,
পকেটে থাকে হজ্‌মি গুঁড়ো
খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে,
খাওয়ার শেষে খায় হজ্‌মি বড়ি।

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে,
যা বলে মনে হয় বোকার মতো।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্‌স্‌ বলে
বুঝিয়ে বলে অনেক ক'রে—
ও থাকে চুপচাপ, কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না।

চলেছি একসঙ্গে সাত দিন এক জাহাজে।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর 'পরে,
ওকে ব্যঙ্গ ক'রে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেছে কেবলই,
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলছে সবাই।
বিধির রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে,
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে।
সবাই ঠিক করে রেখেছে ও দালাল,
কেউ বা বলে রবারের কুঠির মেঝো ম্যানেজার;
বাজি রাখা চলছে আন্দাজ নিয়ে।

সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।
চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায়,
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে,
বলে কৃপণ, বলে ছোটোলোক।

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে।
তারা কয় তাদের ভাষায়,
ও বলে কী ভাষা কে জানে,
বোধ করি ওলন্দাজি।
সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয়
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্প বয়সের ছেলে,
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপ্‌ছিপে গড়ন—
ও তাকে এনে দেয় আপেল কমলালেবু,
তাকে দেখায় ছবির বই।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে।

জাহাজ এল শিঙাপুরে।
খালাসিদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট।
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।
কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়্‌বড়্‌ করে নেমে গেল ঘাটে।

তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি;
যারা চুরোট ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
হায় হায় করে উঠল তাদের মন।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি;
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।
তার সম্মুখে লজ্জা দিয়ো না—
আমার ক্ষতি, আমার কথা
তার সম্মুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।
দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায়;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে;

সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে;
এক প্লাবনে থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।
অমলির ঘরে ঢুকতে পারি নি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে,
তাই খুললেম ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি,
শেলফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।

একটা অ্যালবাম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা, খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে নানা রকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।
চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।
শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীত কালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে,
ও বুঝি বাঁচবে না বেশি দিন।
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হত না ওকে সঙ্গছাড়া করি।
কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে—
বললে, 'মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি—
মূর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।'
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বললেম, 'কালই দেব ভর্তি করে বেথুনে।'

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে,
বললে, 'এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।'
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভ'রে
যেতে দিলেম বলে।

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়,
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি—
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে।

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে'।
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯

বালক

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ওই দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এ দিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল,
খায় যত ছড়ায় তার বেশি।
দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার,
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই,
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ্‌ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,
বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে,
সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।
আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন-বাদাড় খাল-বিল তারই,
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা।
জামবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা,
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে,
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড়।
ধোবাদের গাধাটা আছে কাজের গরজে,
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই,
যাই বলুন-না জজসাহেব।
বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলা;
সর্দার পোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়।
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ,
হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে।

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।

তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মিলল না আমার জায়গা।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির
কোণের ঘরে;
বাইরে যাওয়া মানা।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন গুন ক'রে গায় মধুকানের গান।
শান-বাঁধানো মেজে, খড়্‌খড়ে-দেওয়া জানলা।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে।

প্রহরের পর কাটে প্রহর।
আকাশে ওড়ে চিল,
থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়ওয়ালা,
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।
পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।
শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আন্‌ত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।
ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠত দুলে।
বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল-ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল

সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পূব দিকের ও পার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথী পাতালে।

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম।
একে একে
পুকুরের পৈঁঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।
উঠোনে একহাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়ছে জল মোটা ধারায়।
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানলায়,
পুকুর গেছে ভেসে;
জল বেরিয়ে চলেছে কল্‌কল্‌ করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেছে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারই মতো বাঁধা,
এ-বেলা ও-বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো,
পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়া-পরা বাউল যেন।
পুকুরের কোণে নৌকোটি
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে,
গলির থেকে সদর রাস্তায়,
তার পরে কোথায় জানি নে। বসে বসে ভাবি।

বেলা বাড়ে।
দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,
তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা।
সন্ধে হয়ে এল।
বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,
ঘরে জ্বলেছে কাঁচের সেজে মিট্‌মিটে শিখা,
ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়
দুলছে নারকেলের ডাল,
ভূতের ইশারা যেন।

গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,
আলো মিট্‌মিট্‌ করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো।
তার পরে কখন আসে ঘুম,
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুত রাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে,
ছাতিম গাছের থেকে মালতীলতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল।
আর সেদিনকার আমারই মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন,
'কী করছিস সুনি,
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায়।'

সুনুর ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ,
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে লাল শতরঞ্চে
শাড়ি শেমিজ ব্লাউজ
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে,
ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন.

ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও।
ছোটো বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।
চুল বাঁধা হয় নি,
চোখ দুটি রাঙা, কান্নার অবসানে।

চুপ করে রইল সুনৃতা,
মুখ নিচু করে সে কাপড় গোছায়—
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বললেন,
'সুনি, কোথাও যাবি নাকি।'
সুনৃতা শক্ত করে বললে, 'তুমি তো বলেইছ,
এ বাড়িতে হতে পারবে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অনুদের বাসায়।'
শমিতা বললে, 'ছি ছি দিদি, কী বলছ।'
বাবা বললেন, 'ওরা যে মানে না আমাদের মত।'
'তবু ওদের মতই যে আমাকে মানতে হবে চিরদিন—
এই বলে সুনি সেফ্‌টিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সংকল্প অবিচলিত।
বাবা বললেন, 'অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।'
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা,
'চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।'
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে,
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে,
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার।
শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে,
ও বললে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি,
শমিতা পথ আগলিয়ে বললে,
'কক্‌খনো যেতে পারবে না বাবা,
ও না খায় তো নেই খেল।'

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে,
এসেছে অনুদের গাড়ি।

তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচটা লাগাচ্ছে যখন কাঁধে,
শমি এসে বললে, 'এই নাও তাদের চিঠি।'
ব'লে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে—
'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—'

বাজল একটা।
সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।
রামচরিত বললে এসে,
'মোটর দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষণ।'
সুনি বললে, 'যেতে বলে দে।'
কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।
বাবা বুঝলেন,
প্রশ্ন করলেন না,
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
'চল্ সুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে।'

কাল বিয়ের দিন।
অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে।
মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, 'থাক্-না।'
বাপ বললে, 'পাগল নাকি।'
ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্ছে বাড়িতে,
সমস্ত দিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।

তখন সন্ধ্যা সাতটা।
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির একতলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
কৈলেস সরকার,
আর তালপাতার পাখায় বাতাস চলছে ডান হাতে;
বেহারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।
কালিমাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ করা।
জ্বলছে একটা কেরোসিন লণ্ঠন।
হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়াল
শিথিল কাছাকোঁচা সামলিয়ে।

অনিল বললে,
'পার্বণীটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেছি দিতে।'
তার পরে বাধো বাধো গলায় বললে,
'অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনীদিদির ঘরটা।'
গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির,
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নীচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে;
দেখলে ঝুড়ি-ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে
শুকনো প্যান্সি আর ভায়োলেট।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৯

কীটের সংসার

এক দিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
আর-এক দিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল মাটির কণা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা।
যাই আসি, তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেছে
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ওই কীটের সংসার।

ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন,
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি,
শব্দ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত
চেতন্যধারার,
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।
গুন গুন সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,
এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ওই মাকড়সার বিশ্বচরাচরে,
ওই পিঁপড়ে-সমাজে।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা?

আমি মানুষ,
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।
কিন্তু ওই মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ওই পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে.
দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।

২৪ ভাদ্র ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা।
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা,
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না।

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্‌
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্‌ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি একটা-কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো-একজন গুন্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়।
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে।
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাই নে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।
এমন সময়ে সে এক মোটা চুরট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, 'ফেলো চুরট।'
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরট রাস্তায়।

হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকাল কট্‌মট্‌ ক'রে,
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়,
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, 'বেশ করেছেন মশায়।'
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,
তৃতীয় দিনে দেখি
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম, ভুল শোধরাতে হবে।

খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে,
গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল আসবে না এবার।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বললে, 'তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে।'
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।

ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায় রে ভাগ্যের খেলা।

যেদিন নেমে আসব তার দুদিন আগে তনুকা বললে,
'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—
একটি ফুলের গাছ।'
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বললে, 'দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।'
জিগেস করলেম, 'নামটা কী?'
সে বললে 'ক্যামেলিয়া'।
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।'
তনুকা কী বুঝলে জানি নে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুশিও হল।

চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্‌ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল পরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে—
বায়ুবদলের বায়ু-গ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল-বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।
অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ও পারে,
সেখানে সিসুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করছে এরা।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না।

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট্‌-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরট খাচ্ছে।
আর কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি।
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল পরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর।

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।

তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এল, 'বাবু ডেকেছিস কেনে।'
বেরিয়ে এসে দেখি, ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এই জন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তার পরে ওই রোজ সকালে দেখি—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।
উঠে আসে আমার বারান্দায়
নেচে নেচে করে সে পায়চারি,
আমার 'পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।
সমাজের কোন্ শাসনে নির্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছু দূরেই শালিখগুলো
করছে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষ গাছের ডালে ডালে,
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।
সকালবেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে
ঝরে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারাবেলা।
কারো উপর নালিশ কিছু আছে
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিংবা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

কিন্তু ওকে দেখি নি তো সন্ধেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে
ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝর্‌ঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।

২১ ভাদ্র ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।
আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্‌
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, না-হয় তাই হল,
না-হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই:
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লন্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে:
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম.এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ওইখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।

সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান্‌ যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক-না,
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে!
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি,
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

ভাদ্রমাসের সকাল বেলা,
পাতলা মেঘের ঝাপসা রোদ্দুর;
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা ক'রে বইছে আমলকীর কচি ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষ রেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকাল বেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায়;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে,
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।

একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ,
দেউলের আঙিনা পূজারীদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী ক'রে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী ক'রে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়—
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়,
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে ঢাকা পাল্কিতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিংকরের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়,
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপ তণ্ডুল।
থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি,
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।

কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পুজো,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব।
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি।

শুক্ল ত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।
আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।
বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু গুরু গুরু গুরু।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতি বাঁধা ছিল
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চার দিকে
যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ।
তুফান উঠল মাটিতে,
ছুটল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়,
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরম জল—
ভীম সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং।
আচম্‌কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌দিক যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়াল,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।
রাজা বললেন, 'সংস্কার করো।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।'
কিরাত-দলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ,
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয়-সংস্কার হয় না।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ওই কৃপা'
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না,
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো,
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ।'

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।

কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।'

মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে, উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'
ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল,
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল, পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশীর চাঁদের আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েছে গায়ে গায়ে,
রোজ সকালে সূর্য-আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেছে
এই তো এসেছি।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

কখন যে কোন্ কুলগ্নে ওই
সংশয়হীন অবোধ চামেলি

কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লিবাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারে নি যে ওরা জাত আলাদা।
শ্রাবণমাসের অবসানে আকাশকোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না;
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল।

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল,
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙাল চামেলিটার স্পর্ধা দেখে—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়াল কেন।
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁক্‌শি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ওই জাত আলাদা।

২৩ ভাদ্র ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।
পকেটে নেই টাকা,
উদ্‌বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে

অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই,
মাথা উঁচু
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতি মুহূর্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না পিছন ফিরে,
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলাধুলো হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হুহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হালকা মনে।
ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ
অভয় অসংকোচ—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়।
দেশের মানুষ এসেছে তার আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা-খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে,
যেখানে তার খুশি।
সে ছবি কেউ দেখে কিংবা নাই দেখে,
ভালো বলে নাই বলে
খেয়াল কিছুই নেই।
দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে ওই
যাচ্ছে চলে,
দুই টুকরো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো,
ওরা মানুষ,
ছুটি ওদের সকল দেশে সকল কালে,
কর্ম ওদের সবখানে,
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব-কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আটকা পড়ে না সে।

সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

আয়োজন

কাছে এল পুজোর ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্‌শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়
ছবি দেখে আপন মনে,
কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাট
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে তিসির খেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকেবেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্‌স্‌ ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্‌ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায় জড়ানো শাঁখা,
দিল্লির কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড়, না মাদুরা,
না ড্যালহৌসি কিংবা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।

আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা ক'রে;
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি শেষদিন ঠেকেছে শেষের শীর্ণক্ষণে।
আছে ব'লে যত-কিছু
রয়েছে দেশে কালে,
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত
দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, চিত্তে চিত্তে;
যত গ্রহ নক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকালসমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।
এক পা তখনো আছে সেই প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েছি রেখার ও ধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
নিয়ে দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো অন্ধকারে গাঁথা।

অসীমের অসংখ্য যা-কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে;
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাত না নিখিল তরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানা ঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারী তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ম নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে

পুজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে, 'মারো মারো।'
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

১১ শ্রাবণ ১৩৩৯

শিশুতীর্থ

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে;
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদারণের রলরোল।
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।

কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, 'ভাই তুমি কোথায়।'
উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে, 'এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।'
বলে, 'মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।'

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।

শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে,
সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

৪

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারী চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে;
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যা চলেছে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী,
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না—কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।

তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়

এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে।'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।'

৮

তরুণের দল ডাক দিল, 'চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভান্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল।
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,

'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'
তরুণ বলে, 'থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথী, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

৯

প্রত্যুষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্‌ জ্যোতিষী বললে, 'বন্ধু, আমরা এসেছি
পথের দুই ধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, 'নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।'
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,
'মাতা, দ্বার খোলো।'

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, 'মাতা, দ্বার খোলো।'
দ্বার খুলে গেল।

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,
'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।'
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, 'জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।'

াবণ ১৩৩৮

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধার রাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল,
বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।'
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্ত্যে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।
একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।
সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বললে,
'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।
নির্বাণ-দীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'
রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে
তার মর্ত্যদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে,
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে,
বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'
রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'
মহিষী বললে, 'প্রিয়-প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে।
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।
রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদ-শিখর থেকে চেয়ে দেখো।'
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল,
বললে, 'চিনব কী করে।'
রাজা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো;
সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, 'দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরু-শ্রেণীতে
বসন্ত বাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর।
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।'
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, 'ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরু-নীরস কালো মর্ত্যের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।'
'না মহারাজ, না' বলে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁয়া লাগল।
বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে।'
'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'
এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।
রাজা তার হাত ধরলে,
বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।'
ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে,
'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে।
ওই শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয়-মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।'
রাজা বললে, 'তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।'
দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
'কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা,'
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।
গেল বহুদূরে,
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে

তাকে চোখে দেখে না তাকে হৃদয়ে দেখা যায়,
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার মূর্তি।
এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে।
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।
বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।
একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়াল।
নীচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্মি-দোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।
গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মীড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে,
ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।
কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো।
কেমন করে হবে।
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাতসমুদ্রপারে রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে।
আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ওই যে বাজে বীণায় কানাড়া।

রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'
পথের শুক্‌নো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়াল।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূরে গুরু গুরু ধ্বনির মতো।
'আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল।'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

পৌষ ১৩৩৮

ছুটি

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ওই শিরীষবনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ওই সুদূরতা,
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে;
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে,
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদলরাতে।
যেখানে এই মন
গোরু-চরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে।
কেউ বা এসে প্রহরখানেক
বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউ বা বাজায় বাঁশি,
নববধূর পাল্কিখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই পহরে;
কৃষ্ণ একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে

চাঁদের শীর্ণ আলো।
যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে;
ধরে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে-রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখি,
মিলন-বেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হল।
আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে,
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে বনের থেকে বনে।
গানের মূর্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা-
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়।

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।
বিপুল হয়ে উঠেছে সে
দেশে দেশে কালে কালে।
মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্পস্বর্গলোকে।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।

দূরে দূরে কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।
প্রাণের রসে শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে,
পুলকিত ফুলের উল্লাসে;
নব নব ঋতুর মায়া-তুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে,
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো
সেই নিভৃতে অনায়াসে হাল্কা পাখায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা—
সেই আমাদের গান।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের ’পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

পূব আকাশের শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে,
বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।

তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোয়া রোদে।
বাজল রে আজ বাজল রে তার
ঘর-ছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগে চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য ক'রে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায় নি আরাম, পায় নি বিরাম,
চায় নি পিছন ফিরে;
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ওই উড়েছে শরৎ প্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে,
যেখানে ওই কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

১ আশ্বিন ১৩৩৯

সংযোজন

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল,
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ,
ফিকে সবুজের 'পরে ফুলকাটা সোনালি রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালখ,
কাল হবে অধিবাস, পর্শু হবে বিয়ে।

সন্ধে হল।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল কোথা গেল।
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা ক'রে আছে ব্যাঙ্গমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে।'

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা,
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধ'রে।
ভোর হল, এল চিত্রকূটগিরি,
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, 'হানাসান, কোথা হানাসান,
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।'

নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।'
মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কিরকম।'
কালো মেঘ ভেসে এল
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরু গুরু
বলে, ওই চেয়ে দেখো, হানাসান হল নানাখানা—
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।'

মণি বলে, 'ব্যাঙ্গমা দাদা,
এ দিকে বিয়ে যে ঠিক—
বর এসে কী বলবে শেষে।'
ব্যাঙ্গমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'
মণি কেঁদে বলে, 'তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।'
ব্যাঙ্গমা বলে, 'মণিদিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি-ধোয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন,
কতমতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা, এনামেল-করা।
কাঁচি ছুরি গালা লাল ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে।

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।
লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি,
ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে;
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি।

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তারে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যত-কিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,
তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি
পঁচিশের কাছাকাছি।
তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—
‘ক্ষান্তপিসি’, তার পরে ‘পঞ্চুর মৌতাত’।
তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বের হল
‘রক্তের আঁচড়’।
হুলুস্থুলু পড়ে গেল দেশে।
কলেজের সাহিত্যসভায়
সেদিন বলেছিলেম বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,
তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।
আমাকে খ্যাপাতো দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।
কলেজের পালা-শেষে
করেছি ডেপুটিগিরি,
ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।
তার পর থেকে, যা আমার
সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল—
বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।
কাছে পেয়ে কোনোদিন
তোমাকে করি নি খাটো—
ছোটো বড়ো নানা ত্রুটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে
তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি।
এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, সেও যে তোমারি কাছে শেখা।
দোষে ভরা অসামান্য প্রাণ,
সে চরিত্র-রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদি তোমার
সে তো আমি জানি।

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলই,
বলেছিলে, ‘লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্ম অবিশ্বাসে শুধু আটকে পড়েছ
পড়ুয়ার নীচের বেঞ্চিতে।’
শেষকালে বহু ইতস্তত ক'রে
লেখা করলেম শুরু।

বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পানুতিঘাটায়।
আসামি পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতকা।
মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল

প্রাণ হাতে ক'রে।
খুড়ো গেল পুলিসে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনীর ঘরে।
যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনী।
জেলেনীকে দিতে হল জেলে,
খুড়ো হল সাব্‌রেজিস্ট্রার।

গল্পখানা পড়ে
বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।
খাতাখানা নিজে নিয়ে
শম্ভু সান্ডেলের ঘরে
বলে এলে, কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
বের হল মাসে মাসে।
শুক্‌নো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
বাঁশরিতে লিখে দিল,
কোথা লাগে আশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে।
শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ,
এত দিনে বাংলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি'
এবার হাস নি তুমি।
তার পর থেকে
তোমার আমার মাঝখানে
খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল।
এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঁদুরই পলিমাটি-'পরে
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা।
স্টুপিড জানে না—
মূল এর বেশি দূর নয়,
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
তোমার যে পঞ্চু সে তো বাংলার ডন্‌কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
আমার এ কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—

বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো
আমার লেখার দগ্ধশেষ।
আজ বাদে কাল হত ধুলো,
আজ হোক ছাই।

২৪ আষাঢ় ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন্‌ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,

কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
ল্যাজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাস্টার দিতেন কানমলা।

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ-মহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বলতেম, 'দেখ্ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল,
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বার বার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ, নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগান-মহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম,
ওরি মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা—
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ্ জোরে—
একটু ফলে নি তাতে ফল।
কানমলা যত দিই
পাতাগুলো ম'লে ম'লে
ততই উন্নতি তার কমে।

ইদিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া শুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কলকাতা গিয়ে।

বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।
বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নব বসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান্‌।
পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপ্‌টুপে,
ঝুপ্‌ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ—
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল,
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার!
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরই মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গসুচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হল 'পাতিহাঁস'।
শেষকালে হল 'হাঁসখালি'।
কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা।

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রুপসূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর।

একদিন মুক্তি পেল সে বেচারা,
বেরোল ইস্কুল থেকে।
তার পরে গেল বহুদিন—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সংকোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা,
তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

সে কথা জানত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহংকারে;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে,
হেসে যেত খলখল হাসি।

বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না—
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হত তার সুরের সাধনা।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি. এ.
গণিতে সে এম. এ. দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপ্‌ছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নীচে
চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা—
দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে।
তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সংকোচ।

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি.
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি.
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই-যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে।
হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
'উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।'
লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না।

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে;

থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে কাঁচের সার্শিতে;
বারান্দার টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁই ফুল;
হাঁটুজল জমেছে রাস্তায়,
তারি 'পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।
দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝংকারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান—
নটমল্লারের সুরে,
'আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে।'
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে।
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

সন্ধ্যা হল।
বৃষ্টি থেমে গেছে;
জ্বলেছে পথের বাতি।
পাশের বাড়িতে
কোন্‌ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
'কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি।'
মাংসল পৃথুল দেহ বটেকৃষ্ট স্ফীতরক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে,
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর করে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল, 'চুপ'—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

তীর্থযাত্রী

টি. এস. এলিয়ট-এর The Journey of the Magi নামক কবিতার অনুবাদ

কন্‌কনে ঠান্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে-ক্ষত, পায়ে-ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এ দিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা, নগরীতে সন্দেহ,
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম চলব সারারাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি।

ভোরের দিকে এলেম, যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে;
সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা।
বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।
মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো—
এই লিখে রাখো—এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।

জন্ম একটা হয়েছিল বটে—
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর—
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে,
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[মাঘ ১৩৩৯]

চিররূপের বাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া,
সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।
উঠল ধ্বনি, খোলো দ্বার।
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগল।
কম্পিতকণ্ঠে বললে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এল, আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।
ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠল দ্বারের শিকল,
থরথর কাঁপল প্রাচীর,
হায়-হায় করে ঘরের হাওয়া।
নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌ আঘাতে
খান্‌খান্‌ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বললে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি?
দূত বললে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ, বললে,
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝংকার,
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে,
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,

ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে?
দূত বললে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এল।
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বললে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও।
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন?
দূত বিদ্রূপ করে বললে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ,
এর মধ্যে বাহুল্য আছে কোথায়?
প্রাণ বললে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠল দূত, বললে,
যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বললে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোক-উৎসের তীর্থে।
বললে জোড়হাত করে—
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ,
তোমার সৃষ্টির অপমান।
তোমার রূপকে লুপ্ত করে সে কোন্ অধিকারে,
আমাকে কাঁদায় কার অভিশাপে।
মন বসল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর, প্রাণের কান্না থামে না।
পথে পথে বাটপাড়ি,
রূপ চুরি যায় নিমেষে নিমেষে।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত—
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যে দান করেছ নিজহাতে, জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

যুগের পর যুগ গেল; নেমে এল আকাশবাণী—
মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।
রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারি দিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামে না।
আরো কী চাই।

প্রাণ জোড়হাত করে বলে—
মাটির দূত আসে, নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়,
বলে, কণ্ঠনালী আমার।
শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।
উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহংকার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে বাণী অমৃতের বাহন, তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ।

শোনা গেল আকাশ থেকে—
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা।
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্ত্যলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর,
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ,
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব,
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে,
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।'
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'—
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!'
রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'
তখন রাত্রি তিন প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন,
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে, শুনতে পেলেন,
'সময় হয়েছে ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।'

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।'

গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সংকার।'

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম,
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

১৭ নভেম্বর ১৯৩২

রঙরেজিনী

শংকরলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো,
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে,
ফেলে তাকে ধুলোয়।
রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।

আহ্বান স্বীকার করেছেন শংকর
এমন সময় চোখে পড়ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রঙরেজির ঘরে।

কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আশমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শংকর বললেন, 'জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েছে।'
কুল্ কুল্ করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুমফুলের খেতে।
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে।
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ—
'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে'।
বসে বসে ভাবল অনেক ক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে।
রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল—
'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'।

দুদিন গেল কেটে।
শংকর এল রঙরেজির ঘরে।
শুধাল, 'পাগড়িতে কার হাতের লেখা?'
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম করে বললে, 'পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষি।

চলে যাও রাজসভায়
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।'
শংকর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
'রঙরেজিনী,
অহংকারের পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'

বরানগর
২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে।
কীর্তনী এসেছে গ্রামের থেকে,
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুল গাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে,
'ঠাকুর, তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।'
রাত তখন দুই প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা।

কীর্তনী গাইছে,
'তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা,
এই ছিল প্রত্যাশা।'

আরতি হয়ে গেছে সারা,
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে।
কীর্তনী আপন মনে গাইছে,
'প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে।

তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে ব'লে।'
সেই পিপুলতলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্তনী,
আর শুনছিল আরেকজনা গোপনে—
বাজিরাও পেশোয়া।

শুনছিল সে—
'তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে।
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়-মাঝে।
থাক্‌ গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দীশালায়
অহংকারের কাঁটার বেড়া ঘেরা।'

রাত্রি প্রভাত হল।
শুকতারা অরুণ আলোয় উদাসী।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে।
অভিষেকের স্নান হবে
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে।

রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য।
জ্বলছে দীপশিখা,
পুজোর উপচার পড়ে আছে,
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে।

১৪ মাঘ ১৩৩৯

প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধুলায় ঠেকালো মাথা।
রামানন্দ শুধালেন, 'বন্ধু কে তুমি।'

উত্তর পেলেন, 'আমি শুক্‌নো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙ-বেরঙের ফুলে।'
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া।

চিতোরের রানী, ঝালি তাঁর নাম।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস।
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝ'রে।
মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে।
রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী।

স্মৃতিশিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত,
বললে, 'ধিক্ মহারানী, ধিক্।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে!
ব্রাহ্মণের হেঁট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার।'

রানী বললেন, 'ঠাকুর শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।'

২৪ পৌষ ১৩৩৯

স্নান সমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্‌ করে।
রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বলছেন,
'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ও পারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধাল, 'বিলম্ব কেন প্রভু,
পুজোর সময় যায় বয়ে।'
রামানন্দ উত্তর করলেন,
'শুচি হয় নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।'
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা।

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চললেন বনঝাউ ভেঙে
গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধাল, 'কোথায় যাও প্রভু,
ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।'
গুরু বললেন, 'চলেছি স্নান সমাপনের পথে।'

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানরদলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।

আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।
শিষ্য বললে, 'রাম, রাম।'
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

ভাজন লুটিয়ে পড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
'কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'
রামানন্দ বললেন,
'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল,
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি,
তবু আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে -
মন্দিরে আর হবে না যেতে।'

নেত্রকোণা [বরানগর]
১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯

বিচিত্রিতা

বিচিত্রা
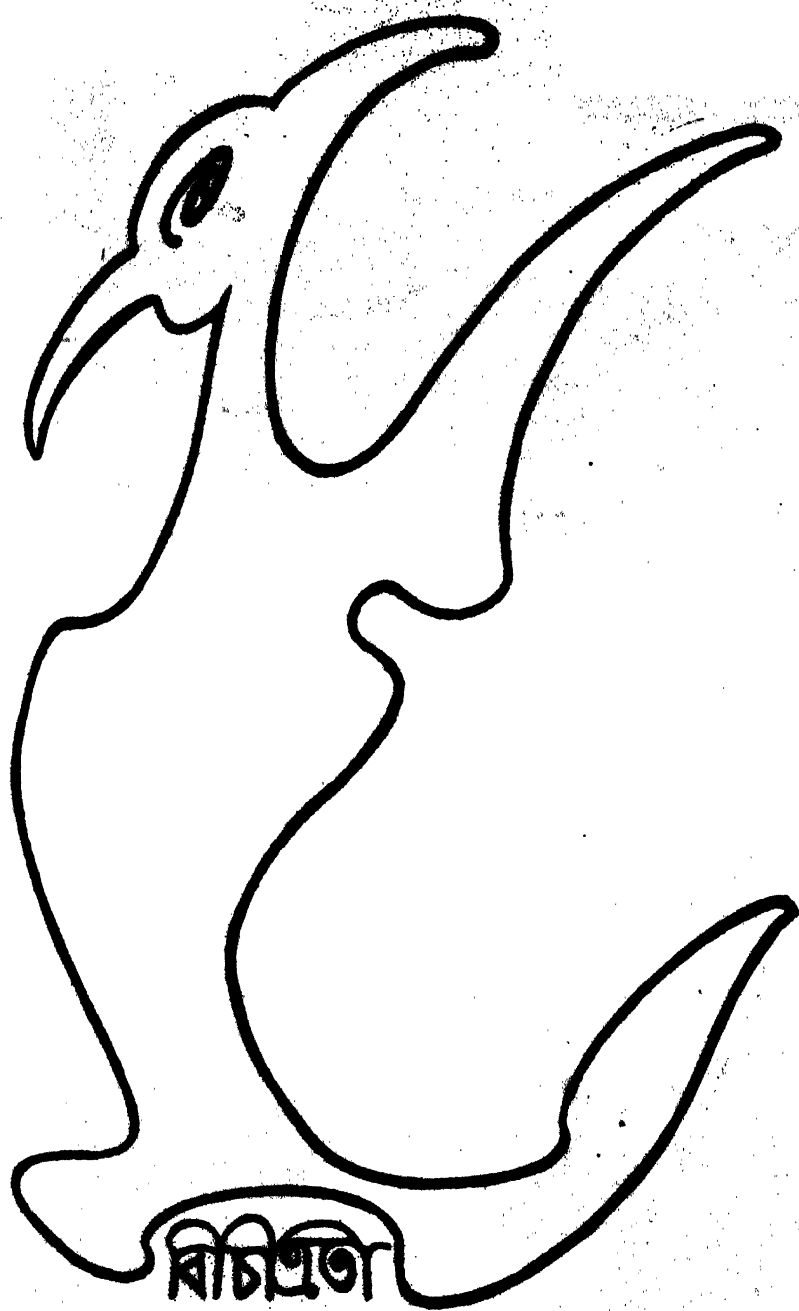
আশীর্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি।

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রঙ-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

[শান্তিনিকেতন]
রাসপূর্ণিমা
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

পদ্মপ

পুষ্প

পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে হে নারী, তোমার অপেক্ষায়
পল্লবচ্ছায়ায়।
তোমার নিশ্বাস তারে লেগে
অন্তরে সে উঠিয়াছে জেগে,
মুখে তব কী দেখিতে পায়।

সে কহিছে, বহু পূর্বে তুমি আমি কবে একসাথে
আদিম প্রভাতে
প্রথম আলোকে জেগে উঠি
এক ছন্দে বাঁধা রাখী দুটি
দুজনে পরিনু হাতে হাতে।

আধো আলো-অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।
একদিন কবে কোন্ মোহে
দুই পথে চলে গেনু দোঁহে,
আমাদের মাটির আবাসে।

বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান-তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে।

অবশেষে দেখিলাম কত জন্ম-পরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজও আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।

তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

কী যে বলে সেই সুর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।

আজ সখী বুঝিলাম আমি,
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

১১ মাঘ [১৩৩৮]

বধূ

যে-চিরবধূর বাস তরুণীর প্রাণে
সেই ভীরু চেয়ে আছে ভবিষ্যৎ-পানে
অনাগত অনিশ্চিত ভাগ্যবিধাতার
সাজায়ে পূজার ডালি।
কল্পমূর্তি তার
প্রতিষ্ঠা করেছে মনে।
যাহারে দেখে নি
একান্তে স্মরিয়া তারে সুনিপুণ বেণী
কুসুমে খচিত করি তুলে।
সযতনে
পরে নীলাম্বরী শাড়ি।
নিভৃতে দর্পণে
দেখে আপনার মুখ।
শুধায় সভয়ে—
হব কি মনের মতো, পাব কি হৃদয়ে
সৌভাগ্য-আসন।
কোন্ দূরের কল্যাণে
সঁপিছে করুণ ভক্তি দেবতার ধ্যানে।
আগন্তুক অজানার পথ-পানে থেমে
উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।

১৪ মাঘ [১৩৩৮]

অচেনা

তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো,
লুকানো নহ, তবু লুকানো থাক'।
ছবির মতো ভাবনা পরশিয়া
একটু আছ মনেরে হরষিয়া।

অনেক দিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে, তবুও আমি একা।
আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী,
লইলে শুধু নয়ন মন জিনি।

বেদনা কিছু আছে বা তব মনে,
সে ব্যথা ঢাকে তোমারে আবরণে।
শূন্য-পানে চাহিয়া থাক' তুমি,
নিশ্বসিয়া উঠে কাননভূমি।

মৌন তব কী কথা বলে বুঝি,
অর্থ তারি বেড়াই মনে খুঁজি।
চলিয়া যাও তখন মনে বাজে—
চিনি না আমি, তোমারে চিনি না যে।

পসারিনী

পসারিনী, ওগো পসারিনী,
কেটেছে সকালবেলা হাটে হাটে লয়ে বিকিকিনি।
ঘরে ফিরিবার খনে
কী জানি কী হল মনে,
বসিলি গাছের ছায়াতলে—
লাভের জমানো কড়ি
ডালায় রহিল পড়ি,
ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে।

এই মাঠ, এই রাঙা ধূলি,
অঘ্রানের রৌদ্রলাগা চিক্কণ কাঁঠালপাতাগুলি,
শীতবাতাসের শ্বাসে
এই শিহরন ঘাসে,
কী কথা কহিল তোর কানে।
বহুদূর নদীজলে
আলোকের রেখা ঝলে,
ধ্যানে তোর কোন্ মন্ত্র আনে।

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চারিল তোর রক্তস্রোতে।
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা—
মৃত্তিকার খেলাঘরে
কত যুগযুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা।

নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।

আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি উঠিল তোর বুকে।

যত ছিল ত্বরিত আহ্বান
পরিচিত সংসারের দিগন্তে হয়েছে অবসান।
বেলা কত হল, তার
বার্তা নাহি চারি ধার,
না কোথাও কর্মের আভাস।
শব্দহীনতার স্বরে
খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে,
শূন্যতার উঠে দীর্ঘশ্বাস।

পসারিনী, ওগো পসারিনী,
ক্ষণকাল-তরে আজি ভুলে গেলি যত বিকিকিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা—
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।

৫ মাঘ ১৩৩৮

গোয়ালিনী

হাটেতে চল পথের বাঁকে বাঁকে,
হে গোয়ালিনী, শিশুরে নিয়ে কাঁখে।
হাটের সাথে ঘরের সাথে
বেঁধেছ ডোর আপন হাতে
পরুষ কল-কোলাহলের ফাঁকে।

হাটের পথে জানি না কোন্ ভুলে
কৃষ্ণকলি উঠিছে ভরি ফুলে।
কেনাবেচার বাহনগুলো
যতই কেন উড়াক ধুলো
তোমারি মিল সে ওই তরুমূলে।

শালিখ পাখি আহারকণা-আশে
মাঠের 'পরে চরিছে ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হতে প্রভাতরবি
দেখিছে সেই প্রাণের ছবি,
তোমারে আর তাহারে দেখে হাসে।

মায়েতে আর শিশুতে দোঁহে মিলে
ভিড়ের মাঝে চলেছ নিরিবিলে।
দুধের ভাঁড়ে মায়ের প্রাণ
মাধুরী তার করিল দান,
লোভের ভালে স্নেহের ছোঁয়া দিলে।

কুমার

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক-তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য-যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে সে-উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি।

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে বীর, জাগ ভয়ার্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্য দান
আনন্দে গৌরবে।

হেরো, জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি,
তোমার বিজয়শঙ্খ উঠুক ধ্বনি।
গর্জিত তব তর্জনধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে,
মন্দ্রিত হোক বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী।

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান,
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে,
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান।

তুমি নাই, মিছে বসন্ত আসে বনে
বিরহবিকল চঞ্চল সমীরণে।
দুর্বল মোহ কোন্ আয়োজন করে
যেথা অরাজক হিয়া লজ্জায় মরে,
ওই ডাকে, রাজা, এসো এ শূন্য ঘরে
হৃদয়সিংহাসনে।

চেয়ে আছে নারী, প্রদীপ হয়েছে জ্বালা,
বিফল কোরো না বীরের বরণডালা।
মিলনলগ্ন বারে বারে ফিরে যায়
বরসজ্জার ব্যর্থতাবেদনায়,
মনে মনে সদা ব্যথিত কল্পনায়
তোমারে পরায় মালা।

তব রথ তারা স্বপ্নে দেখিছে জেগে,
ছুটিছে অশ্ব বিদ্যুৎকশা লেগে।
ঘুরিছে চক্র বহ্নিবরন সে যে,
উঠিছে শূন্যে ঘর্ঘর তার বেজে,
প্রোজ্জ্বল চূড়া প্রভাতসূর্যতেজে,
ধ্বজা রঞ্জিত রাঙা সন্ধ্যার মেঘে।

উদ্দেশহীন দুর্গম কোন্‌খানে
চল দুঃসহ দুঃসাহসের টানে।
দিল আহ্বান আলসনিদ্রা-নাশা
উদয়কূলের শৈলমূলের বাসা,
অমরালোকের নব আলোকের ভাষা
দীপ্ত হয়েছে দৃপ্ত তোমার প্রাণে।

অদূরে সুনীল সাগরে ঊর্মিরাশি
উত্তালবেগে উঠিছে সমুচ্ছ্বাসি।
পথিক ঝটিকা রুদ্রের অভিসারে
উধাও ছুটিছে সীমাসমুদ্রপারে,
উল্লোল কলগর্জিত পারাবারে
ফেনগর্গরে ধ্বনিছে অট্টহাসি।

আত্মলোপের নিত্যনিবিড় কারা,
তুমি উদ্দাম সেই বন্ধনহারা।
কোনো শঙ্কার কার্মুক-টংকারে
পারে না তোমারে বিহ্বল করিবারে,
মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমিরপারে
নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা।

চাহে নারী তব রথসঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে—
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে।

১২ মাঘ [১৩৩৮]

আরশি

তোমার যে ছায়া তুমি দিলে আরশিরে
হাসিমুখ মেজে,
সেইক্ষণে অবিকল সেই ছায়াটিরে
ফিরে দিল সে যে।
রাখিল না কিছু আর,
স্ফটিক সে নির্বিকার
আকাশের মতো,
সেথা আসে শশী রবি
যায় চলে, তার ছবি
কোথা হয় গত।

একদিন শুধু মোরে ছায়া দিয়ে, শেষে
সমাপিলে খেলা,
আত্মভোলা বসন্তের উন্মত্ত নিমেষে
শুরু সন্ধ্যাবেলা।
সে ছায়া খেলারই ছলে
নিয়েছিনু হিয়াতলে
হেলাভরে হেসে,
ভেবেছিনু চুপে চুপে
ফিরে দিব ছায়ারূপে
তোমারি উদ্দেশে।

সে ছায়া তো ফিরিল না, সে আমার প্রাণে
হল প্রাণবান।
দেখি, ধরা পড়ে গেল কবে মোর গানে
তোমার সে দান।
যদি বা দেখিতে তারে
পারিতে না চিনিবারে
অয়ি এলোকেশী,
আমার পরান পেয়ে
সে আজি তোমারো চেয়ে
বহুগুণে বেশি।

কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃতস্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে,
হারায়েছে সীমা।
তোমার খেয়াল ত্যেজে
পূজার গৌরবে সে যে
পেয়েছে গৌরব।
মর্ত্যের স্বপন ভুলে
অমরাবতীর ফুলে
লভিল সৌরভ।

১ মাঘ [১৩০৮]

দান

হে উষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন্ মহা-অন্ধকারে, কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর
তোমারে দিয়েছে বর।

তোমার অজ্ঞাতে
সুপ্তিঢাকা রাতে,
তব শুভ্র আলোকেরে করিয়া স্মরণ
আগে হতে করেছে বরণ।
নিজেরে আড়াল করি
বর্ণে গন্ধে ভরি
প্রেমের দিয়েছে পরিচয়
ফুলেরে করিয়া বাণীময়।

মৌনী তুমি, মুগ্ধ তুমি, স্তব্ধ তুমি, চক্ষু ছলোছলো—
কথা কও, বলো কিছু বলো,
তোমার পাখির গানে
পাঠাও সে-অলক্ষ্যের পানে
প্রতিভাষণের বাণী,
বলো তারে, হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম—
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম।

হার

শুক্লা একাদশী।
লাজুক রাতের ওড়না পড়ে খসি
বটের ছায়াতলে,
নদীর কালো জলে।
দিনের বেলায় কৃপণ কুসুম কুণ্ঠাভরে
যে-গন্ধ তার লুকিয়ে রাখে নিরুদ্ধ অন্তরে
আজ রাতে তার সকল বাধা ঘোচে,
আপন বাণী নিঃশেষিয়া দেয় সে অসংকোচে।

অনিদ্র কোকিল
দূর শাখাতে মুহুর্মুহু খুঁজতে পাঠায় কুহুগানের মিল।
যেন রে আর সময় তাহার নাই,
এক রাতে আজ এই জীবনের শেষ কথাটি চাই।
ভেবেছিলেম সইবে না আজ লুকিয়ে রাখা
বদ্ধ বাণীর অস্ফুটতায় যে কথা মোর অর্ধাবরণ-ঢাকা।
ভেবেছিলেম বন্দীরে আজ মুক্ত করা সহজ হবে,
ক্ষুদ্র বাধায় দিনে দিনে রুদ্ধ যাহা ছিল অগৌরবে।

সে যবে আজ এল ঘরে
জ্যোৎস্নারেখা পড়েছে মোর ’পরে
শিরীষ-ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
ভেবেছিলেম বলি তাকে—
‘দেখো আমায়, জানো আমায়, সত্য ডাকে আমায় ডেকে লহো,
সবার চেয়ে গভীর যাহা নিবিড় ভাষায় সেই কথাটি কহো।
হয় নি মোদের চরম মন্ত্র পড়া,
হয় নি পূর্ণ অভিষেকের তীর্থজলের ঘড়া,
আজ হয়ে যাক মালাবদল যে মালাটি অসীম রাত্রিদিন
রইবে অমলিন।’

হঠাৎ বলে উঠল সে যে, ক্রুদ্ধ নয়ন তার,
গড়ের মাঠে তাদের দলের হার হয়েছে, অন্যায় সেই হার।
বারে বারে ফিরে ফিরে খেলাহারের গ্লানি
জানিয়ে দিল ক্লান্তি নাহি মানি।
বাতায়নের সমুখ থেকে চাঁদের আলো নেমে গেল নীচে,
তখনো সেই নিদ্রাবিহীন কোকিল কুহরিছে।

৩ মাঘ ১৩৩৮

শ্যামলা

মরীচিকা

ওই যে তোমার মানস-প্রজাপতি
ঘরছাড়া সব ভাবনা যত, অলস দিনে কোথা ওদের গতি।
দখিন হাওয়ার সাড়া পেয়ে
চঞ্চলতার পতঙ্গদল ভিতর থেকে বাইরে আসে ধেয়ে।
চেলাঞ্চলে উতল হল তারা,
চক্ষে মেলে চপল পাখা আকাশে পথহারা।
বকুলশাখায় পাখির হঠাৎ ডাকে
চমকে-যাওয়া চরণ ঘিরে ঘুরে বেড়ায় শাড়ির ঘূর্ণিপাকে।
কাটায় ব্যর্থ বেলা
অঙ্গে অঙ্গে অস্থিরতার চকিত এই খেলা।

মনে তোমার ফুল-ফোটানো মায়া
অস্ফুট কোন্ পূর্বরাগের রক্তরঙিন ছায়া।
ঘিরল তারা তোমায় চারি পাশে
ইঙ্গিতে আভাসে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে ঝলকে।
তোমার অলকে
দোলা দিয়ে বিনা ভাষায় আলাপ করে কানে কানে,
নাই কোনো যার মানে।

মরীচিকার ফুলের সাথে
মরীচিকার প্রজাপতির মিলন ঘটে ফাল্গুনপ্রভাতে।
আজি তোমার যৌবনেরে ঘেরি
যুগলছায়ার স্বপনখেলা তোমার মধ্যে হেরি।

৭ মাঘ ১৩৩৮

শ্যামলা

যে ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর,
কর্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্মসমাহিত অবসর।

মাটির অন্তরে
স্তরে স্তরে

রবিরশ্মি নামে পথ করি,
তারি পরিচয় ফুটে দিবসশর্বরী
তরুলতিকায় ঘাসে,
জীবনের বিচিত্র বিকাশে।
তেমনি প্রচ্ছন্ন তেজ চিত্ততলে তব
তোমার বিচিত্র চেষ্টা করে নব নব
প্রাণে মূর্তিময়,
দেয় তারে যৌবন অক্ষয়।
প্রতিদিবসের সব কাজে
সৃষ্টির প্রতিভা তব অক্লান্ত বিরাজে।
তাই দেখি তোমার সংসার
চিত্তের সজীব স্পর্শে সর্বত্র তোমার আপনার।

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে
মাটির যে গন্ধ উঠে সিক্ত সমীরণে,
ভাদ্রে যে নদীটি ভরা কূলে কূলে,
মাঘের শেষে যে-শাখা গন্ধঘন আমের মুকুলে,
ধানের হিল্লোলে ভরা নবীন যে-খেত,
অশ্বত্থের কম্পিত সংকেত,
আশ্বিনে শিউলিতলে পূজাগন্ধ যে স্নিগ্ধ ছায়ার,
জানি না এদের সাথে কী মিল তোমার।

দেখি ব'সে জানালার ধারে—
প্রান্তরের পারে
নীলাভ নিবিড় বনে
শীতসমীরণে
চঞ্চল পল্লবঘন সবুজের 'পরে
ঝিলিমিলি করে
জনহীন মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণ,
তন্দ্রাবিষ্ট আকাশের স্বপ্নের মতন।
দিগন্তে মন্থর মেঘ, শংখচিল উড়ে যায় চলি
ঊর্ধ্বশূন্যে, কতমতো পাখির কাকলি,
পীতবর্ণ ঘাস
শুষ্ক মাঠে, ধরণীর বনগন্ধী আতপ্ত নিঃশ্বাস
মৃদুমন্দ লাগে গায়ে, তখন সে ক্ষণে
অস্তিত্বের যে-ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি উঠে মনে,
প্রাণের যে-প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই—
যখন তোমারে হেরি
রহিয়াছ আপনারে ঘেরি
গম্ভীর শান্তিতে,

স্নিগ্ধ সুনিস্তব্ধ চিতে,
চক্ষে তব অন্তর্যামী দেবতার উদার প্রসাদ
সৌম্য আশীর্বাদ।

৮ মাঘ [১৩৩৮]

একাকিনী

একাকিনী বসে থাকে আপনারে সাজায়ে যতনে।
বসনে ভূষণে
যৌবনেরে করে মূল্যবান।
নিজেরে করিবে দান
যার হাতে
সে অজানা তরুণের সাথে
এই যেন দূর হতে তার কথা-বলা।
এই প্রসাধনকলা,
নয়নের এ কজ্জললেখা,
উজ্জ্বল বসন্তীরঙা অঞ্চলের এ বঙ্কিমরেখা
মণ্ডিত করেছে দেহ প্রিয়সম্ভাষণে।
দক্ষিণপবনে
অস্পষ্ট উত্তর আসে শিরীষের কম্পিত ছায়ায়।
এইমতো দিন যায়,
ফাগুনের গন্ধে ভরা দিন।
সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন
কুঙ্কুম-আভায় আনে
উৎকণ্ঠিত প্রাণে
তুলি' দীর্ঘশ্বাস—
অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস।

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

সাজ

এই-যে রাঙা চেলি দিয়ে তোমায় সাজানো,
ওই-যে হোথায় দ্বারের কাছে সানাই বাজানো,
অদৃশ্য এক লিপির লিখায়
নবীন প্রাণের কোন্ ভূমিকায়
মিলছে, না জানো।

শিশুবেলায় ধূলির 'পরে আঁচল এলিয়ে
সাজিয়ে পুতুল কাটল বেলা খেলা খেলিয়ে।

বুঝতে নাহি পারবে আজো
আজ কী খেলায় আপনি সাজো
হৃদয় মেলিয়ে।

অখ্যাত এই প্রাণের কোণে সন্ধ্যাবেলাতে
বিশ্ব-খেলোয়াড়ের খেয়াল নামল খেলাতে।
দুঃখসুখের তুফান লেগে
পুতুল-ভাসান চলল বেগে
ভাগ্যভেলাতে।

তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।
তার পরেতে জিতবে ধুলো,
ভাঙা খেলার চিহ্নগুলো
সঙ্গে লবে না।

রাঙা রঙের চেলি দিয়ে কন্যে সাজানো,
দ্বারের কাছে বেহাগ রাগে সানাই বাজানো,
এই মানে তার বুঝতে পারি—
খেয়াল যাঁহার খুশি তাঁরি
জানো না-জানো।

প্রকাশিতা

আজ তুমি ছোটো বটে, যার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা
যেন তার আধা।
অধিকার গর্বভরে
সে তোমারে নিয়ে চলে নিজঘরে।
মনে জানে তুমি তার ছায়েবানুগতা—
তমাল সে, তার শাখালগ্ন তুমি মাধবীর লতা।
আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া
আগাগোড়া,
জড়োসড়ো ঘোমটায় ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা।

আসিবে যে আর-একদিন,
নারীর মহিমা নিয়ে হবে তুমি অন্তরে স্বাধীন
বাহিরে যেমনি থাক্।
আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি।

জিনি লবে তোমার সংসার হে রমণী,
সেবার গৌরবে।
যে জন আশ্রয় তব তোমারি আশ্রয় সেই লবে।
সংকোচের এই আবরণ দূর ক'রে
সেদিন কহিবে—দেখো মোরে।
সে দেখিবে ঊর্ধ্বে মুখ তুলি
সুপ্ত হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি—
দিগন্তের 'পরে স্মিতহাসে
পূর্ণচন্দ্র একা জাগে বসন্তের বিস্মিত আকাশে।
বুঝিবে সে দেহে মনে
প্রচ্ছন্ন হয়েছে তরু পুষ্পিত লতার আলিঙ্গনে।

বরবধূ

এপারে চলে বর, বধূ সে পরপারে,
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।
তাহারি 'পরে দান আসিছে ভারে ভারে,
তাহারি 'পরে বাঁশি বাজে।
যাত্রা দুজনার
লক্ষ্য একই তার,
তবুও যত কাছে আসে
সতত যেন থাকে
বিরহ ফাঁকে ফাঁকে
তৃপ্তিহারা অবকাশে।

সে ফাঁক গেলে ঘুচে থেমে যে যাবে গান,
দৃষ্টি হবে বাধাময়,
যেথায় দূর নাহি সেথায় যত দান
কাছেতে ছোটো হয়ে রয়।
বিরহনদীজলে
খেয়ার তরী চলে,
বায় সে মিলনেরই ঘাটে।
হৃদয় বারবার
করিবে পারাপার
মিলিতে উৎসবনাটে।

বেলা যে পড়ে এল, সূর্য নামে ধীরে,
আলোক ম্লান হয়ে আসে।
ভাঙিয়া গেছে হাট, জনতাহীন তীরে
নৌকা বাঁধা পাশে পাশে।

এ পারে বয় চলে
পুরানো বটতলে,
নদীটি বহি চলে মাঝে,
বধূরে দেখা যায়
মাঠের কিনারায়,
সেতুর 'পরে বাঁশি বাজে।

ছায়াসঙ্গিনী

কোন্ ছায়াখানি
সঙ্গে তব ফেরে লয়ে স্বপ্নরুদ্ধ বাণী
তুমি কি আপনি তাহা জান।
চোখের দৃষ্টিতে তব রয়েছে বিছানো
আপনা-বিস্মৃত তারি
স্তম্ভিত স্তিমিত অশ্রুবারি।

একদিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি শুনি
কম্পিত কৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার দিলে উঁকি
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে মধুপগুঞ্জনে
হৃদয়স্পন্দনে
এক ছন্দে মিলে গেল বনের মর্মর।
অশোকের কিশলয়স্তর
উৎসুক যৌবনে তব বিস্তারিল নবীন রক্তিমা।
প্রাণোচ্ছ্বাস নাহি পায় সীমা
তোমার আপনা-মাঝে,
সে প্রাণেরই ছন্দ বাজে
দূর নীল বনান্তের বিহঙ্গসংগীতে,
দিগন্তে নির্জনলীন রাখালের করুণ বংশীতে।
তব বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী-অংশুকে তার সুবর্ণ পূর্ণিমা
চম্পকবর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে
প্রভাতের মৃদু রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উচ্ছ্বাসিয়া।

তার পর সসংকোচে বন্ধ করি দিলে তব দ্বার;
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার
লইলে সংযত করি—
অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি
স্খলিত কিংশুক-সাথে
জীর্ণ হল ধূসর ধূলাতে।

তুমি ভাব সেই রাত্রিদিন
চিহ্নহীন
মল্লিকাগন্ধের মতো
নির্বিশেষে গত।
জান না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।
অদৃশ্য মঞ্জরী তার আপনার রেণুর রেখায়
মেশে তব সীমন্তের সিন্দূরলেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর।

[মাঘ? ১৩৩৮]

প্রভেদ

তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ
জানি তা বন্ধু জানি,
বিচ্ছেদ তবু অন্তরে নাহি মানি।
এক জ্যোৎস্নায় জেগেছি দুজনে
সারারাত-জাগা পাখির কূজনে,
একই বসন্তে দোঁহাকার মনে
দিয়েছে আপন বাণী।

তুমি চেয়ে আছ আলোকের পানে,
পশ্চাতে মোর মুখ—
অন্তরে তবু গোপন মিলনসুখ।
প্রবল প্রবাহে যৌবনবান
ভাসায়েছে দুটি দোলায়িত প্রাণ,
নিমেষে দোঁহারে করেছে সমান
একই আবর্তে টানি।

সোনার বর্ণ মহিমা তোমার
বিশ্বের মনোহর,
আমি অবনত পাণ্ডুর কলেবর।
উদাস বাতাসে পরান কাঁপায়ে
অগৌরবের শরম ছাপায়ে
আমারে তোমার বসাইল বাঁয়ে,
একাসনে দিল আনি।
নবারুণরাগে রাঙা হয়ে গেল
কালো ভেদরেখাখানি।

শ্রীপঞ্চমী
১৩৩৮

পুষ্পচয়িনী

হে পুষ্পচয়িনী,
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনীছন্দের বন্ধ টুটে।
বকুল উৎফুল্ল হয়ে উঠে
আজো বুঝি তব মুখমদে।
নূপুররণিত পদে
আজো বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।
কী সেই কুসুম
যা দিয়ে অতীত জন্মে গণেছিলে বিরহের দিন।
বুঝি সে ফুলের নাম বিস্মৃতিবিলীন
ভর্তৃ-প্রসাদন ব্রতে যা দিয়ে গাঁথিতে মালা
সাজাইতে বরণের ডালা।
মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি—
মর্ত্যভূমি
তোমারে যা ব'লে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।

তুমি আজ
করেছ যে অঙ্গসাজ
নহে সদ্য আজিকাল।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গিটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহুদূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে।

মনে হয় যে-প্রিয়ের লাগি
অবন্তী নগরসৌধে ছিলে জাগি
তাহারি উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সে যুগের বেশে।
মালতীশাখার 'পরে
এই-যে তুলেছ হাত ভঙ্গিভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,
বুঝি আছে মনে
যুগ-অন্তরাল হতে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও-করপল্লব।
অশরীরী মুগ্ধনেত্র যেন গগনে সে
হেরে অনিমেষে
দেহভঙ্গিমার মিল লতিকার সাথে
আজি মাঘীপূর্ণিমার রাতে।
বাতাসেতে অলক্ষিতে যেন কার ব্যাপ্ত ভালোবাসা
তোমার যৌবনে দিল নৃত্যময়ী ভাষা।

১০ মাঘ [১৩৩৮]

ভীরু

কেন এ কম্পিত প্রেম অয়ি ভীরু, এনেছ সংসারে—
ব্যর্থ করি রাখিবে কি তারে।
আলোকশঙ্কিত তব হিয়া
প্রচ্ছন্ন নিভৃত পথ দিয়া
থেমে যায় প্রাঙ্গণের দ্বারে।

হায়, সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়,
বন্দী তারে রেখেছে সংশয়।
বাহিরে সামান্য বাধা সেও
সে প্রেমেরে কেন করে হেয়,
অন্তরেও তার পরাজয়।

ওই শোনো কেঁপে ওঠে নিশীথরাত্রির অন্ধকার,
আহ্বান আসিছে বারংবার।
থেকো না ভয়ের অন্ধ ঘেরে,
অবজ্ঞা করিয়ো দুর্গমেরে,
জিনি লহো সত্যেরে তোমার।

নিষ্ঠুরকে মেনে লহো সুদুঃসহ দুঃখের উৎসাহে,
প্রেমের গৌরব জেনো তাহে।

দীপ্তি দেয় রুদ্ধ অশ্রুজল,
নষ্ট আশা হয় না নিষ্ফল,
সমুজ্জ্বল করে চিত্তদাহে।

শীর্ণ ফুল রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়, হোক-না সে কালো—
দীন দীপে নিবুক-না আলো।
দুর্বল যে মিথ্যার খাঁচায়
নিত্যকাল কে তারে বাঁচায়,
মরে যাহা মরা তার ভালো।

আঘাত বাঁচাতে গিয়ে বঞ্চিত হবে কি এ জীবন,
শুধিবে না দুর্মূল্যের পণ।
প্রেম সে কি কৃপণতা জানে,
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে,
ত্যাগবীর্যে লভে মুক্তিধন।

১০ মাঘ [১৩৩৮]

যুগল

আমি থাকি একা,
এই বাতায়নে বসে এক বৃন্তে যুগলকে দেখা,
সেই মোর সার্থকতা।
বুঝিতে পারি সে কথা
লোকে লোকে কী আগ্রহ অহরহ
করিছে সন্ধান
আপনার বাহিরেতে কোথা হবে আপনার দান।
তা নিয়ে বিপুল দুঃখে বিশ্বচিত্ত জেগে উঠে,
তারি সুখে পূর্ণ হয়ে ফুটে
যা-কিছু মধুর।
যত বাণী, যত সুর,
যত রূপ, তপস্যার যত বহ্নিলিখা,
সৃষ্টিচিত্তশিখা,
আকাশে আকাশে লিখে
দিকে দিকে
অণুপরমাণুদের মিলনের ছবি।
গ্রহ তারা রবি
যে আগুন জ্বেলেছে তা বাসনারই দাহ,
সেই তাপে জগৎপ্রবাহ
চঞ্চলিয়া চলিয়াছে বিরহমিলনদ্বন্দ্বঘাতে।
দিনরাতে
কালের অতীত পার হতে
অনাদি আহ্বানধ্বনি ফিরিতেছে ছায়াতে আলোতে।

সেই ডাক শুনে
কত সাজে সাজিয়াছে আজি এ ফাল্গুনে
বনে বনে অভিসারিকার দল,
পত্রে পুষ্পে হয়েছে চঞ্চল,
সমস্ত বিশ্বের মর্মে যে চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশধারায়,
নিখিল ভুবনে নিত্য যে সংগীত বাজে
মূর্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে।

১৮. ২. ৩২

বেসুর

ভাগ্য তাহার ভুল করেছে, প্রাণের তানপুরার
গানের সাথে মিল হল না, বেসুরো ঝংকার।
এমন ত্রুটি ঘটল কিসে
আপনিও তা বোঝে নি সে,
অভাব কোথাও নেই-যে কিছুই এই কি অভাব তার।

ঘরটাকে তার ছাড়িয়ে গেল ঘরেরই আসবাবে।
মনটাকে তার ঠাঁই দিল না ধনের প্রাদুর্ভাবে।
যা চাই তারো অনেক বেশি
ভিড় করে রয় ঘেঁষাঘেঁষি,
সেই ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে তাই বিদ্রোহ তার নাবে।

সব চেয়ে যা সহজ সেটাই দুর্লভ তার কাছে।
সেই সহজের মূর্তি যে তার বুকের মধ্যে আছে।
সেই সহজের খেলাঘরে
ওই যারা সব মেলা করে
দূর হতে ওর বন্ধ জীবন সঙ্গ তাদের যাচে।

প্রাণের নিঝর স্বভাব-ধারায় বয় সকলের পানে,
সেটাই কি কেউ ফিরিয়ে দিল উলটো দিকের টানে।
আত্মদানের রুদ্ধ বাণী
বক্ষকপাট বেড়ায় হানি,
সঞ্চিত তার সুধা কি তাই ব্যথা জাগায় প্রাণে।

আপনি যেন আর কেহ সে, এই লাগে তার মনে,
চেনা ঘরের অচল ভিতে কাটায় নির্বাসনে।
বসন ভূষণ অঙ্গরাগে
ছদ্মবেশের মতন লাগে,
তার আপনার ভাষা যে হায় কয় না আপন জনে।

আজকে তারে নিজের কাছে পর করেছে কা'রা,
আপন-মাঝে বিদেশে বাস হায় এ কেমনধারা।
পরের খুশি দিয়ে সে যে
তৈরি হল ঘ'ষে মেজে,
আপনাকে তাই খুঁজে বেড়ায় নিত্য আপন-হারা।

খড়দা
২ মাঘ ১৩৩৮

স্যাকরা

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন-ভরে।
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।

শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।

আমি বলি, কিনে তো লয়
মহারাজাই।
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।

আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাকরা বলে, অলখ ছোঁয়ায়
রূপ লভে সে।

শুধাই, একি একলা তারি
চরণতলে।
স্যাকরা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নীহারিকা

বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে
তমালছায়াতলে,
শজনে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে
দিঘির প্রান্তজলে।

অস্তরবির পথ-তাকানো মেঘে
কালোর বুকে আলোর বেদন লেগে—
কেন এমন খনে
কে যেন সে উঠল হঠাৎ জেগে
আমার শূন্য মনে।

"কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন,"
প্রশ্ন পুছিলাম।
সে কহিল, "ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।
নীরব রাতে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
প্রদীপ তোমার জেবলে দিলেম ঘরে,
চোখে দিলেম চুমো,
সেদিন আমায় দেখলে আলস-ভরে
আধ-জাগা আধ-ঘুমো।

আমি তোমার খেয়ালস্রোতে তরী,
প্রথম-দেওয়া খেয়া,
মাতিয়েছিলেম শ্রাবণশর্বরী
লুকিয়ে-ফোটা কেয়া।
সেদিন তুমি নাও নি আমায় বুকে,
জেগে উঠে পাও নি ভাষা খুঁজে,
দাও নি আসন পাতি,
সংশয়িত স্বপন-সুখে ঘুমে
কাটল তোমার রাতি।

তার পরে কোন্ সব-ভুলিবার দিনে
নাম হল মোর হারা।
আমি যেন অকালে আশ্বিনে
এক-পসলার ধারা।
তার পরে তো হল আমার জয়—
সেই প্রদোষের ঝাপসা পরিচয়
ভরল তোমার ভাষা,
তার পরে তো তোমার ছন্দোময়
বেঁধেছি মোর বাসা।

চেন' কিম্বা নাই বা আমায় চেন'
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি।

যে-আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোল্লোল পল্লবে
তাহার কানাকানি।

সেদিন আমি এসেছিলেম একা
তোমার আঙিনাতে।
দুয়ার ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা
নিদ্রাঘেরা রাতে।
যাবার বেলা সে দ্বার গেছি খুলে
গন্ধ-বিভোল পবন-বিলোল ফুলে,
রঙ-ছড়ানো বনে—
চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে,
কত চোখের কোণে।

রইল তোমার সকল গানের সাথে
ভোলা নামের ধুয়া।
রেখে গেলেম সকল প্রিয় হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া।
মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন-অশ্রুজলে—
মোর আঁচলের হাওয়া
আজ রাতে ওই কাহার নীলাঞ্চলে
উদাস হয়ে ধাওয়া।"

বরানগর
এপ্রিল ১৯৩১

কালো ঘোড়া

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।
অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যাবে ব'লে
দুর্গমেরে দ্রুত পায়ে দ'লে
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী,
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি।

ও যেন রে যুগান্তের কালো অগ্নিশিখা,
কালো কুজ্ঝটিকা।
অকস্মাৎ নৈরাশ্য আঘাতে
দ্বার মুক্ত পেয়ে রাতে
দুর্দাম এসেছে বাহিরিয়া।

যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া,
বাহিরে না স্থান পেয়ে
ধ্যানের আসন ছিল ছেয়ে।

এ অমাবস্যায়
বল্গাহারা কালো অশ্ব ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায়।
কালো চিন্তা মম
আত্মঘাতী ঝঞ্ঝাসম
বিস্মৃতির চিরবিলুপ্তিতে
চলে ঝাঁপ দিতে
নিরঙ্কিত পথ বেয়ে।
যাক ধেয়ে।
সৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন রাত্রিপারে
ব্যর্থ দুরাশারে
নিয়ে যাক—
অন্তিম শূন্যের মাঝে নিশ্চল নির্বাক।
তার পরে বিরহের অগ্নিস্নানে শুভ্র মন
রৌদ্রস্নাত আশ্বিনের বৃষ্টিশূন্য মেঘের মতন
উন্মুক্ত আলোকে
দীপ্তি পাক সুনির্মল শোকে।

৪ মাঘ ১৩৩৮

অনাগতা

এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে,
যারা চলে গেছে একেবারে,
ফাগুন-মধ্যাহ্নবেলা শিরীষছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়ারূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দূর্বাদলে।
ঘন কালো দিঘিজলে
পিছনে-ফিরিয়া-চাওয়া আঁখি জ্বলোজ্বলো
করে ছলোছলো।
মরণের অমরতালোকে
ধূসর আঁচল মেলি ফিরে তারা গেরুয়া আলোকে।

যে এখনো আসে নাই মোর পথে,
কখনো যে আসিবে না আমার জগতে,
তার ছবি আঁকিয়াছি মনে—
একেলা সে বাতায়নে
বিদেশিনী জন্মকাল হতে।

সে যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে,
কোথায় তাহার দেশ
নাই সে উদ্দেশ।
চেয়ে আছে দূর-পানে
কার লাগি আপনি সে নাহি জানে।
সেই দূরে ছায়ারূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল-শেষে
যে আসিতে পারিত, তবুও
এল না কভুও।
জীবনের মরীচিকাদেশে
মরুকন্যাটির আঁখি ফিরে ভেসে ভেসে।

ঝাঁকড়াচুল

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,
কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী।
সঙ্গী ছিল কুকুর কালু,
বেশ ছিল তার আলুথালু,
আপনা-'পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী।

হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই,
দিঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে ক্ষণেই।
পাগলামি তার কানায় কানায়,
খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,
উচ্চহাসে কলভাষে কলকলিনী।

দেখা হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গি করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি
হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি'
কাজল আঁখি চোখের জলে ছলছলিনী।

আমার সঙ্গে পঞ্চাশবার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটুলি' ব'লে
সাড়া দিত মর্জি হলে,
ঝগড়াদিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী।

দ্বিধা

বাহিরে যার বেশভূষার ছিল না প্রয়োজন,
হৃদয়তলে আছিল যার বাস,
পরের দ্বারে পাঠাতে তারে দ্বিধায় ভরে মন
কিছুতে হায় পায় না আশ্বাস।
সবুজ বনে নীল গগনে
মিশায় রূপ সবার সনে,
পাখির গানে পরায় যারে সাজ,
ছিন্ন হয়ে সে ফুল একা
আকাশ-হারা দিবে কি দেখা
পাথরে-গাঁথা প্রাচীর-মাঝে আজ।

চন্দনের গন্ধজলে মুছালো মুখখানি,
নয়নপাতে কাজল দিল আঁকি।
ওষ্ঠাধরে যতনে দিল রক্তরেখা টানি,
কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।
ভূষণ যত পরালো দেহে
তাহারি সাথে ব্যাকুল স্নেহে
মিলিল দ্বিধা, মিলিল কত ভয়।
প্রাণে যে ছিল সুপরিচিত
তাহারে নিয়ে ব্যাকুল চিত
রচনা করে চোখের পরিচয়।

১৩ মাঘ [১৩৩৮]

যাত্রা

রাজা করে রণযাত্রা,
বাজে ভেরী, বাজে করতাল,
কম্পমান বসুন্ধরা
মন্ত্রী ফেলি ষড়যন্ত্রজাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাঁটায়।
পণ্যপোত
ধায় সিন্ধুপারে-পারে।
বীরকীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানবকঙ্কালস্তূপে,
ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চূড়া তার স্বর্গ-পানে হানে অট্টহাস।

পণ্ডিতেরা
আক্রমণ করে বারংবার
পুঁথির-প্রাচীর-ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ।
খ্যাতি তার ধায় দেশে দেশে।
হেথা গ্রামপ্রান্তে নদী বহি চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে।
তরীখানি তুলি লয়ে নববধূটিরে
চলে দূর পল্লী-পানে।
সূর্য অস্ত যায়।
তীরে তীরে
স্তব্ধ মাঠ।
দুরুদুরু বালিকার হিয়া।
অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে।

১২ মাঘ [১৩৩৮]

দ্বারে

একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে,
অতীতের দ্বার রুদ্ধ তোমার পশ্চাতে।
সেথা হল অবসান
বসন্তের সব দান,
উৎসবের সব বাতি নিবে গেল রাতে।

সেতারের তার হল চুপ,
শুষ্কমালা, ভস্মশেষ দগ্ধ গন্ধধূপ।
কবরীর ফুলগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
লজ্জিত সকল সজ্জা বিরস বিরূপ।

সম্মুখে উদাস বর্ণহীন
ক্ষীণছন্দ মন্দগতি তব রাত্রিদিন।
সম্মুখে আকাশ খোলা,
নিস্তব্ধ, সকল-ভোলা,
মত্ততার কলরব শান্তিতে বিলীন।

আভরণহারা তব বেশ,
কজ্জলবিহীন আঁখি, রুক্ষ তব কেশ।
শরতের শেষ মেঘে
দীপ্তি জ্বলে রৌদ্র লেগে,
সেইমতো শোকশুভ্র স্মৃতি-অবশেষ।

তবু কেন হয় যেন বোধ
অদৃষ্ট পশ্চাৎ হতে করে পথরোধ।
ছুটি হল যার কাছে
কিছু তার প্রাপ্য আছে,
নিঃশেষে কি হয় নাই সব পরিশোধ।

সূক্ষ্মতম সেই আচ্ছাদন,
ভাষাহারা অশ্রুহারা অজ্ঞাত কাঁদন।
দুর্লঙ্ঘ্য যে সেই মানা
স্পষ্ট যারে নেই জানা,
সব চেয়ে সুকঠিন অবন্ধ বাঁধন।

যদি বা ঘুচিল ঘুমঘোর,
অসাড় পাখায় তবু লাগে নাই জোর।
যদি বা দূরের ডাকে
মন সাড়া দিতে থাকে,
তবুও বারণে বাঁধে নিকটের ডোর।

মুক্তিবন্ধনের সীমানায়
এমনি সংশয়ে তব দিন চলে যায়।
পিছে রুদ্ধ হল দ্বার,
মায়া রচে ছায়া তার,
কবে সে মিলাবে আছ সেই প্রতীক্ষায়।

১১ মাঘ [১৩৩৮]

কন্যাবিদায়

জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে
আপন অতীতরূপ পড়িয়াছে মনে
যখন বালিকা ছিলে।
মাতৃক্রোড় হতে
তোমারে ভাসালো ভাগ্য দূরতর স্রোতে
সংসারের।
তার পর গেল কত দিন
দুঃখে সুখে,
বিচ্ছেদের ক্ষত হল ক্ষীণ।
এ জন্মের আরম্ভভূমিকা— সংকীর্ণ সে
প্রথম ঊষার মতো— ক্ষণিক প্রদোষে
মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণ কুহেলিকা।
বাল্যে পরেছিলে শুভ্র মাঙ্গল্যের টিকা,
সিন্দূররেখায় হল লীন।

সে রেখাটি
জীবনের পূর্বভাগ দিল যেন কাটি।
আজ সেই ছিন্নখণ্ড ফিরে এল শেষে
তোমার কন্যার মাঝে অশ্রুর আবেশে।

বিদায়

তোমার আমার মাঝে হাজার বৎসর
নেমে এল, মুহূর্তেই হল যুগান্তর।
মাথায় ঘোমটা টানি
যখনি ফিরালে মুখখানি
কোনো কথা নাহি বলি,
তখনি অতীতে গেলে চলি—
যে অতীতে অসীম বিরহে
ছায়াসম রহে
বর্তমানে যারা
হয়েছে প্রেমের পথহারা।
যে পারে গিয়েছ হোথা
বেশি দূর নহে এখনো তা।
ছোটো নির্ঝরিণী শুধু বহে মাঝখানে,
বিদায়ের পদধ্বনি গাঁথে সে করুণ কলগানে।
চেয়ে দেখি অনিমিখে
তুমি চলিয়াছ কোন্‌ শিখরের দিকে;
যেন স্বপ্নে উঠিতেছ ঊর্ধ্বপানে,
যেন তুমি বীণাধ্বনি, শান্ত সুরে তানে
চলিয়াছ মেঘলোকে।
আজি মোর চোখে
কাছের মূর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়ো।
অনেক দিনের মোর সব চিন্তা করিয়াছি জড়ো,
সব স্মৃতি,
অব্যক্ত সকল প্রীতি, ব্যক্ত সব গীতি—
উৎসর্গ করিনু আজি, যাত্রী তুমি, তোমার উদ্দেশে।
স্পর্শ যদি নাই করো যাক তবে ভেসে।

২৮ জুলাই ১৯৩২

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয় নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে;
পরদিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি;
আরো দেওয়া হল না,
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।
আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

শান্তিনিকেতন
১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃতরেখা;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি।
জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধ-খোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চল্‌তি গানে।
অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা;

সে যেন আপনি বিস্মিত।
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,
তেমনি দেখলেম ওকে।

অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয়;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে।
সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে;
মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,
তবু সরাতে পারে নি অন্তরাল।
উচ্ছৃংখল অবকাশ ঘটল না;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

চার

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ—
যাক কেটে এর আবেশটুকু;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
সরে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা করে।

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চার দিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন্ গুন্ করে বেড়ায়
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বন্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।

অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ওই নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস.
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগ্‌নি রঙের আঁচ্‌লা।
গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে;

এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
এর আলো-ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর-সংগমে।

পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলে নি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।
বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ওই তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তরফলকে।

নিরালার জানলার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্মা প্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে;

জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে।

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস—
'এসো প্রকাশ, এসো।'

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে,
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে.
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।
অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।

যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলনশয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।
সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে?
যে জীবনে আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো-এক দিনের জন্য
কেউ-একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আমকাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরন,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব-কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ-একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো-একটি গোধূলির ধূসরমুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় করে দিলে
সমস্ত আপনার দাবি;
সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।
আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন,
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিবল।
যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি।

ওই নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।

নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ওই সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

১৯ চৈত্র ১৩৪১

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে
ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির 'পরে,
যেমন অন্ধকার পটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি।
সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায় নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।

হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।
নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।

নামক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বলছে—নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সদ্য-বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ!

আজ আমার দ্বারের কাছে
শজনে গাছের পাতা গেল ঝ'রে,
ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি;
উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এইরকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,
রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষবেদনা।
সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
গর-ঠিকানার পথিক।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়বে না একটুও,
নামের পিঠে চ'ড়ে।

বর্তমানের দিগন্ত-পারে
যে কাল আমার লক্ষ্যের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,
তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারো নামটা,
ধিক থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১।৪।৩৫

নয়

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি;
দিতে পারবে কেন।
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে।
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।

ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে।
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার।
নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে
টুকরো-জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

চার দিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে;
হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁয়া;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল।
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে।
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায় নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,

আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে;
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে—
যারা বললে 'জানি', তারা জানল না।

শান্তিনিকেতন
২৭।৩।৩৫

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ী-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্‌ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।
দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্‌ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্র-ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের জলৎ-ধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর, তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতিহীন, বাক্যহীন, অর্থশূন্য।

এগারো

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচু শাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।

ছ'টা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ওই ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রঙ
মিলে গেছে আমার মনে।
আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবীগাছের তলায়।
পুব দিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে।
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দুর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রঙ হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে—
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে শিরশিরিয়ে,
টলমল করছে নালগাছের পাতা,
লাল মাছ কটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেবুঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।
তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই।
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ওই মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।

মানুষ আপন গড়া বাক্য অনেক কাল আগে
বক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরন্ধ করে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালরওয়ালা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস দুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ওই মেয়েটির দায়িত্ব।
জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান
ছোট্ট ওই মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে
আপন আনন্দভাণ্ডার থেকে।

বারো

কেউ চেনা নয়,
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।
সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।
সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে
বাঁধা মাইনের কাজ করে সে।
থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ,
তার জুড়ি কেউ নেই।
তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে,
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাই নে,
সেই অনুভব
'তিলে তিলে নূতন হোয়'।

তেরো

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে;
জানলে না এই গানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে,
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

চোদ্দো

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লি-ঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে;
বললে, 'তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।'
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।

সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দুবেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে
তার ডালপালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক,
এও গৌণ।

পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী কল্যাণীয়াসু

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাই নে;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

বেশ লাগছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

মনে পড়ে একদিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পালকিতে অপরাহ্নে;
কাহার ছিল আটজন।
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি:
আপন কর্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চলছিল পেরিয়ে
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে।
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান।

এই দূরে আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাই নে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চার দিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

২

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিই নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে;
এতদিন এই-সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে।
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, 'দেখলেম।'

সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে,
তিনিও নীরবে বলছেন, 'দেখলেম।'

আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
'খোলো আবরণ।'
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে;
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।

তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।

অমিতার আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা,
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে—
যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল, 'দেখো।'

এতকাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো, ফল ধরানো,

সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড।
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিকমিক করে রাতের বেলা।
বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন
হালকা চালের দল,
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।
কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,
ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে।
এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালো মন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা প্রশংসা।

২

মনটা আছে আরামে।
আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে
খ্যাতির লাগাম পড়ে নি।
নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসে নি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসে নি;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
'নাম রক্ষা কোরো'।
অথচ ওই নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার ক'রে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।
এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা করেই রয়েছে অনুপস্থিত—
আমার তুলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

৭ এপ্রিল ১৯৩৫

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায়;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ;
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।

সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

'আমি যে জানি'
এ কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক, সুরে হোক, রেখায় হোক,
সে পণ্ডিত।
'আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি',
এ কথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়ীতে বাজে সুর।

যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো—
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে।

আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান।
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে
—সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।

আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে
সে বলে—'মনে রেখো'।

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,
তার আহ্বান আসে চারি দিক থেকেই
মনের কাছে;
সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন
কখন হয় অগোচর।

যদি বা তার কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চলে।
তবু শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে,
'খুলব না দ্বার।'
প্রাণের ফসল-খেত বিচিত্র শস্যে উর্বর,
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি—
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে।
কিন্তু চায় না সে হার মানতে;
মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজ-কৃত কবরে।

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,

ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভর-সন্ধেবেলায়;
ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা,
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারি আবছায়া.
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে
ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধোজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।

এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাই নে—
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নীচে
রাঙামাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্ল নবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে;
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন।
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।

সভার লোকেরা বললে,
'একটা কিছু শোনাও কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।'
খুললেম পুঁথিখানা,
যত প'ড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে;
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীর-ঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে।
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।

এই পথের ধারের সভায়,
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন,

মুছে ফেলেছে সিঁদুর;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী;
যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন;
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দা-প্রশংসার ফাঁদে টেনে।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, 'কোথা যাও কবি।'
আমি বললেম,
'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।'

একুশ

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।
অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,

ব্যস্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে;
তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত,
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে,
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।
বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে, মোছা হচ্ছে।
বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেন্দজারো,
মরুবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো
অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।
বীরেরা বলেছিল
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।

কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,
রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নীচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃত ভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে।
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না:
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ওই একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হব আমরা।

ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে-সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীতকালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার ক'রে বসল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,
ওই প্রাচীন, ওই কাঙাল।

আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পুজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,
বাসনার দহনে,
ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক হব।
ও থাক্ ওইখানে দ্বারের বাইরে,
ওই বৃদ্ধ, ওই বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;
জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে,
ওই দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধ'রে যে এসেছে
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।

উপরের তলায় ব'সে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখদুঃখের আলো-আঁধারে।
দেখব যেমন ক'রে পুতুল নাচ দেখে;
হাসব মনে মনে।

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে

যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায় নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রঙ-বেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ পড়ে ওই জরির ঝালর।

শুনে ঘরের লোকে বলে,
'যদি না বাঁধ জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী ক'রে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে।'
আমি বলি,
'আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্নে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুশি থাকো।'

বন্ধু বললে,
'এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খ্যাপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন।'

আমি বলি, 'চলো-না ঝরনাতলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোল গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো,
কাকে ধরতে চায় ওই জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?'

সভার লোকে বললে,
'এ যে তোমার আবাঁধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায়?'
আমি বলি, 'তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।'
ওরা বললে, 'তবে মিছে কেন।
কী পাব ওর কাছ থেকে?'

আমি বলি, 'যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।
পাতার ভিতর থেকে
তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপ্‌টায়।
চার দিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় ক'রে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।'

পঁচিশ

পাঁচিলের এ ধারে
ফুলকাটা চীনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচি-ছাঁটা বেগুনি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর ক'রে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের;
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চার দিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।

পাঁচিলের ও পারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপ্টাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।
পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।
ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো।
আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত;
বললেম, 'টবের কবিতাকে

রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে।'

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুত-বিচ্ছুরিত আলোক-সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চার দিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।
প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হল দীন;
অর্থ গেল মুছে।
আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
'ভালোবাসি।'
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে
শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় করে নিয়েছে চার দিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।

তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয়-মহিমার মাঝে।
সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র—
তোমার নবকিশলয়ের মর্মে এসে মেলে·
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
'ভালোবাসি।'

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
'ভালোবাসি।'

যেদিন যুগান্তরের রাত্রি হল অবসান
আলোকের রশ্মিদূত
বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণ-সমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন।

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্ত-সাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্ভাসিত-
'ভালোবাসি।'

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে;
তার পরে কেবলই তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,
জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে বিনা ত্বরায়;
ওই যে সূর্যের আলোয়
উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ওই সঙ্গেই ছল্‌কে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।
সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারই পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের ধ্বনি
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ওই বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
রুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুকনো কাঠের আঁঠি বোঝাই-করা।

এমনি করে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।

বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,
শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
ঊর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।

বেলা হল,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ করে বললে,
'দেরি করলি কেন।'
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।
ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে;
বিনাকাজে উপচে-পড়া-সময় খোয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
শাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে

গোপনে রেখেছ তার 'পরে
সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি,
তোমাকে এমনি করেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবি-রশ্মিগ্রথিত-দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্‌ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটিবৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবি-চিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী
সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে

প্রভাতে মানব পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

উনত্রিশ

অনেককালের একটিমাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।
কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান-খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারে নি।

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে;
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির-লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।
আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তুলির
চিহ্ন লাগে নি।

একদা ছিলেম ওই দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা-কিছুর মধ্যে;
তারা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশে পাশে সামনে।
তাদের দেখে গেছি সবটাই
কিন্তু চোখে পড়ে নি সমস্তটা;
ভালোবেসেছি,
ভালো করে জানি নি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া;

আনমনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।
কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।
তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাই নি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে-সব বৃথা কথা।
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না,
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

ত্রিশ

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস;
সে আমাকে শুধাল,
'তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে।'

আমি বললেম,
'বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,
যেখানে ভেসে বেড়ায়

ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।'

শুনে সে রইল চুপ করে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।
আমার মনে লাগল ব্যথা,
বললেম, 'কী ভাবছ তুমি?'
ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,
'কেমন করে জানবে তাকে পেলে কি না,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে।'

আমি বললেম,
'আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারই ভিতর।'

কোনো কথা সে বলল না।
কচি শ্যামল তার রঙটি;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।
চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায় নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে।

দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ওইটুকু নিয়ে।
তার পরে সে চলে গেছে।

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মিটিং করে আমাকে পরিয়েছে মালা।

আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি
সেই ঘরের একটা ভাগে
টেবিলে পা তুলে
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক।
তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বন্ধ হাওয়া,
ছাইদানিতে জমতে থাকে
ছাই, দেশালাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুকরো।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভরে।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ,
কোনোদিন আপন মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারই আবৃত্তি।

আজ ওরা কেউ আসে নি;
গেছে হাবড়া স্টেশনে
অভ্যর্থনায়;
কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি।

যাকে বলে 'আজকাল'
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকীব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আট বছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব-কিছুতেই।
যেন কী শুনব বলে
রইল কান পাতা;
সেই ফুলকাটা ঢাকাওয়ালা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচুকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বলজ্বল করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টনটন করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ওই তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্টো একটি কথা।
সেদিন সকালে
কাগজ পড়া হয় নি কাজের ভিড়ে;
সন্ধেবেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে
এই কেদারায়।
চুপি চুপি সে এল পিছনে
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে।
চলল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে।

উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিস,
স্পর্ধা করে আবার বসলুম পড়তে।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো।
আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে,
যেমন করে সে আমাকে ঘিরেছিল
দুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে।

হঠাৎ ঝর্‌ঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ করে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।

আমি বলে উঠলেম,
'ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি পরে?'
একটা নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে,
শুনলেম অশ্রুতবাণী,
'কার কাছে আসব?'
আমি বললেম,
'দেখতে কি পেলে না আমাকে?'
শুনলেম,
'পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাই নে দেখতে
এই ঘরে।'
শুধালেম, 'সে কি নেই কোথাও?'
মৃদু শান্ত সুরে বললে,
'সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।'

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব—
হাবড়া স্টেশন থেকে
ওরা ফিরেছে।

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের কাজ-করা মেজে;
তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিট্‌মিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার
কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশকালো রঙ,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব-ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো ব'লে পাঠাল চরের মুখে,
'নমো-নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।'
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ করে দেয় রঘু।
বলে—'অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হোক তার বোঝা।'

একদিন তখন মাঝরাত্তির,
ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে—
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচসা করে;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশবনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
'দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।'
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গ,
মুখে ভুসোর কালি।

বিয়ে হল সারা।
তিন পহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত,
‘তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ কোরো রঘুকে।

তার পরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ

বাদশাহের হুকুম—
সৈন্যদল নিয়ে এল আফ্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।
থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,
চার দিকের দিক্‌সীমা পর্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি;
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।

গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরুদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চীৎকার করে
'ওয়াহি গুরু ওয়াহি গুরু',
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে।
চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।
বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায়।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে।
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন,
বালক শুধাল, 'আমার প্রতি কেন এই বিচার।'

শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে—
শিখধর্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল
বন্দী করে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, 'চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।'

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত,
সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন,
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলই দেখার জাল-বোনা নয়।
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে।

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য।
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্‌খানে।

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ।
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই।

ছত্রিশ

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগ্‌নি-ছায়ার ছোঁয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট

ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্যন্ত।
ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে
ধুলোর সাঙাত হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে,
'আমি আছি'।

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত;
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।
এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নীচে
শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী-
'আমি আছি',
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানি নে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
'আমি আছি'।

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরই দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।

সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে.
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারই আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপ-নিকুঞ্জের আকুতি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা।

ঊনচাল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।

বলছে সে, চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।
বলছে, চুপ করে বস' যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো।
বলছে, থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।

যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।

বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়,
বর্তমান গিলে ফেলতে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।
তার পরে অবিচল থাকতে চায়
আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায়।
তাকেই বলে প্রলয়।

এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।

চল্লিশ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে।
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।

কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চার দিকে,
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল,
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্তিত হতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে,
ম্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায়;
সে তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে.
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।

অবশেষে কখন
শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়,
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে।
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত।

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ পথে ও পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়ালো দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধুলায় হল নিবিড়।

আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
ঘুরে বেড়াল ধরাতলে
ফলের বাগানে ফসলের খেতে
আহৃত অনাহৃত।
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪২

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হোক
গিরিনদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজও সে সংকোচ করে না।

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের
রহস্যসখা।
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।
তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,

তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষি
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।

আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্যদলে,
তাই আমার বার্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে,
ফেলে দেন ধুলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আলখাল্লা প'রে।
যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামী সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিঁকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এসো আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত
প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার।
বস' তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়্‌গুড়িতে,
উছলে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হালকা ভাষায়,
যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চার দিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।
মানুষের যে পরিচয়
তার আপন সহজ ভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায় নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানিও জানা আছে।
গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,
পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে পরিচয় মুখ্য
সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পার।
তাই যখন-তখন দেখি
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো
কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,
সব-কিছুর কাছে-থাকা।
তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পার সবাইকে
অনায়াসে—
সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
থমকিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখে নি।
যেখানে আসন পাত'
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ
লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,
যে মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়,
যে মানুষ বাঁচে,
যে মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁধার পাকে।

সে মানুষ রাজাই হোক, ভিখিরিই হোক
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।

তার কথা যে-লোক পারে বলতে সহজেই
সে-ই পারে,
অন্যে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।

একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে—
নানা সমস্যা, নানা তর্ক,
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হল সমস্যা,
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয়;
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।
এ দুর্দিনে
মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—
প্রায়মারি, সেকেন্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।

সমুদ্রের ওপারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল
রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন্‌ কুইক্‌সোট্‌।
দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে;

লেক্‌চারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।
অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
একেই বলে গল্প।

বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।
আজকাল-এর ছাত্রেরা দেয়
আজকাল-এর দোহাই।
আজকাল-এর মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায় রে, আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটাদামের মার্কা-মারা
পসরা নিয়ে।
যা চিরকাল-এর
তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে
কাল উঠবে জেগে।
তখন মানুষ আবার বলবে খুশি হয়ে,
গল্প বলো।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্‌ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল,
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;

পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখি নে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়;
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।

সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,

কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল-বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন-ফোটা বেলফুলের মালা;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।

সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙ-করা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ-দরিয়ায়;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,

তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁয়া
আজও আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে,
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত?

অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি;

ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে;
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

সেই মাটির ছাদের নীচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোণা
এক-একমুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে।
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ওই মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁয়ায়;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়

স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায়;
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দুচোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়,
রাঙা পথের ও পারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে,
যেখানে সাথীবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষবেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে,
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলে নি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগে নি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছুডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।
যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখদুঃখের ওই সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।
ঋষিকবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন—
'ভুবন সৃষ্টি করেছ
তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে.
বাকি আধখানা কোথায়
তা কে জানে।'
সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায়;
দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষকথা ব'লে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

তার পরে বয়স হল
কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।
তারা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মর্যাদা।
একদিনের চিন্তা আর-এক দিনে হল প্রসারিত,
একদিনের কাজ আর-এক দিনে পাতল আসন।
সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে,
নতুন হতে থাকে না।
একটানা বয়েস কেবলই বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে শমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে।

আজ আমার প্রাচীকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে—
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে।

প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে শুধাবে
'তুমি কে'।
আজকের দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,
দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্য রূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দীদলের মতো
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

সংযোজন

স্মৃতিপাথেয়

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

যে মহা-অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোন্ দূর বনান্তের পথিকের গানে,
সে অপূর্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্তের তরে
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পূরবী।
পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে।
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

বাতাবির চারা

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্নবর্ষণ কোন্ শ্রাবণপ্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।

বহুকাল গেল চলি; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলি ঘুচালো যবে কৌতূহলী ভোরের আলোকে,
সহসা পড়িল চোখ—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে কথা আপনি শুনে পুলকেতে দুলে;
যেমন একদা কবে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকি মুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি
আনন্দসঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কী নিষ্ঠুর অন্তরালে—
সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে—
আকাশ জাগে নি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে,
তখনো যায় নি সরে দুরন্ত দক্ষিণসমীরণে।
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে।
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা
সেথা হতে শেষ অরুণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।

সেথা হতে ভেসে আসে
চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট মর্মর,
কোকিলের ক্লান্ত স্বর,
ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল—
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

এ আবেশ মুক্ত হোক;
ঘোর-ভাঙা চোখ
শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙ-করা দুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনারে পরিহাস করে।
মুছে যাক সেই ছবি—চেয়ে থাকা পথপানে,
কথা কানে কানে,
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
চোখে চোখে চাওয়া,
দুরুদুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া।

যে খেলা আপনা-সাথে সকালে বিকালে
ছায়া-অন্তরালে,
সে খেলার ঘর হতে
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে।
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত-কাঁটালতা-ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন্ গুন্ সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ—তেপান্তর মাঠের সে পথ
সাত সমুদ্রের তটে তটে
যেখানে ঘটনা ঘটে,
নাই তার দায়,
যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,
দিনরাত্রি যায় চলে
নানা ছন্দে নানা কলরোলে।

থাক্ মোর তরে
আপক্ক ধানের খেত অঘ্রানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে;
সোনার তরঙ্গদোলে
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে

কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
যেথায় অদৃশ্য সাথী লীলাভরে
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
খেলার নৌকার মতো।

দূরে চেয়ে রব আমি স্থির
ধরণীর
বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
যেথা শাল গাছে
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
নিস্তব্ধ গৌরবে।
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার
না করুক স্তূপাকার—
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে
যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগরসংগমে,
আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
গোধূলি নিঃশব্দ-রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন।

জোড়াসাঁকো
৫ এপ্রিল ১৯৩৪

দুঃখজাল

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।

সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের স্বপনশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা; পূর্বকালের কী আখ্যানে
উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে;
দুঃসহ কোন্ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা
করুণ গাথা;
দুর্দাম কোন্ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরাঙন যে উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,
তাহারি ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলনবিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে।
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

২৮ আষাঢ় ১৩৪১

মর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরনায়,
সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে?

কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারি নে 'প্রিয়ে
ভালোবাসি'?
কেন আজ সুরহারা হাসি,
যেন সে কুয়াশা-মেলা
হেমন্তের বেলা?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সংগীতে।
খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর;
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।
প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।
তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি
'ভালোবাসি'।

আপন হারানো বাণী খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্যোদয়মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগরপার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,

তোমার অন্তরতম,
সে কথা জাগুক প্রাণে মম,
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি—
'ভালোবাসি'।
তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।
নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা-পিপাসার,
এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী—
'ভালোবাসি'।

ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথী
এ আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নবসৃষ্টি-যুগের লগনে
মহাপ্রাণ-সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন।
সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ-গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে?
নিবিড় সংহত করি এ জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা-সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
'ভালোবাসি'।

ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
ঘট ভরে যায় বারে বারে—
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলই।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ওই হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,
বলদ দুটোর পিঠে বোঝাই
শুকনো কাঠের আঁঠি—
রুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

ঝর্‌ঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথহারানো দূর বিদেশে।
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়,
'দেরি করলি কেন?'
চুপ করে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো কেউ।

প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলিতে জাগায় দেহের-অতীত কথা।
খাঁচার পাখি যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূরে অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্যমর্মর।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারই জাল বোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে।

ভালোমন্দে বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্রি-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি? আর কিছু নেই?
দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন-তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ-বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ?
উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ?

১৫ নভেম্বর ১৯৩৪

আমি

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জড়ো,
কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো।

চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে;
দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী-পারানো।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।
শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি!
জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এই দেখো-না শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন-বনে সবুজ-মেশা সোনা,
শজনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগ্‌নি ছায়ার ছোঁয়া-লাগা স্তব্ধ বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরই মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামী।
কেননা আজ বুকের কাছে যায় যে জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

ওই যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছে
কখনো বা রৌদ্র খেলায়, কভু শ্রাবণধারা,
সারা বরষ থাকে আপনহারা

সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,
মাঘের শেষে যেন অকারণে
ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে—
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে
'আছি আছি, এই যে আমি আছি'।
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে, কভু কবির গানে
অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী;
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
'আছি আমি আছি'—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী
তারার মাল্য পরি।

১১।১।[১৯]৩৪

আষাঢ়

নব বরষার দিন
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন।
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরস প্রহরে
ধরণীর দৈন্য-'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত—
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।

দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরই দহনে
অহনে অহনে;
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো,
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো;
নির্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা,
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।
নির্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ।
সফল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি;
দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্‌বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে।
'জয় তব জয়'
গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়।

যক্ষ

হে যক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দুজনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল—

আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হল পূর্ণ বিকশিত; জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারি ধারে
সান্ধ্য অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে-সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি; নীপনিকুঞ্জের জানালো আকূতি
রেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা
উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্‌বধূ-প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের; নিত্যরসে
আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মূরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খ রবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সংগীত তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হলে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্‌ঘাটিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।

দার্জিলিং
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

বীথিকা

অতীতের ছায়া

মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি;
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে;
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি;
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে যেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে;
যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।
সেথা বসে আছি কাজ ভুলে
অস্তাচলমূলে
ছায়া-বীথিকায়।
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন,
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত।
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে.
অতীতের সেই ধ্যানলোকে—
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্মৃত রাতির।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখদুঃখনিষ্কৃতির পারে।

শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।

আজ আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে
তোমারি বিহারবনে ছায়া-বীথিকায়।
ঘুচিল কর্মের দায়,
ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।
কলকোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়.
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা.
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।

শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই - ২ অগস্ট ১৯৩৫

মাটি

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি; হেথা করি ঘোরাফেরা
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা
বর্তমানে।
মন জানে
এ মাটি আমারি,
যেমন এ শালতরুসারি
বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে
দূর শতাব্দীর অধিকারে।

হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি,
ভোরে ঘুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার,
যেন সে আমারি আপনার
এ মাটির সীমাটুকু-মাঝে।
আমার সকল খেলা, সব কাজে,
এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।

হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন
সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে,
ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
এই ভূমিখণ্ড-'পরে
তারা এল, তারা গেল কত।
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি,
জেনেছিল একান্ত এ তাহাদেরি।
কেহ আর্য কেহ বা অনার্য তারা,
কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।
কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,
কেহ বা দিয়েছে নরবলি।
এ মাটিতে একদিন যাহাদের সুপ্তচোখে
জাগরণ এনেছিল অরুণ আলোকে
বিলুপ্ত তাদের ভাষা।
পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে।

আসে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘরৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে।
কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিংবা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়ে নি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।

হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া—উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে!—
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল-তরে।

শান্তিনিকেতন
২ অগস্ট ১৯৩৫

দুজন

সূর্যাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
দুজনে বসেছে পাশাপাশি।
সমস্ত শরীরে মনে লইতেছে টানি
আকাশের বাণী।
চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা,
স্তব্ধ চঞ্চলতা।
একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
বক্ষ করেছিল দুরু দুরু
অনির্বচনীয় সুখে।
বর্তমান মুহূর্তের দৃষ্টির সম্মুখে
তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।
সে মুহূর্ত পরিপূর্ণ, নাই তাহে বাধা,
দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,
নাইকো সংশয়।
সে মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো,
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে মুহূর্ত উৎসের মতন,
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সব-কিছু দান।
সে সম্পদ দেখা দেয় লয়ে নৃত্য, লয়ে গান,
লয়ে সূর্যালোকভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।
সে মুহূর্তধারা
ক্রমে আজ হল হারা
সুদূরের মাঝে।
সে সুদূরে বাজে
মহাসমুদ্রের গাথা।
সেইখানে আছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে।
সর্ব দুঃখ সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।

সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সংগে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।

সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হয়ে চেয়ে আছে সুদূর গগনে।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।
ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে ভাষা
করিয়াছে বাসা,
অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া অক্ষরে.
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলনলিপি. চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে।

শান্তিনিকেতন
২৫ জুলাই ১৯৩২

রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,
আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি।
দিন যার ক্লান্ত হল, তারি লাগি কী এনেছ বর,
জানাক তা তব মৃদু স্বর।
তোমার নিশ্বাসে
ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।
বুঝিবা বক্ষের কাছে
ঢাকা আছে
রজনীগন্ধার ডালি।
বুঝিবা এনেছ জ্বালি
প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা—
গোপন আলোক তারি ওগো বাক্যহারা,
পড়েছে তোমার মৌন-'পরে—
এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে
বিষাদের মতো শান্ত স্থির।
দিবসে সুতীব্র আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর,

নিরন্তর আন্দোলন,
অনুক্ষণ
দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল।
তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে।
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।
সপ্তর্ষির তপোবনে হোমহুতাশন হতে
আনো তব দীপ্ত শিখা। তাহারি আলোতে
নির্জনের উৎসব-আলোক
পুণ্য হবে, সেইক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্দ্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির।

৭ মাঘ ১৩৩৮

ধ্যান

কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে।
শেষ করে দিনু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ক্ষুব্ধ কামনার
দুঃসহ ধিক্কার।
বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহতারা,
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।

নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।

নাই সময়ের পদধ্বনি
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার,
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব,
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা,
আমি-হীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

৩ জুলাই ১৯৩২

কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি।
চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

প্রভাত উঠিল ফুটি।
অরুণরাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোত-কপোতী দুটি।
ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে,
প্রাণকল্লোলে মুখর পল্লীবাটে।
আমি কহিলাম, 'তোমাতে আমাতে চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো,
নৌকা রয়েছে ঘাটে।'

স্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুখে দুখে গেছে ভরি,
আছে গানে-গাঁথা কত কান্না ও হাসি।

পেলব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা-ভোলা।

বাতাস লাগিল পালে।
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে
মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে।
আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্‌ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ী নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিনু ভাসি।

তুমি ভেসে চল সাথে।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি স্নেহ হাত মিলেছে আমার হাতে।
গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পূরবীতে।

চিনি, নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে মর্ত্যভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মূরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে।

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে

কোন্ পার হতে এসে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূরে,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দনফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

৯ মাঘ ১৩৪০

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে,
মনে হল তুমি,
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোকতলে মগ্ন হলে প্রসুপ্ত প্রহর
পড়িব তখন।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
তোমার স্মরণ।

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি,
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজরথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে,
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রান্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন-অবসানে,
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূর-পানে।

মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে,
প্রত্যহের জানাশোনা, তবু তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন।
এই কুজ্ঝটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দিন।

সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য উঠে সহসা শিহরি;
না কহিয়া কথা
কখন যে আস কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্টতা।
তখন বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকাল-দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্রমন্দিরে;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে।

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল, সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা,
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে;
সেই তো বাখানে
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

৫ শ্রাবণ ১৩৪০

প্রত্যর্পণ

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়াবাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
নানা রশ্মিতে রাঙা;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃতপাত্র-ভাঙা।

কামনা তোমায় বহে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে।

ওই-যে মূরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
আমার প্রাণের নিশ্বাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে;
এর মাঝে এল শিল্পের শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোমহুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদুমন্ত্রের ধ্বনি।

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে।
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয়-হাত হতে পরো পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে করো তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

১২ মাঘ ১৩৪০

আদিতম

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে
চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,
বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,
থাকে অশ্রুত সুরে।
ভাবি বসে, গাব আমি তারি গান,
চুপ করে থাকি সারা দিনমান,
অকথিত আবেগের ব্যথা সই।
মন বলে, কথা কই কথা কই!

চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্ঝার আলোড়ন
ছেদ করি বাষ্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক

কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে,
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
সেই সুর মনে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন;
মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গিতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি-ওঙ্কার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।
ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

[শান্তিনিকেতন]
৮ বৈশাখ ১৩৪১

পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ পরি নি বেশ
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।

বাদলছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল!

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতিমাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।
নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ।

নাই বা তার শুনিনু নাম
কভু তাহারে না দেখিলাম
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি,
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি

গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরই।

ওগো আমার কবি,
জান না তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটে নি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্‌ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি।

[শান্তিনিকেতন]
বৈশাখ ১৩৪১

ছায়াছবি

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।
উষার নিল মুকুট কাড়ি
শ্রাবণ ঘনঘোর;
বাদলবেলা বাজায়ে দিল তূরী,
প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।
সকাল হতে অবিশ্রামে
ধারাপতনশব্দ নামে,
পরদা দিল টানি,
সংসারের নানা ধ্বনিরে
করিল একখানি।

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্ম-দিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন মন-গড়া,
হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে হবে যে পড়া।
থামায়ে গান চাহিনু পশ্চাতে;
ভীরু সে মেয়ে কখন এসে
নীরব পায়ে, দুয়ার ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে খাতা ও বহি হাতে।

করিনু পাঠ শুরু।
কপোল তার ঈষৎ রাঙা,
গলাটি আজ কেমন ভাঙা,
বক্ষ বুঝি করিছে দুরু দুরু।
কেবলি যায় ভুলে,
অন্যমনে রয়েছে যেন
বইয়ের পাতা খুলে।
কহিনু তারে, আজকে পড়া থাক্।
সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি
চাহিল নির্বাক।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,
ভাবি নি ফিরে তারে।
গিয়েছে তার ছায়াস্মৃতি
কালের খেয়াপারে।
স্তব্ধ আজি বাদলবেলা,
নদীতে নাহি ঢেউ,
অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।
হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে,
সেই-যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

চন্দননগর
৪ আষাঢ় ১৩৪২

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে যেন এক কালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক্‌ সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে,
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফল্‌সাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গির সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গদ্য জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।

তা হোক, তবুও লেখকের অয়া প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা,
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।
তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে,
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, নাহয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,
বরদানে, দেবী, নাহয় হইবে বাম;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে,
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা,
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো,
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।

কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
　　শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে,
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
　　লোভন হয়েছে রেশম-চিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
　　সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি,
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
　　কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি!
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি—
　　গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি,
　　শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
　　দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ, ভাবিব না তা,
　　শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব-জানালার ধারে
　　পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে,
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
　　আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
　　বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
　　চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

•

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
　　আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
　　চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
　　এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
　　আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা,
　　স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
　　তব করতল মোর করতলে হারা।

চন্দননগর
১৪ জুন ১৯৩৫

ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা-খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন কাটাবার;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধুলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমন্তন্নে নয় পাঠাবার।
বয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি,
ভাবনাগুলো উড়ো উড়ো আপনাভোলা।
অযতনের সঙ্গী তাহার ধুলোমাটি,
বাহির-পানে পথের দিকে দুয়ার খোলা।
আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,
ললাটে তার রুক্ষ কেশের অবহেলা।
নাইকো খেয়াল কখন সকাল পেরোয় দুপর,
রেশমি ডানায় যায় চলে তার হালকা বেলা।
চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,
দ্বারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকো আমার পিছু।
শুধাও যদি প্রশ্ন কোনো, তাকিয়ে রবে
বোকার মতন— বলার কথা নেই-যে কিছু।
ধুলায় লোটে রাঙাপাড়ের আঁচলখানা,
দুই চোখে তার নীল আকাশের সুদূর ছুটি,
কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,
মুখের 'পরে কে রাখে তার নয়নদুটি।
মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে;
তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলছে বেঁকে,
দোয়েল-ডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে দুলে।
সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কামিনী ফুল
আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।
বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল
দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।
তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
তুলসীঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।
খামখেয়ালি একটা ভ্রমর আশে-পাশে
গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্ বনান্তরে।
পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
শেখার মতো কোনো কিছুই হয় নি শেখা,
আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।

সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে,
শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে,
পাতার শব্দে জলের শব্দে পাখির ডাকে
প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান সুরে।
সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা,
বিশ্বমাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত,
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত।

চন্দননগর
৬ জুন ১৯৩৫

নাট্যশেষ

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম:
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি পশ্চিম-আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ-ছদ্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন,
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গি নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা,
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হল হারা।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্বমহাকবি-কাছে
প্রকাশিত। নটনটী রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য বলে জেনেছিল প্রত্যহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থানপতন বেদনার। অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল, নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা,
ম্লান হল অঙ্গরাগ, বিচিত্র চাঞ্চল্য গেল থেমে,
যে নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে
স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
দুঃখসুখভঙ্গি অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জাভয়ের ব্যঞ্জনা। যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ, শুধু তারে কবির নাটক
কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

২

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়। সেদিনের সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ;
সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু।
অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয় বোনা
আতপ্ত ফাল্গুনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে, বিঁধে আলোকের সূচি;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

[চন্দননগর
আষাঢ় ১৩৪২]

বিহ্বলতা

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে
পল্লবের সমারোহে।
মনে পড়ে, সেই আর কবে
দেখেছিনু শুধু ক্ষণকাল।
খর সূর্যকরতাপে
নিষ্ঠুর বৈশাখবেলা ধরণীরে রুদ্র অভিশাপে
বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজালে।
শুষ্ক তরু,
ম্লান বন,
অবসন্ন পিককণ্ঠ,
শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন।
সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার,
জ্বালাময় আঁখি,
বর্ণচ্ছটাহীন বেশ,
নির্বিকার
মুখচ্ছবি।
বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-'পরে
নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্বরে
করেছি বন্দনা।
জানি সে না-শোনা সুর গেছে ভেসে
শূন্যতলে।
সেও ভালো, তবু সে তো তাহারই উদ্দেশে
একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার,
অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য,
সেই জানি গৌরব আমার।
আজ ক্ষুব্ধ ফাল্গুনের কলস্বরে মত্ততাহিল্লোলে
মদির আকাশ।
আজি মোর এ অশান্ত চিত্ত দোলে
উদ্‌ভ্রান্ত পবনবেগে।
আজ তারে যে বিহ্বল চোখে
হেরিলাম, সে যে হায় পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে
মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা।
তাই মোর কণ্ঠস্বর
আবেগে জড়িত রুদ্ধ।
পাই নাই শান্ত অবসর
চিনিবারে, চেনাবারে।
কোনো কথা বলা হল না যে
মোহমুগ্ধ ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে।

ফাল্গুন ১৩৩৮?

শ্যামলা

হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ,
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার আকাশসম সকল চঞ্চল চিন্তাহরা।
আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার
সমুদ্রের পরপার,
গোধূলিপ্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি;
অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝংকার।
অগীত সে সুর
মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে সুদূর
হিমঘন তপস্যায় স্তব্ধলীন
নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন।
জলভারনত মেঘে
তমালবনের 'পরে আছে লেগে
সকরুণ ছায়া সুগম্ভীর—
তোমার ললাট-'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির।
ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা
কলশব্দহারা।
তাহারই বিষাদ কেন
অতল গাম্ভীর্য লয়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।
শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক মুখখানি।

২৯ জুলাই ১৯৩২

পোড়োবাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে;
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে
তুমি আছ এ ভুবনে।

পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব।
তোমার শয়নঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।
প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে।
সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।
সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ,
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।
নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনার কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে!
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি।
আজ যদি তুমি এস কোথা তব ঠাঁই,
সে তুমি তো নাই।
আজিকার দিন
তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন।
তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়োবাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি:
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

৩ অগস্ট ১৯৩২

মৌন

কেন চুপ করে আছ, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরে যায় হেসে।
মৌনের বিপুল শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আহ্বানে, রবাহূত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই;
আর্দ্র স্বরে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হিমাদ্রিশিখরে নিত্যনীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারি ধার,
নির্লিপ্ত সে সুদূরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান,
মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজস্র সহস্রধারে
পূণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক দিন।

১৮।১।৩৪

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা
শরমে তাই মলিন মুখ নত
দাঁড়ালে থতমতো,

তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো,
শুধালে তবু কথা কিছু না বল,
অধর থরোথরো,
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধর।

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা দুটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়,
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।
তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি
বুঝিতে তাহা পারি নি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-'পরে
ছিলে যে সমাদরে
তুষারসম শুভ্র সুকঠিন।
নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারও ক্ষমা চাহি—
তখনই জানি আমারই তুমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে।

৬ বৈশাখ ১৩৪১

ব্যর্থ মিলন

বুঝিলাম এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।
ক্ষুব্ধ মন
যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে
তোমারে হারায় হতাশ্বাস।
তব হাতে
দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল পরশে
করিছে কৃপণ কৃপা। কর্তব্যের বশে
যে দান করিলে তার মূল্য অপহরি
লুকায়ে রাখিলে কোথা,
আমি খুঁজে মরি
পাই নে নাগাল। শরতের মেঘ তুমি
ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও,
মরুভূমি
শূন্য-পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি করে হাহাকার।
ভয় করিয়ো না মোরে।
এ করুণাকণা
রেখো মনে—ভুল করে মনে করিয়ো না
দস্যু আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর।
জেনো মোরে
প্রেমের তাপস।
সুকঠোর ব্রত ধ'রে
করিব সাধনা,
আশাহীন ক্ষোভহীন
বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন।
ছাড়িয়া দিলাম হাত।
যদি কভু হয়
তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়।
না-ও যদি ঘটে, তবে আশা-চঞ্চলতা
দাহিয়া হইবে শান্ত। সেও সফলতা।

১৩৩৮?

অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাক'
কেন ঢাক'
মিথ্যা মোর কাছে।
শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে
যে হাতে তোমার কণ্ঠে পরায়েছি বরণের হার।

শাস্তি এ আমার।
ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্যে কি ভেবেছিনু তাই
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই।

রুষ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।
যা ঘটিল তাই আমি করিনু স্বীকার।
ক্ষমা করো মোরে।
আপনারে রেখেছিনু কারাগার ক'রে
তোমারে ঘিরিয়া,
পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া
দিনে রাতে।
কখনো অজ্ঞাতে
যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার।
বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার
সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে।
বসেছি আসন পেতে
যেখানে স্থানের টানাটানি।

হায় জানি
কী ব্যথা কঠোর।
এ প্রেমের কারাগারে মোর
যন্ত্রণায় জাগি
সুড়ঙ্গ কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি
দোষ দিব কারে।
শাস্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধদ্বারে।
সে শাস্তির হোক অবসান।
আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিধির বিধান।

[২ ফাল্গুন ১৩৩৮]

বিচ্ছেদ

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা;
হল না সহজ পথ বাঁধা
স্বপ্নের গহনে।
মনে মনে
ডাক দাও পরস্পরে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে;
তবু ঘটিল না কোন্ সামান্য ব্যাঘাতে
মুখোমুখি দেখা।

দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস;
চৈত্রের আকাশ
রৌদ্রে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান;
আসে দোয়েলের গান;
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা।
উভয়ের আনাগোনা
আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে
চকিত নয়নে।
পদধ্বনি শোনা যায়
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনবীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে
বলিবে, 'যে মায়াডোরে
বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে,
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে।'

দার্জিলিং
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

বিদ্রোহী

পর্বতের অন্য প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
নির্ঝরিণী;
এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে।
শুধু ওই ধ্বনি
তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে।
কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার
মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যস্রোত।
ওই ধ্বনি আমার স্বপন
চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়।

মূঢ়ের মতন
ভুলিব না তাহে কভু।
জানিব মানিব নিঃসংশয়
দুর্লভেরে মিলিবে না;
করিব কঠোর বীর্যে জয়
ব্যর্থ দুরাশারে মোর।
চিরজন্ম দিব অভিশাপ
দয়ারিক্ত দুর্গমেরে।
আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।
পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।

চন্দননগর
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

আসন্ন রাতি

এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর।
শীতের সন্ধ্যা সাজায় বাসরঘর।
কালপুরুষের বিপুল মহাঙ্গন
বিছাল আলিম্পন,
অন্তরে তোর আসন্ন রাতি
জাগায় শঙ্খরব,
অস্তশৈলপাদমূলে তার
প্রসারিল অনুভব।

বিরহশয়ন বিছানো হেথায়,
কে যেন আসিল চোখে দেখা নাহি যায়।
অতীতদিনের বনের স্মরণ আনে
ম্রিয়মাণ মৃদু সৌরভটুকু প্রাণে।
গাঁথা হয়েছিল যে মাধবীহার
মধুপূর্ণিমারাতে
কণ্ঠ জড়াল পরশবিহীন
নির্বাক বেদনাতে।

মিলনদিনের প্রদীপের মালা
পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা,
আজি আঁধারের অতল গহনে হারা
স্বপ্ন রচিছে তারা।

ফাল্গুনবনমর্মর-সনে
মিলিত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তব্ধ বাণী।

কী নামে ডাকিব, কোন্ কথা কব,
হে বধূ, ধেয়ানে আঁকিব কী ছবি তব।
চিরজীবনের পুঞ্জিত সুখদুখ
কেন আজি উৎসুক।
উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে
আমার বক্ষোমাঝে
শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে
সাহানায় বাঁশি বাজে।

আজ বুঝি তোর ঘরে ওরে মন
গত বসন্তরজনীর আগমন।
বিপরীত পথে উত্তর বায়ু বেয়ে
এল সে তোমারে চেয়ে।
অবগুণ্ঠিত নিরলংকার
তাহার মূর্তিখানি
হৃদয়ে ছোঁয়ালো শেষ পরশের
তুষারশীতল পাণি।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতির্বিজড়িত বেণী,
চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধাপিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে।
অনাদিবীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্মমরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসিক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের

পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে, যেখানে বিদ্যুৎসূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি,
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

চন্দননগর
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

ছবি

একলা বসে, হেরো তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া—
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখপানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়াল প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরী
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া।

ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি।
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়-গিরিশিখর পানে
অস্তমহাসাগরতট হতে—
নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।
প্রথম সেই প্রভাত-দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি?
চিররাতের তোরণে থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।
বেসেছি ভালো এই ধরারে,
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান,
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম;
অনেক তৃষা অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

বরষ আসে বরষশেষে,
প্রবাহে তারই যায় রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারে বারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন সৃষ্টিলীলাভরে।
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে জানি তা জানি,
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা সুরের ভিড়ে

রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।
ফাল্গুনের আমন্ত্রণে
জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে
পড়েছে ঝরি চৈত্রবায়ে কাঁপা।
অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে
ভাঙন হল চরম প্রিয়তম,
সাজাতে পূজা করি নি ত্রুটি,
ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি,
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

[৭-১০ এপ্রিল ১৯৩৪]

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে;
কহিনু, 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ,'
হায় রে তখনো মনে স্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।

আশা ছিল কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত,
বুঝি বা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

শান্তিনিকেতন
৯ শ্রাবণ ১৩৪১

দানমহিমা

নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে—
নিত্য অফুরান
আপনারে করে দান।
সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল,
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তব্ধ নিস্তল।
চির-অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে,
ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে
অনিঃশেষ রস করে পান,
অজস্র পল্লবে তার করে স্তবগান।
তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।
তুমি কর বরদান দেবীসম ধীর আবির্ভাবে
নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গম্ভীর প্রভাবে।
তোমার সামীপ্য সেই
নিত্য চারি দিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা—চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে।
ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই, ভেদ নেই মাঝে।

৪ অগস্ট ১৯৩২

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।

আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারই মাঝে রহে দূর।

নির্মম হতে কুণ্ঠিত হও মনে;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি,
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুনরাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি,
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণবায়ু তরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি,
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে।

উত্তরবায়ু আমি ভিক্ষুকসম
হিমনিশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় ক্বচিৎ একটি ফুটে,
অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্পকলি।

যত মনে ভাবি রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে।
বরণমাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা।

১০।১।৩৪

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী
ঝরে গেল, তারে কেন লও সাজি ভরি।
সে শুধিছে তার ধূলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা।

মরুপথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পারে',
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো?
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।
হায় গো, ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,
বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি,
ধুলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি।
নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ।
যাহা ভুলিবার তাহা নহে তুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার!
প্রতি পলকের নানা দেনা-পাওনায়
চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে; চল-তরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পের মায়া, নির্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি।
বিস্মৃতিপটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।
হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মান' সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড় তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার,
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে,
যাহারা আনাগোনার পথে
ফেরে কত কী খোঁজে?
হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে,
জীবনপ্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নহে।
ওরা তো কথা কহে,
সে-সব কথা মূল্যবান জানি,
তবু সে নহে বাণী।

রাতের পরে কেটেছে দুখরাত,
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।
সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নির্মম,
বহ্নিতুলিসম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোয়ানো দীক্ষা তারই নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে,
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে?

হায় রে রূপকার,
নাহয় কারো কর নি উপকার,
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।
পাঁজর-ভাঙা কঠিন বেদনার
অংশ নেবে শকতি হেন বাসনা হেন কার!
বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি,
জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা,
সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি
যে প্রেম সব-হারা,
করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।
কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
মর্মমাঝে করে নি আঁখিপাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়,
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,

করে না ক্ষমা কভু,
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার;
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়ামাঝে,
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

১০ এপ্রিল ১৯৩৪

মেঘমালা

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে
আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায়;
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,
গিরিরাজ কঠোরতা যায় ভুলি,
চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় তুলি
সজল তরুণ মেঘমালা।
কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা।
অচলে চঞ্চলে লীলা,
সুকঠিন শিলা
মত্ত হয় রসে।
উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ঝরে বরষে,
গায় কলোচ্ছল গান।
সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান
এ মেঘমালারই।
এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে
নৃত্যবন্যাবেগে
বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করে,
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।
নির্মমের তপস্যা টুটিয়া
চলিল ছুটিয়া
দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,
জয়ের উৎসাহ;

শ্যামলের মঙ্গল উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে।
লঘু সুকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে
রুদ্র সন্ন্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে
দিল ছাড়া; সৌন্দর্যের বীর্যবলে
স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি দিল ধরাতলে।

শান্তিনিকেতন
৫ অগস্ট ১৯৩৫

প্রাণের ডাক

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রাম পারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ না-ই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,
যেথা সেথা করে চলাফেরা।
উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে।

জোয়ার লেগেছে জাগরণে,
কলোল্লাস তাই অকারণে,
মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কী মদিরা গোপনে মাতায়,
অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে,
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
কেন চারি ধারে।
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক-না উৎসুক,
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ,

ফেলো জাল চারি দিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে,
ঝিনুক শামুক যাই হোক।

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
ওঠো তবু ওঠো,
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথপানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো,
আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

জোড়াসাঁকো
৭ এপ্রিল ১৯৩৪

দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি—
যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুদুর্গতলে
প্রস্তরশৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগযুগান্তরে।
যে প্রথম যুগে তুমি দেখা দিলে নির্জন প্রান্তরে,
রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস
উদ্‌ঘাটন করি দিল ভবিষ্যের ইতিহাস,
জীবের কঠিন দ্বন্দ্ব অন্তহীন,
দুঃখে সুখে যুদ্ধ রাত্রিদিন,
জেবলে ক্ষোভহুতাশন
অন্তর-বিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন
শিখার রসনা
অশান্ত বাসনা।
স্নিগ্ধ স্তব্ধ রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে
ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা,
তারই মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা
মহানাট্য জীবনমৃত্যুর,
কঠিন নিষ্ঠুর
দুর্গম পথের দুঃসাহস।

যে পতাকা ঊর্ধ্বপানে তুলেছিলে নিরলস,
বলো কে জানিত তাহা নিরন্তর যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি দিয়ে ঢাকা।
কে জানিত, আজ আমি এ জন্মের জীবন মন্থিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে,
সে যুগের বসন্তবায়ুতে
প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি
তুমি বনস্পতি,
মোর জ্যোতিবন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি।

২৬ চৈত্র ১৩৩৯

কবি

এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মরু না,
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।
মাঘ মাসে শুরু হল অনুকূল করদান,
অন্তরে কোন্‌ মায়ামন্তরে বরদান।
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলে নি মোর বয়সের কথা সে।
ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায়।
সৌরভ-গরবিনী তারামণি লতা সে
আমার ললাট-'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পকতরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার।
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
দোয়েল মিলায় তান সে আমারই গানে যে।

পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিকবনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারই ভণিতা।

বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথা সেথা হায়,
আমি না রহিলে বলো কথা দেবে কে তাহায়।
পুষ্পচয়িনী বধূ কিংকিণীক্কণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার সুরে ধ্বনিতা।

[দার্জিলিং]
৮ কার্তিক ১৩৩৮

ছন্দোমাধুরী

পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ
চলেছে তাহে কালের রথ,
ঘুরিছে তার মমতাহীন চাকা।
বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া,
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।
নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে
দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসাহলাহল।
অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল।
হতাশ হয়ে যেদিকে চাহি
কোথাও কোনো উপায় নাহি,
মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
অন্যায়ের প্রলয়ানলশিখা।

সহসা দেখি সুন্দর হে,
কে দূতী তব বারতা বহে
ব্যাঘাত মাঝে অকালে অস্থানে।
ছুটিয়া আসে গহন হতে
আত্মহারা উছল স্রোতে
রসের ধারা মরুভূমির পানে।
ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।

ভরিয়া ঘট অমৃত আনে,
সে কথা সে কি আপনি জানে,
এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।
প্রবল এই মিথ্যারাশি,
তারেও ঠেলি উঠেছে হাসি
অবলারূপে চিরকালের আশা।

১১ চৈত্র ১৩৩৮

বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ
—হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে
ভাবি মনে মনে
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়।
ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।
দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়,
রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয়।

বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
দুঃখ লজ্জা ভয়
ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে
রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।
এই ত্রুটি দেখেছি যখন
শুনি নি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন

যুগে যুগে উচ্ছ্বসিতে থাকে?
দেখি নি কি আর্তচিত্ত উদ্বোধিয়া রাখে
মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে?

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে
মরণেরে হানি,
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি।

শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৪২

রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরাল।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা।

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল বলে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বনবীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি।

আঁধারে-ফোটা সে ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে-ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো আঁখিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী;
সে শুধু আনে পাই নি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটে নি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি।

স্বপনে-ঘেরা সুদূরে তারা নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা কবে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ।

১৯ আষাঢ় ১৩৪১

নব পরিচয়

জন্ম মোর বহি যবে
খেয়ার তরী এল ভবে
যে-আমি এল সে তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু বারে বারে
প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সব চেয়ে।

হঠাৎ যবে হেনকালে
আবেশ-কুহেলিকাজালে
অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি
আমার নব পরিচয়
চমকি উঠে মনোময়—
নূতন সে যে, নূতন তারে জানি।

বসন্তের ভরাস্রোতে
এসেছিল সে কোথা হতে
বহিয়া চিরযৌবনেরই ডালি।
অনন্তের হোমানলে
যে যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
সে শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

মিলিয়া যায় তারি সাথে
আশ্বিনেরই নবপ্রাতে
শিউলিবনে আলোটি যাহা পড়ে,
শব্দহীন কলরোলে
সে নাচ তারি বুকে দোলে
যে নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে।

এ সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে মানব
নিজেরে দেখি সে পথিকের পথে।

সংসারের ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
মুক্ত রাখে পাখাটারে,
ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ সব ক্ষতি
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

শান্তিনিকেতন
২৯ এপ্রিল ১৯৩৪

মরণমাতা

মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ,
বুকের এ যে দুলাল তব, তোমারি এ যে দান।
ধুলায় যবে নয়ন আঁধা,
জড়ের স্তূপে বিপুল বাধা,
তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান।

নবদিনের জাগরণের ধন,
গোপনে তারে লালন করে তিমির-আবরণ।
পর্দা-ঢাকা তোমার রথে
বহিয়া আন প্রকাশপথে
নূতন আশা, নূতন ভাষা, নূতন আয়োজন।

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি
নূতন ভালোমন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি,
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।
নিখিলধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি,
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

৪ মাঘ ১৩৩৮

মাতা

কুয়াশার জাল
আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল—
সেইমতো ছিনু আমি কতদিন
আত্মপরিচয়হীন।
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো করেছিনু অনুভব
কুমারীচাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত গৌরব,
যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,
অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,
পুষ্পকোরকের বক্ষে আগোচর ফলের মতন।
তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,
অপূর্ব প্রভাতরবি,
আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তরগুহায় ছিল স্থির,
সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হতে,
সুদীর্ঘকালের পথে
চলিল সুদূর ভবিষ্যতে।
যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে,
গৃহের কোণের তাহা নহে।

আমার হৃদয় আজি পান্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কারে ডেকে আনিলাম
অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।
এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্য-গানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ,
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।

বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন;
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

বরানগর
৮ অগস্ট ১৯৩২

কাঠাবড়াাল

কাঠবিড়ালির ছানাদুটি
আঁচলতলায় ঢাকা
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।
এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে।
চাঁপাগাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁজের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমনধারা,
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,
লেবুর ডালে খুশি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে

একটু যখন গন্ধ নিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে,
দুপুর বেলায় পাখি যেমন
দেখতে না পাই যাকে
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল সুরে ডাকে,
তেমনিতরো ওই ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।

দুঃখসুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবন-পথের ধারে
গোপন কোণে কোণে,
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত,
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মতো।

শান্তিনিকেতন
২২ আষাঢ় ১৩৪১

সাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকর-বিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্‌ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু হাতে তার সাদা-রাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,

মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।
পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের ক্বচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া-গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলা-ফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধা-ভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরি,
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

শান্তিনিকেতন
৪ মাঘ ১৩৪১

মিলনযাত্রা

চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্ব নিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি;
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি:
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহজে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরণী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, 'মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।'

যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে দুয়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড ত্রস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে।
যে আসনে বসিত সে তারও চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।

প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম. এ. ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যোগে মেশে তারও লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হতে; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অনুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক-রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে;
সদ্যবাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল;
চুরি করে খাতা খুলে
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দুজনের এ ছেলেমানুষি,
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।

হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি
রাঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, 'মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।

জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।
কথা যদি দাও প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।'

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তাঁর উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
'এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।'

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
'করিয়ো না ভুল;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে,
তাই বলে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।'

ঈর্ষাবিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে—
'ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!
অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।
যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন,
আমারি শাসন,
আর কারো নয়,
আজি আমি দেব তার পরিচয়।'

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাসুতা-বোনা।
কানে ছিল সোনা,
কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার,
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে, হতে গেল পার
সদরের দ্বার,
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে. 'এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো।'

শান্তিনিকেতন
৫ ভাদ্র ১৩৪২

অন্তরতম

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছু পিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।

হাটের হাওয়া ধুলোয় ভরপুর
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর—
সকল হতে দুর্লভ তা, তবু সে নহে বেশি;
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্কমাটি-'পরে

হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পশলা বৃষ্টিবরিষন,
দুঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।
অনেক দুরাশারে
সাধনা করে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,
করি নি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধি নি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে,
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

শান্তিনিকেতন
৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ,
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে,
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
প্রাচীনের সমুদ্রসীমায়
নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে
তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে,
দিনে দিনে পথিকের দল
ক্লিষ্টপদতল
তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রিপানে ধায় নিরুদ্দেশ,
আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ।
তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্গমে,
ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে।

প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে
দিগন্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন সামমন্ত্র-গাথা।

তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্ত্যধন;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের সুরে।
সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
সৃষ্টির প্রথম বাণী;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত।

২ অগস্ট ১৯৩২

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্যবলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ।
মানুষের বশ-মানা এই-যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি।
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারি ধারে।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে।
দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে
হাটের পথের ধারে।
নম্র পত্রভারে
কিঙ্করের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত।
লীলাকাননের মাপে
তোমারে করেছি খর্ব। মৃদু কলালাপে
কর চিত্তবিনোদন,
এ ভাষা কি তোমার আপন।

একদিন এসেছিলে আদিবনভূমে;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে,
তখনো মেলে নি চোখ,
দেখে নি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে।
লতায় গুল্মেতে ঘন, মৃতগাছ-শুষ্কপাতা-ভরা,
আলোহীন পথহীন ধরা।
অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড় বাতাস
যেন রুদ্ধশ্বাস
চলিতে না পারে।
সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে
গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে।
ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে;
প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে
গভীর পঙ্কের তলে।
সেদিনের অন্ধযুগে পীড়িত সে জলে স্থলে
তুমি তুলেছিলে মাথা।
বলিত বল্কলে তব গাঁথা
সে ভীষণ যুগের আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।
বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার দুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু, আজিও সে কথা মনে হয়।
বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে—
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।

মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।
পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া-গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলা-ফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধা-ভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরি,
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

শান্তিনিকেতন
৪ মাঘ ১৩৪১

মিলনযাত্রা

চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্ব নিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি;
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি:
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহজে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরণী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, 'মণি.
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।'

যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে.
পার হয়েছিল যে দুয়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড ত্রস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে।
যে আসনে বসিত সে তারও চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।

প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম. এ. ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যোগে মেশে তারও লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হতে; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অনুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক-রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে;
সদ্যবাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল;
চুরি করে খাতা খুলে
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দুজনের এ ছেলেমানুষি,
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।

হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি
রঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, 'মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।

জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।
কথা যদি দাও প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।'

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
'এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।'

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
'করিয়ো না ভুল;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে,
তাই বলে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।'

ঈর্ষাবিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে—
'ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!
অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।
যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন,
আমারি শাসন,
আর কারো নয়,
আজি আমি দেব তার পরিচয়।'

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাসুতা-বোনা
কানে ছিল সোনা,
কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার,
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে, হতে গেল পার
সদরের দ্বার,
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে, 'এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো।'

শান্তিনিকেতন
৫ ভাদ্র ১৩৪২

অন্তরতম

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছু পিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।

হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর—
সকল হতে দুর্লভ তা, তবু সে নহে বেশি;
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্কমাটি-'পরে

হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পশলা বৃষ্টিবরিষন,
দুঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।
অনেক দুরাশারে
সাধনা করে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,
করি নি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধি নি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে,
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

শান্তিনিকেতন
৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ,
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে,
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
প্রাচীনের সমুদ্রসীমায়
নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে
তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে,
দিনে দিনে পথিকের দল
ক্লিষ্টপদতল
তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রিপানে ধায় নিরুদ্দেশ,
আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ।
তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্গমে,
ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে।

প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে
দিগন্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন সামমন্ত্র-গাথা।

তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্ত্যধন;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের সুরে।
সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
সৃষ্টির প্রথম বাণী;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত।

২ অগস্ট ১৯৩২

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্যবলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ।
মানুষের বশ-মানা এই-যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি।
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারি ধারে।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে।
দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে
হাটের পথের ধারে।
নম্র পত্রভারে
কিঙ্করের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত।
লীলাকাননের মাপে
তোমারে করেছি খর্ব। মৃদু কলালাপে
কর চিত্তবিনোদন,
এ ভাষা কি তোমার আপন।

একদিন এসেছিলে আদিবনভূমে;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে,
তখনো মেলে নি চোখ,
দেখে নি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে।
লতায় গুল্মেতে ঘন, মৃতগাছ-শুষ্কপাতা-ভরা,
আলোহীন পথহীন ধরা।
অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড় বাতাস
যেন রুদ্ধশ্বাস
চলিতে না পারে।
সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে
গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে।
ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে:
প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে
গভীর পঙ্কের তলে।
সেদিনের অন্ধযুগে পীড়িত সে জলে স্থলে
তুমি তুলেছিলে মাথা।
বলিত বল্কলে তব গাঁথা
সে ভীষণ যুগের আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।
বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার দুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু আজিও সে কথা মনে হয়।
বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে-
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা,
ওগো সে কি তুমি জান।
তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো সে কি তুমি জান।
সেই যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা,
ওগো মিতা মোর অনেক দূরের মিতা।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৪২

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প।
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত,
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।
তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা
কলমের ব্যবহার চেষ্টা।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গতজন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।
নাই তার সঞ্চয়তৃষ্ণা
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই।
ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।
মৌচাক রচে না কী জন্যে—
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্যে
গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে।
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে।

জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে,
কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত।
যাহা-কিছু হয় নাই পষ্ট,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,
যা রয়েছে আভাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে।
যে রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে?
বসে আছি, প্রলয়ের পথ-কার
কবে করিবেন তার সংকার।
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক্,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক্।
আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ওই বাতায়নতলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে।

শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৩৪২

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়।
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর,
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি
যাহা সুগভীর আছে ভরি
কচি ধানখেতে;
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে,
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,

মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহ্ণকালে
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে,
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গিটুকুতে,
চটুল দোয়েল পাখি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে—
সেই উপহারে,
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়,
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধুলায়।

শান্তিনিকেতন
২৫ অগস্ট ১৯৩৫

মুক্তি

জয় করেছিনু মন, তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই
নতশিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল ডাকিবে সে ফিরে।
মানিল না হার,
আমারে করিল অস্বীকার।
বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।

তোরণ-দ্বারের কাছে

দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।
দাঁড়ালেম পথপাশে,
ঊর্ধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে।
দেখিনু নিবানো বাতি—
আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি
কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রূকুটি।
এ কথা ভাবি নি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান্ খান্
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কাঁচ ধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।
সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে।
কামনার যে পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন,
নিষ্ঠুর আঘাতে, তার
ভেঙে গেছে দ্বার,
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে,
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।
আপনারে শীর্ণ করি
দিবসশর্বরী
ছিনু জাগি
মুষ্টিভিক্ষা লাগি।
উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

শান্তিনিকেতন
২০ ভাদ্র ১৩৪২

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,
যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা
হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে
দক্ষিণ পবনে।
বুঝি মনে হল, যেন চারি ধার
সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার।
মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়
এ তোমার নয়।
ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি
প্রহরে প্রহরে
যে নৃত্যের তরে
বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়
সে তোমার নয়।
ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,
এই মাধুর্যের দান,
যুগে যুগান্তরে
শুধু মধুরের তরে
কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,
সে তোমার নয়।
অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চন-হিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথী,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে
চারি দিক হতে সবে কয়—
এ তোমার নয়।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।

দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি—
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা, নিষ্ঠুর বিরহ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই,
সেথা পায় ঠাঁই
পান্থ মেঘদল,
লয়ে রবিরশ্মি, লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অস্তসমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।
চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে,
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে,
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন
রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা,
তারাও ওদের কাছে হারাল অপূর্ব অসীমতা।
দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

দার্জিলিং
৬ আষাঢ় ১৩৪০

মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই,
যেতে যেতে যাহা-কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে
মূল্য তার হোক-না যতই
তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,
যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে—
আগন্তুক, অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্যমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাৎ বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অযাচিত সে সুযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো,
তার বেশি দিতে যদি এস,
তবে জেনো মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও—
তাহারে কোরো না হেয়
দান-স্বীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে।

শান্তিনিকেতন
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে
মুকুলে পল্লবে
উদ্‌বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ
গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্গুনের পবন গগন,
সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়—
কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায়,
চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া
নির্দয় দলন-চিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া
অসংকোচ নূপুর-ঝংকারে,
কটাক্ষের খরধারে
উচ্চহাস্য করেছে শাণিত।
কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত
অকারণ সংশয়েতে আপনারে
অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে।
কেহ তারা নিয়েছিল তুলি
গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি,
কেহ ছিন্ন করি
তুলেছিল মাধবী-মঞ্জরী,
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে,
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে,
অন্যমনে গেছে চলে গুন্ গুন্ গানে।

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা,
ওগো সে কি তুমি জান।
তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো সে কি তুমি জান।
সেই যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা,
ওগো মিতা মোর অনেক দূরের মিতা।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৪২

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প।
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত,
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।
তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা
কলমের ব্যবহার চেষ্টা।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গতজন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।
নাই তার সঞ্চয়তৃষ্ণা
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই।
ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।
মৌচাক রচে না কী জন্যে—
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্যে
গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে।
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে।

জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে,
কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত।
যাহা-কিছু হয় নাই পষ্ট,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,
যা রয়েছে আভাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে।
যে রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে?
বসে আছি, প্রলয়ের পথ-কার
কবে করিবেন তার সৎকার।
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক্‌,
স্তুতিনিন্দায় দোলে দোলা থাক্‌।
আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ওই বাতায়নতলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে।

শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৩৪২

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়।
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর,
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি
যাহা সুগভীর আছে ভরি
কচি ধানখেতে;
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে,
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,

মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহ্ণকাল
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পান্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে,
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গিটুকুতে,
চটুল দোয়েল পাখি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে—
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়,
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধুলায়।

শান্তিনিকেতন
২৫ অগস্ট ১৯৩৫

মুক্তি

জয় করেছিনু মন, তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই
নতশিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল ডাকিবে সে ফিরে।
মানিল না হার,
আমারে করিল অস্বীকার।
বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।

তোরণ-দ্বারের কাছে
চাঁপাগাছে
দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।
দাঁড়ালেম পথপাশে,
ঊর্ধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে।
দেখিনু নিবানো বাতি—
আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি
কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রূকুটি।
এ কথা ভাবি নি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান্ খান্
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কাঁচ ধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।
সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে।
কামনার যে পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন,
নিষ্ঠুর আঘাতে, তার
ভেঙে গেছে দ্বার,
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে,
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।
আপনারে শীর্ণ করি
দিবসশর্বরী
ছিনু জাগি
মুষ্টিভিক্ষা লাগি।
উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

শান্তিনিকেতন
২০ ভাদ্র ১৩৪২

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,
যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা
হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে
দক্ষিণ পবনে।
বুঝি মনে হল, যেন চারি ধার
সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার।
মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়
এ তোমার নয়।
ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি
প্রহরে প্রহরে
যে নৃত্যের তরে
বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়
সে তোমার নয়।
ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,
এই মাধুর্যের দান,
যুগে যুগান্তরে
শুধু মধুরের তরে
কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,
সে তোমার নয়।
অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চন-হিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথী,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে
চারি দিক হতে সবে কয়—
এ তোমার নয়।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।

দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি—
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা, নিষ্ঠুর বিরহ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই,
সেথা পায় ঠাঁই
পান্থ মেঘদল,
লয়ে রবিরশ্মি, লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অস্তসমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।
চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে,
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে,
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন
রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা,
তারাও ওদের কাছে হারাল অপূর্ব অসীমতা।
দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

দার্জিলিং
৬ আষাঢ় ১৩৪০

মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই,
যেতে যেতে যাহা-কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে
মূল্য তার হোক-না যতই
তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,
যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে—
আগন্তুক, অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্যমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাৎ বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অযাচিত সে সুযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো,
তার বেশি দিতে যদি এস,
তবে জেনো মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও—
তাহারে কোরো না হেয়
দান-স্বীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে।

শান্তিনিকেতন
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে
মুকুলে পল্লবে
উদ্‌বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ
গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্গুনের পবন গগন,
সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়—
কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায়,
চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া
নির্দয় দলন-চিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া
অসংকোচ নূপুর-ঝংকারে,
কটাক্ষের খরধারে
উচ্চহাস্য করেছে শাণিত।
কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত
অকারণ সংশয়েতে আপনারে
অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে।
কেহ তারা নিয়েছিল তুলি
গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি,
কেহ ছিন্ন করি
তুলেছিল মাধবী-মঞ্জরী,
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে,
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে,
অন্যমনে গেছে চলে গুন্‌ গুন্‌ গানে।

আজি এ ঋতুর অবসানে
ছায়াঘন-বীথি মোর নিস্তব্ধ নির্জন,
মৌমাছির মধু-আহরণ
হল সারা,
সমীরণ গন্ধহারা
তৃণে তৃণে ফেলিছে নিশ্বাস।
পাতার আড়াল ভরি একে একে পেতেছে প্রকাশ
অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,
শাখা অবনত।
নিয়ে সাজি
কোথা তারা গেল আজি,
গোধূলি-ছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার—
অপ্রগল্‌ভ গূঢ় সার্থকতা
নাহি জানে কথা।
নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিষুপ্ত ভুবনে
আপনার মনে
আপনার তারাগুলি
কোন্ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি,
নাহি জানে আপনি সে—
সুদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে।

শান্তিনিকেতন
১১ ভাদ্র ১৩৪২

নমস্কার

প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝর-ধারা
যে বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।

দোঁহার এই দুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি,
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জান'
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রকূলে
উদয়াচলের রবি।

বুঝিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে
কালো সে রয় না কালো।
অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।

দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানব-বিশ্বময়,
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয়।

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি,
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিক তাহা পান করি।

নিঠুর পীড়নে যাঁর
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে
মথিছে অন্ধকার,
তুলিছে আলোড়ি অমৃতজ্যোতি,
তাঁহারে নমস্কার।

শান্তিনিকেতন
৩ অগস্ট ১৯৩৫

আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল,
উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো;
সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।
মালতী-বিতানে শালিকের কলরবে
কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে।
এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিত কী জানি কী উদ্দেশে
এ পারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ-পানে;
তেপান্তরের সুদূর আলোকছায়া
ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে, 'ওগো অজানা বন্ধু, তব
সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি।
ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব
চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।
দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথী,
বকুলগন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।
আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিত-সম
নেমে আসে বাণী করুণ কিরণ-ঢালা,
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।'

শান্তিনিকেতন
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোক তরুতল
অতিথি লাগি রাখে নি আয়োজন।
হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি
রয়েছে বৃথা জাগি।

আরেকদিন এসেছ ঘরে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু রোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো।
ব্যাকুলতার নীরব আবেদনে
যে দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে দান মৃদু হেসে
কিশোর-করে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে,
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো-শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।

শান্তিনিকেতন
২৭ ভাদ্র ১৩৪২

দেবতা

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা;
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকী-বীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।
প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে, শ্রুতি হতে;
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিল গগন,
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।

মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।
দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল;
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে,
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে,
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে,
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।

শান্তিনিকেতন
২৬ শ্রাবণ ১৩৪২

শেষ

বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখস্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উদ্ভাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।
নবজীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার; ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিম তারা-সম
এ চৈতন্য মম।
ক্ষোভ তার নাই দুঃখে সুখে,
যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।

পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র— 'আমি'।

শান্তিনিকেতন
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

জাগরণ

দেহে মনে সুপ্তি যবে করে ভর
সহসা চৈতন্যলোকে আনে কল্পান্তর,
জাগ্রত জগৎ চলে যায়
মিথ্যার কোঠায়।
তখন নিদ্রার শূন্য ভরি
স্বপ্নসৃষ্টি শুরু হয়, ধ্রুব সত্য তারে মনে করি।
সেও ভেঙে যায় যবে
পুনর্বার জেগে উঠি অন্য এক ভবে;
তখনি তাহারে সত্য বলি
নিশ্চিত স্বপ্নের রূপ অনিশ্চিতে কোথা যায় চলি।

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সব-কিছু অন্য-এক অর্থে দেখি—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি?
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে?

শান্তিনিকেতন
২৯ ভাদ্র ১৩৪২

সংযোজন

বাণী

পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা
কালের রাত্রি ভেদি
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি
পথে পথে রচি আলিম্পনের লেখা।
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উজ্জ্বলি উঠে দিক্‌প্রাঙ্গণে
অগ্নিচক্ররেখা।
অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন—
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ-আঁধারে
শূন্যপাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি।
মহাদুঃখের মহানন্দের
সংঘাত লাগি চিরম্বন্দ্বের
চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি।
শতদলে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
প্রথম পরম বাণী
বীণা হাতে বীণাপাণি।

১১ নভেম্বর ১৯৩০
[২৫ কার্তিক '৩৭]

প্রত্যুত্তর

বেলকুঁড়ি-গাঁথা মালা
দিয়েছিনু হাতে,
সে মালা কি ফুটেছিল রাতে?
দিনান্তের ম্লান মৌনখানি
নির্জন আঁধারে সে কি ভরেছিল বাণী?

অবসন্ন গোধূলির পাণ্ডু নীলিমায়
লিখে গেল দিগন্তসীমায়
অস্তসূর্য-স্বর্ণাক্ষরধারা।
রাত্রি কি উত্তরে তারি রচেছিল তারা?

পথিক বাজায়ে গেল পথে-চলা বাঁশি,
ঘরে সে কি উঠেছে উচ্ছ্বাসি?
কোণে কোণে ফিরিছে কোথায়
দূরের বেদনখানি ঘরের ব্যথায়!

২৬ চৈত্র ১৩৩৯

দিনান্ত

একাত্তরটি প্রদীপ-শিখা
নিবল আয়ুর দেয়ালিতে,
শমের সময় হল কবি
এবার পালা-শেষের গীতে।
গুণ টেনে তোর বয়েস চলে,
পায়ে পায়ে এগিয়ে আনে
তরঙ্গহীন কূল-হারানো
মানস-সরোবরের পানে।
অরূপ-কমল-বনে সেথায়
স্তব্ধবাণীর বীণাপাণি—
এতদিনের প্রাণের বাঁশি
চরণে তাঁর দাও রে আনি।
ছন্দে কভু পতন ছিল,
সুরে স্খলন ক্ষণে ক্ষণে,
সেই অপরাধ করুণ হাতে
ধৌত হবে বিস্মরণে।
দৈবে যে গান গ্লানিবিহীন
ফুলের মতো উঠল ফুটে
আপন ব'লে নেবেন তাহাই
প্রসন্ন তাঁর স্মৃতিপুটে।
অসীম নীরবতার মাঝে
সার্থক তোর বাণী যত
অন্ধকারের বেদীর তলায়
রইল সন্ধ্যাতারার মতো।
যৌবন তোর হয় নি ক্লান্ত
এই জীবনের কুঞ্জবনে—
আজ যদি তার পাপড়িগুলি
খসে শীতের সমীরণে।
দিনান্তে সে শান্তিভরা
ফলের মতো উঠুক ফলি,
অতন্দ্রিত নিশীথিনীর
হবে চরম পূজাঞ্জলি।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

যুগল পাখি

স্বপ্নগগন পথের চিহ্ন-হীন
সেথা ছিলে একদিন,
বিরহাবেগের উধাও মেঘের
সজল বাষ্পে লীন।
বহিল সহসা নববসন্ত-বায়,
এক দিগন্তে আনিল দোঁহারে
এক নব বেদনায়।

সেদিন ফাগুন আম্রমুকুলে ভরি
উড়ায়েছে উত্তরী,
গন্ধে-রসানো ঘোমটা-খসানো
পূর্ণিমা বিভাবরী।
সেদিন গগন মুখর বাঁশির গানে,
ধরণীর হিয়া ধায় উদাসিয়া
অভিসার-পথ-পানে।

অসীম শূন্যে সন্ধান গেল থেমে,
এলে বনতলে নেমে।
চঞ্চল পাখা মানিল বিরাম
সীমার মোহন প্রেমে।
লভিল শান্তি তৃপ্তিবিহীন আশা,
শ্যামল ধরার বক্ষের কাছে
রচিলে নিভৃত বাসা।

বাণীর ব্যথায় উচ্ছ্বাসি এক পাখি
গেয়ে ওঠো থাকি থাকি।
আর পাখি শোনো আপনার মনে
ডানা 'পরে মুখ রাখি।
ভাষার প্রবাহ মেলে ভাষাহারা গানে,
অধীরের সুর লভিল আকাশ
ধীর নীরবের প্রাণে।

১৫ ফাল্গুন ১৩৪০

একাকী

এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি;
দেবদারু সারি সারি
দোলে ক্ষণে ক্ষণে
ফাল্গুনের ক্ষুব্ধ সমীরণে।
স্তব্ধতার বক্ষোমাঝে পল্লবমর্মর
জাগায় অস্ফুট মন্ত্রস্বর।
মনে হয় অনাদি সৃষ্টির পরপারে
আপনি কে আপনারে
শুধাইছে ভাষাহীন প্রশ্ন নিরন্তর;
অসংখ্য নক্ষত্র নিরুত্তর।
অসীমের অদৃশ্য গুহায় কোন্‌খানে
নিরুদ্দেশ-পানে
লক্ষ্যহীন কালস্রোত চলে।
আমি মগ্ন হয়ে আছি সুগভীর নৈঃশব্দ্যের তলে।

ভাবি মনে মনে,
এতদিন সঙ্গ যারা দিয়েছিল আমার জীবনে
নিল তারা কতটুকু স্থান?
আমার গভীরতম প্রাণ,
আমার সুদূরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার
গোপন ধ্যানের অধিকার,
ব্যর্থ ও সার্থক কামনায়
আলোয় ছায়ায়
রচিলাম যে স্বপ্ন-ভুবন,
যে আমার লীলানিকেতন
এক প্রান্ত ব্যাপ্ত যার অসমাপ্ত অরূপসাধনে
অন্য প্রান্ত কর্মের বাঁধনে,
যে অভাবনীয়,
অলক্ষিত উৎস হতে যে অমিয়
জীবনের ভোজে
চেতনারে ভরেছে সহজে,
যে ভালোবাসার ব্যথা রহি রহি
আনিয়া দিয়েছে বহি
শ্রুত বা অশ্রুত সুর উৎকণ্ঠিত চিতে
গীতে বা অগীতে—
কতটুকু তাহাদের জানা আছে
এল যারা কাছে!

ব্যক্ত অব্যক্তের সৃষ্টি এ মোর সংসারে
আসে যায় এক ধারে,
বিরহদিগন্তে পায় লয়—
নিয়ে যায় লেশমাত্র পরিচয়।
আপনার মাঝে এই বহুব্যাপী অজানারে ঢাকি
স্তব্ধ আমি রয়েছি একাকী।
যেন ছায়াঘন বট
জুড়ে আছে জনশূন্য নদীতট—
কোণে কোণে প্রশাখার কোলে কোলে
পাখি কভু বাসা বাঁধে, বাসা ফেলে কভু যায় চলে।
সম্মুখে স্রোতের ধারা আসে আর যায়
জোয়ার-ভাঁটায়;
অসংখ্য শাখার জালে নিবিড় পল্লবপুঞ্জ-মাঝে
রাত্রিদিন অকারণে অন্তহীন প্রতীক্ষা বিরাজে।

২ এপ্রিল ১৯৩৪
[১৯ চৈত্র '৪০]

জীবনবাণী

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে—
পলে পলে দলিত সে
কালের চরণে।
যায় সে কেবল ভেঙে চুরে,
ছড়িয়ে পড়ে কাছে দূরে—
জীবনবাণীর অখণ্ড রূপ
মিলবে মরণে।

ক্ষণে ক্ষণে পাগল হাওয়ায়
ঘূর্ণিধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় সে দুলিতে।
বৈতরণীর অগাধ নদী
পেরিয়ে আবার ফেরে যদি
উল্টো স্রোতের সে দান, ডালায়
পারবে তুলিতে।

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে,
টি'কবে যাহা নিমেষগুলির
পূরণ-হরণে।

তারে নিয়ে সারা বেলা
চলেছে হার-জিতের খেলা,
খেলার শেষে বাঁচল যা তাই
বাঁচবে মরণে।

৭ শ্রাবণ ১৩৪১

যাত্রাশেষে

বিজন রাতে যদি রে তোর
সাহস থাকে
দিনশেষের দোসর যে জন
মিলবে তাকে।
ঘনায় যবে আঁধার ছেয়ে
অভয় মনে থাকিস চেয়ে—
আসবে দ্বারে আলোর দূতী
নীরব ডাকে।

যখন ঘরে আসনখানি
শূন্য হবে
দূরের পথে পায়ের ধ্বনি
শুনবি তবে।
কাটল প্রহর যাদের আশায়
তারা যখন ফিরবে বাসায়,
সাহানা গান বাজবে তখন
ভিড়ের ফাঁকে।

অনেক চাওয়া ফিরালি চেয়ে
আশায় ভুলি,
আজ যদি তোর শূন্য হল
ভিক্ষা-ঝুলি
চমক তবে লাগুক তোরে,
অধরা ধন দিক সে ভরে
গোপন বঁধু, দেখতে কভু
পাস নি যাকে।

অভিসারের পথ বেড়ে যায়
চলিস যত—
পথের মাঝে মায়ার ছায়া
অনেক-মতো।

বসবি যবে ক্লান্তিভরে
আঁচল পেতে ধুলার ’পরে,
হঠাৎ পাশে আসবে সে যে
পথের বাঁকে।

এবার তবে করিস সারা
কাঙাল-পনা—
সমস্তদিন কাণাকড়ির
হিসাব-গণা।
শান্ত হলে মিলবে চাবি,
অন্তরেতে দেখতে পাবি
সবার শেষে তার পরে যে
অশেষ থাকে।

দূর বাঁশিতে যে সুর বাজে
তাহার সাথে
মিলিয়ে নিয়ে বাজাস বাঁশি
বিদায়-রাতে।
সহজ মনে যাত্রাশেষে
যাস রে চলে সহজ হেসে,
দিস নে ধরা অবসাদের
জটিল পাকে।

শান্তিনিকেতন
২৪ শ্রাবণ ১৩৪১

আবেদন

পশ্চিমের দিক্‌সীমায় দিনশেষের আলো
পাঠাল বাণী সোনার রঙে লিখা—
‘রাতের পথে পথিক তুমি, প্রদীপ তব জ্বালো
প্রাণের শেষ শিখা।’
কাহার মুখে তাকাব আমি, আলোক কার ঘরে
রয়েছে মোর তরে—
সঙ্গে যাবে যে আলোখানি পারের ঘাট-পানে,
এ ধরণীর বিদায়-বাণী কহিবে কানে কানে,
মম ছায়ার সাথে
আলাপ যার হবে নিভৃত রাতে।
ভাসিবে যবে খেয়ার তরী কেহ কি উপকূলে
রচিবে ডালি নাগকেশর ফুলে,
তুলিয়া আনি চৈত্রশেষে কুঞ্জবন হতে
ভাসায়ে দিবে স্রোতে?

আমার বাঁশি করিবে সারা যা ছিল গান তার,
সে নীরবতা পূর্ণ হবে কিসে?
তারার মতো সুদূরে-যাওয়া দৃষ্টিখানি কার
মিলিবে মোর নয়ন-অনিমিষে?
অনেক-কিছু হয়েছে জমা, অনেক হল খোঁজা,
আশাতৃষার বোঝা
ধুলায় যাব ফেলে।
ধুলার দাবি নাইকো যাহে সে ধন যদি মেলে,
সুখদুখের সব-শেষের কথা,
প্রাণের মণিখানির যেথা গোপন গভীরতা
সেথায় যদি চরম দান থাকে,
কে এনে দেবে তাকে?
যা পেয়েছিনু অসীম এই ভবে
ফেলিয়া যেতে হবে—
আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,
বাতাস-ভরা সুর,
পৃথিবী-ভরা কত-না রূপ, কত রসের মেলা,
হৃদয়-ভরা স্বপন-মায়াপুর,
মূল্য শোধ করিতে পারে তার
এমন উপহার
যাবার বেলা দিতে পার' তো দিয়ো
যে আছ মোর প্রিয়।

শান্তিনিকেতন
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
[১৯ ভাদ্র '৪১]

অচিন মানুষ

তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন-তলে,
কেন এলে চেনার সাজে?
তোমায় সাঁজ-সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে
আমার প্রতিদিনের মাঝে।
তোমায় মিলিয়ে কবে নিলেম আপন আনাগোনার হাটে
নানান পান্থদলের সাথে,
তোমায় কখনো বা দেখি আমার তপ্ত ধুলার বাটে
কভু বাদল-ঝরা রাতে।
তোমার ছবি আঁকা পড়ল আমার মনের সীমানাতে
আমার আপন ছন্দে ছাঁদা,
আমার সরু মোটা নানা তুলির নানান রেখাপাতে
তোমার স্বরূপ পড়ল বাঁধা।
তাই আজি আমার ক্লান্ত নয়ন, মনের-চোখে-দেখা
হল চোখের-দেখায় হারা।

দোঁহার পরিচয়ের তরীখানা বালুর চরে ঠেকা,
সে আর পায় না স্রোতের ধারা।

ও যে অচিন মানুষ— মন উহারে জানতে যদি চাহ
জেনো মায়ার রঙমহলে,
প্রাণে জাগুক তবে সেই মিলনের উৎসব-উৎসাহ
যাহে বিরহদীপ জ্বলে।
যখন চোখের সামনে বসতে দেবে তখন সে আসনে
রেখো ধ্যানের আসন পেতে,
যখন কইবে কথা সেই ভাষাতে তখন মনে মনে
দিয়ো অশ্রুতে সুর গেঁথে।
তোমার জানা ভুবনখানা হতে সুদূরে তার বাসা,
তোমার দিগন্তে তার খেলা।
সেথায় ধরা-ছোঁয়ার-অতীত মেঘে নানা রঙের ভাষা,
সেথায় আলো-ছায়ার মেলা।
তোমার প্রথম জাগরণের চোখে উষার শুকতারা
যদি তাহার স্মৃতি আনে
তবে যেন সে পায় ভাবের মূর্তি রূপের-বাঁধন-হারা
তোমার সুর-বাহারের গানে।

শান্তিনিকেতন
৩০ কার্তিক ১৩৪১

জন্মদিনে

তোমার জন্মদিনে আমার
কাছের দিনের নেই তো সাঁকো।
দূরের থেকে রাতের তীরে,
বলি তোমায় পিছন ফিরে
'খুশি থাকো'।

দিনশেষের সূর্য যেমন
ধরার ভালে বুলায় আলো,
ক্ষণেক দাঁড়ায় অস্তকোলে,
যাবার আগে যায় সে ব'লে
'থেকো ভালো'।

জীবনদিনের প্রহর আমার
সাঁঝের ধেনু— প্রদোষ-ছায়ায়
চারণ-শ্রান্ত ভ্রমণ-সারা
সন্ধ্যাতারার সঙ্গে তারা
মিলিতে যায়।

মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমেতে
বারেক যদি দাঁড়াও আসি
আঁধার গোষ্ঠে এই রাখালের
শুনতে পাবে সন্ধ্যাকালের
চরম বাঁশি।

সেই বাঁশিতে উঠবে বেজে
দূর সাগরের হাওয়ার ভাষা,
সেই বাঁশিতে দেবে আনি
বৃন্তমোচন ফলের বাণী
বাঁধন-নাশা।

সেই বাঁশিতে শুনতে পাবে
জীবন-পথের জয়ধ্বনি—
শুনতে পাবে পথিক রাতের
যাত্রামুখে নূতন প্রাতের
আগমনী।

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর ১৯৩৫
[৭ কার্তিক '৪২]

পুপুদিদির জন্মদিনে

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ
হারিয়ে গেল কোথা—
পথ ভুলে সে পেরিয়েছিল
মরা নদীর সোঁতা।
হায়, বুড়োমির পাঁচিল তারে
আড়াল করল আজ—
জানি নে কোন্ লুকিয়ে-ফেরা
বয়স-চোরার কাজ।
হঠাৎ তোমার জন্মদিনের
আঘাত লাগল দ্বারে,
ডাক দিল সে দূর সেকালের
খ্যাপা বালকটারে।
ছেলেমানুষ আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে
হঠাৎ গেল থামি।

বললে, শোনো ওগো কিশোরিকা,
'রবীন্দ্র' নাম কুষ্ঠিতে যার লিখা,
নামটা সত্য—সত্য শুধু
তারিখটা মাত্তর—
তাই বলে তো বয়সখানা
নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার,
জগৎটা তার কাঁচা।
বাঁধে নি তায় খেতাব-লাভের
বিষয়-লোভের খাঁচা।
মনটাতে তার সবুজ রঙে
সোনার বরন মেশা।
বক্ষে রসের তরঙ্গ তার,
চক্ষে রূপের নেশা।
ফাগুন-দিনের হাওয়ায় খ্যাপামি যে
পরানে তার স্বপন বোনে
রঙিন মায়ার বীজে।
ভরসা যদি মেলে
তোমার লীলার আঙিনাতে
ফিরবে হেসে খেলে।
এই ভুবনের ভোর-বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ।
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি
করবে সুমধুর।

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

রেশ

বাঁশরি আনে আকাশবাণী—
ধরণী আনমনে
কিছু বা ভোলে কিছু বা আধো
শোনে।
নামিবে রবি অস্তপথে,
গানের হবে শেষ—
তখন ফিরে ঘিরিবে তারে
সুরের কিছু রেশ।

অলস খনে কাঁপায় হাওয়া
আধেকখানি-হারিয়ে-যাওয়া
গুঞ্জরিত কথা,
মিলিয়া প্রজাপতির সাথে
রাঙিয়ে তোলে আলোছায়াতে
দুইপহরে-রোদ-পোহানো
গভীর নীরবতা।

হলুদেরঙা-পাতায়-দোলা
নাম-ভোলা ও বেদনা-ভোলা
বিষাদ ছায়ারূপী
ঘোমটা-পরা স্বপনময়
দূরদিনের কী ভাষা কয়
জানি না চুপিচুপি।
জীবনে যারা স্মরণ-হারা
তবু মরণ জানে না তারা,
উদাসী তারা মর্মবাসী
পড়ে না কভু চোখে-
প্রতিদিনের সুখ-দুখেরে
অজানা হয়ে তারাই ঘেরে,
বাষ্পছবি আঁকিয়া ফেরে
প্রাণের মেঘলোকে।

শান্তিনিকেতন
১৪ অগস্ট ১৯৪০
[২৯ শ্রাবণ '৪৭]

পত্রপুট

কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও
কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার
শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ

নব জীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া একমনা
যে নব সংসার তব প্রেমমন্ত্রে করিছ রচনা
দুঃখ সেথা দিক বীর্য, সুখ দিক সৌন্দর্যের সুধা,
মৈত্রীর আসনে সেথা নিক স্থান প্রসন্ন বসুধা,
হৃদয়ের তারে তারে অসংশয় বিশ্বাসের বীণা
নিয়ত সত্যের সুরে মধুময় করুক আঙিনা।
সমুদার আমন্ত্রণে মুক্তদ্বার গৃহের ভিতরে
চিত্ত তব নিখিলেরে নিত্য যে আতিথ্য বিতরে।
প্রত্যহের আলিম্পনে দ্বারপথে থাকে যেন লেখা
সুকল্যাণী দেবতার অদৃশ্য চরণচিহ্নরেখা।
শুচি যাহা, পুণ্য যাহা, সুন্দর যা, যাহা-কিছু শ্রেয়,
নিরলস সমাদরে পায় যেন তাহাদের দেয়।
তোমার সংসার ঘেরি, নন্দিতা, নন্দিত তব মন
সরল মাধুর্যরসে নিজেরে করুক সমর্পণ।
তোমাদের আকাশেতে নির্মল আলোর শঙ্খনাদ
তার সাথে মিলে থাক্ দাদামশায়ের আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
১২ বৈশাখ ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

জীবনে নানা সুখদুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে।
কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে;
সাহস করি নি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

ছিলেম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নীচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।
ভরসা ছিল না সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার 'পরে—
কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই
অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ।
সঙ্গে ছিল একখানা এসরাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,
ছিল হো হা করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,
টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল,
তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ছিল ছেলেদের কৌতুক।
সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।
শৈলশৃঙ্গবাসের শূন্যতা পূরণ করব কজনে মিলে,
সেই রস জোগান দেবার অধিকারী আমরাই
এমন ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস।
অবশেষে চড়াই-পথ যখন শেষ হল
তখন অপরাহ্নের হয়েছে অবসান।
ভেবেছিলেম আমোদ হবে প্রচুর,
অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো
রাত্রিকে দেবে ফেনিল করে।

শিখরে গিয়ে পৌঁছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্ত-দিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূর বিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে,
সুর-বালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হল নিস্তব্ধ।
দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।
এসরাজটা নিঃশব্দ পড়ে রইল মাটিতে,
পৃথিবী যেমন উন্মুখ হয়ে আছে
তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে।
মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয় নি,
মন্দ্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হল
যা আর কোনোদিন হয় নি।
সেদিন বেজে উঠল যে রাগিণী
সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হল
অসীম নীরবে।
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

অপূর্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে
বলতে পেরেছিলেম—
আশ্চর্য।

শান্তিনিকেতন
৪ মে ১৯৩৫

দুই

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ
কল্যাণীয়েষু

আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।
আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি;
তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে
আমার একলা ছুটির বিস্তৃত মোহানায় এসে
এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথপ্রান্তে।
আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়;
তার তেপান্তর মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র
ছুটিয়েছে পবনবাহন ঘোড়া
মরণসাগরের নীলিমায় ঘেরা
স্মৃতিদ্বীপের পথে।
সেখানে রাজকন্যা চিরবিরহিণী
ছায়াভবনের নিভৃত মন্দিরে।
এমনি করে আমার ঠাঁইবদল হল
এই লোক থেকে লোকাতীতে।

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপর শেষ শরতের প্রশান্তি।
বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে
গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।

মনে পড়ে অল্পবয়সের ছুটি;
তখন হাওয়া-বদল ঘর থেকে ছাদে;
লুকিয়ে আসত ছুটি, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে,
নীল আকাশে বিছিয়ে দিত
বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা,

শিরায় শিরায় মীড় দিত তীব্র টানে
না-পাওয়ার না-বোঝার বেদনায়,
এড়িয়ে-যাওয়ার ব্যর্থতার সুরে।
সেই বিরহগীতগুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে
কখনো বা চমকে চলে গেছে
শ্যামলবরন মাধুরী
চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ ক'রে,
বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘনিশ্বাসে ছুটে যায়
দিগন্তপারের নিরুদ্দেশে।

এমনি ক'রে চিরদিন জেনে এসেছি
মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ এই ছুটি
অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জনতায়।

হাওয়া-বদল চাই—
এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল
ঘরে ঘরে হাজার লোকের মনে।
টাইম-টেবিলের গহনে গহনে
ওদের খোঁজ হল সারা,
সাঙ্গ হল গাঁঠরি-বাঁধা,
বিরল হল গাঁঠের কড়ি।
এ দিকে, উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে
তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে
ওদের ব্যাপার দেখে।
আমার নজরে পড়েছে সেই হাসি,
তাই চুপচাপ বসে আছি এই চাতালে
কেদারাটা টেনে নিয়ে।
দেখলেম বর্ষা গেল চলে
কালো ফরাশটা নিল গুটিয়ে।
ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে
থেকে থেকে ধাক্কা লাগল
সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।
সাঁওতাল ছেলেরা শেষ করেছে কেয়াফুল বেচা;
মাঠের দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে গোরুর পাল,
শ্রাবণ-ভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে
তাদের ভাবখানা অতি মন্থর;
কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি
না, পিঠে কাঁচা রৌদ্র লাগানো আলস্যে।

হাওয়া-বদলের দায় আমার নয়;
তার জন্যে আছেন স্বয়ং দিক্‌পালেরা
রেলোয়ে স্টেশনের বাইরে,
তাঁরাই বিশ্বের ছুটিবিভাগে রসসৃষ্টির কারিগর।
অস্ত-আকাশে লাগল তাঁদের নতুন তুলির টান
অপূর্ব আলোকের বর্ণচ্ছটায়।
প্রজাপতির দল নামালেন
রৌদ্রে ঝলমল ফুলভরা টগরের ডালে,
পাতায়-পাতায় যেন বাহবাধ্বনি উঠেছে
ওদের হালকা ডানার এলোমেলো তালের রঙিন নৃত্যে।
আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল
এক-সার জুঁই-বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,
সংকেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে;
শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।
কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না—
পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।

আজি নি-খরচার হাওয়া-বদল জলে স্থলে।
খরিদদারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল
দোকানে বাজারে।
বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটার নীচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।
আজ এই নি-কড়িয়া ছুটির অজস্রতা
সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে
জনকয়েক অপরাজেয় কুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে।
তাদের জন্যেই পেতেছেন খাস-দরবারের আসর
তাঁর আম-দরবারের মাঝখানেই—
কোনো সীমানা নেই আঁকা।
এই কজনের দিকে তাকিয়ে
উৎসবের বীনকারকে তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন
অসংখ্য যুগ থেকে।

বাঁশি বাজল।
আমার দুই চক্ষু যোগ দিল
কয়খানা হালকা মেঘের দলে।
ওরা ভেসে পড়েছে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়ায়।

আমার মন বেরোল নির্জনে-আসন-পাতা
শান্ত অভিসারে,
যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার যাত্রায়।

আমার এই স্তব্ধ ভ্রমণ হবে সারা,
ছুটি হবে শেষ,
হাওয়া-বদলের দল ফিরে আসবে ভিড় ক'রে,
আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।
ফুরোবে আমার ফির্‌তি-টিকিটের মেয়াদ,
ফিরতে হবে এইখান থেকে এইখানেই,
মাঝখানে পার হব অসীম সমুদ্র।

শান্তিনিকেতন
শুক্লাসপ্তমী। আশ্বিন ১৩৪২

তিন

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।
তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর-যুগে
মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর-চূড়ায়,
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।
নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ-দানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।
শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত।'
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ-মিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি ঝঞ্ঝাবায়ুর স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যূষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।
জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা
সব কীর্তির অবসান।
আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মল পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

চার

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মর-ঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হল ফসল-খেতের জীবনীরচনা
মাঠে মাঠে কচি ধানের চিকন অঙ্কুরে।
এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,
দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে
তার পরিচয় এমন উদার-প্রসারিত—
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে তাকে কুলাতে পারে;
তার অপরিমেয় শ্যামলতায়
আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে।

মাস যায়।
শ্রাবণের স্নেহ নামে আঘাতের ছল ক'রে,
সবুজ মঞ্জরী এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে
অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।
তার আত্মাভিমানী যৌবনের প্রগল্‌ভতার 'পরে
সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক,
নিশীথের তারা নিবিষ্ট করে নিস্তব্ধ বিস্ময়।

মাস যায়।
বাতাসে থেমে গেল মত্ততার আন্দোলন,
শরতের শান্তনির্মল আকাশ থেকে
অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এল—
প্রস্তুত হও।
সারা হল শিশির-জলে স্নানব্রত।

মাস যায়।
নির্মম শীতের হাওয়া এসে পোঁছল হিমাচল থেকে,
সবুজের গায়ে গায়ে এঁকে দিল হলদের ইশারা,
পৃথিবীর দেওয়া রঙ বদল হল আলোর দেওয়া রঙে।
উড়ে এল হাঁসের পাঁতি নদীর চরে,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ল তটের পথে পথে।

মাস যায়।
বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।
তার পরে শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্নগুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধরে—
শেষে কালো হয়ে ছাই হল আগুনের লেহনে।

মাস গেল।
তার পরে মাঠের পথ দিয়ে
গোরু নিয়ে চলে রাখাল,
কোনো ব্যথা নেই তাতে, কোনো ক্ষতি নেই কারো।
প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।
তারই তলায় দুপুরবেলায় ছেলেটা বাজায় বাঁশি
আদিকালের গ্রামের সুরে।
সেই সুরে তাম্রবরন তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু করে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্য ভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
এক দিনেরও জন্যে।

শান্তিনিকেতন
১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

পাঁচ

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্ত-সমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
তার নাম করব না—

সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে
ও হয়তো জানে না, কিংবা হয়তো জানে।

ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সুরে—
চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যাবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।
একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে—
সংগীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।

আমি ওকে দেখলেম—
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা।

আমি ওকে দেখলেম,
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধরে।
তীক্ষ্ণবেগে উঠে দাঁড়াল সে,
ভ্রূকুটি করে বললে, আমার দিকে ফিরে—
"এ কী অন্যায়,
কেন এলে লুকিয়ে।"
কোনো উত্তর করলেম না।
বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার।
বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে, এসো,
বলতে পারতে, খুশি হয়েছি।
মধুময়ের উপর পড়ল ধুলার আবরণ।

পরদিন ছিল হাটবার।
জানলায় বসে দেখছি চেয়ে।
রৌদ্র ধু ধু করছে পাশের সেই খোলা ছাদে।
তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা
সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।
নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরীতে।
পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,
অন্ধ বৈরাগী তারই ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে—
কাল আসব বলে চলে গেল,
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।
কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
ওই সুরের শিল্পে বুনে উঠছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—
'তাকিয়ে আছি।'

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে-দেওয়া।
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।
বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।
কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারি দিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।

ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

শান্তিনিকেতন
২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

ছয়

অতিথিবৎসল,
ডেকে নাও পথের পথিককে
তোমার আপন ঘরে,
দাও ওর ভয় ভাঙিয়ে।
ও থাকে প্রদোষের বস্তিতে,
নিজের কালো ছায়া ওর সঙ্গে চলে
কখনো সমুখে কখনো পিছনে,
তাকেই সত্য ভেবে ওর যত দুঃখ যত ভয়।
দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।

বছরে বছরে ও গেছে চলে
তোমার আঙিনার সামনে দিয়ে,
সাহস পায় নি ভিতরে যেতে,
ভয় হয়েছে পাছে ওর বাইরের ধন
হারায় সেখানে।

দেখিয়ে দাও ওর আপন বিশ্ব
তোমার মন্দিরে,
সেখানে মুছে গেছে কাছের পরিচয়ের কালিমা,
ঘুচে গেছে নিত্যব্যবহারের জীর্ণতা,
তার চিরলাবণ্য হয়েছে পরিস্ফুট।

পান্থশালায় ছিল ওর বাসা,
বুকে আঁকড়ে ছিল তারই আসন, তারই শয্যা,
পলে পলে যার ভাড়া জুগিয়ে দিন কাটালো
কোন্ মুহূর্তে তাকে ছাড়বে ভয়ে
আড়াল তুলেছে উপকরণের।
একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে
বেড়ার বাইরে।

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।

হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক আপনাকে।

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর ১৯৩৫

সাত

চোখ ঘুমে ভেরে আসে,
মাঝে-মাঝে উঠছি জেগে।
যেমন নববর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টির জল
মাটি চুঁইয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড়ে এসে
তেমনি তরুণ হেমন্তের আলো ঘুমের ভিতর দিয়ে
লেগেছে আমার অচেতন প্রাণের মূলে।
বেলা এগোল. তিন প্রহরের কাছে।
পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।

পশ্চিম থেকে হাওয়া দিয়েছে বেগে,
দোলাদুলি লেগেছে তেঁতুলগাছের ডালে।
উত্তরে গোয়ালপাড়ার রাস্তা,
গোরুর গাড়ি বিছিয়ে দিল গেরুয়া ধুলো
ফিকে নীল আকাশে।

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়।
সংসারের ঘাটের থেকে রশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।

ফিকে কালিতে এই দিনটার চিহ্ন পড়ল কালের পাতায়,
দেখতে দেখতে যাবে সে মিলিয়ে।
ঘন অক্ষরে যে-সব দিন আঁকা পড়ে
মানুষের ভাগ্যলিপিতে,
তার মাঝখানে এ রইল ফাঁকা।
গাছের শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে—
সেও শোধ করে যায় মাটির দেনা,
আমার এই অলস দিনের ঝরা পাতা
লোকারণ্যকে কিছুই দেয় নি ফিরিয়ে।

তবু মন বলে,
গ্রহণ করাও ফিরিয়ে-দেওয়ার রূপান্তর।
সৃষ্টির ঝরনা বেয়ে যে রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙিন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে—
যেমন লেগেছে ধানের খেতে,
যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে দিনের বিশ্বছবি।
আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর ঝলক,
হেমন্তের আতপ্ত নিশ্বাস শিহর লাগালো
ঘুম-জাগরণের গঙ্গা-যমুনায়—
এও কি মেলে নি এই নিখিল ছবির পটে।
জল স্থল আকাশের রসসত্রে
অশথের চঞ্চল পাতার সঙ্গে
ঝলমল করছে আমার যে অকারণ খুশি
বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা,

তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প।
এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,
এই নিয়ে ঋতুর দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা—
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।
আজ অকর্মণ্যের এই অখ্যাত দিন
ফাঁক রাখে নি ওই মালাটিতে—
আজও একটি বীজ পড়েছে গাঁথা।

কাল রাত্রি একা কেটেছে এই জানালার ধারে।
বনের ললাটে লগ্ন ছিল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদের রেখা।
এও সেই একই জগৎ,
কিন্তু গুণী তার রাগিণী দিলেন বদল ক'রে
ঝাপসা আলোর মূর্ছনায়।
রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায় আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণ-কথা।
মনে পড়ছে দূর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি।
গাছগুলো স্তম্ভিত,
রাত্রির নিঃশব্দতা পুঞ্জিত যেন দেহ নিয়ে।
ঘাসের অস্পষ্ট সবুজে সারি সারি পড়েছে ছায়া।
দিনের বেলায় জীবনযাত্রার পথের ধারে
সেই ছায়াগুলি ছিল সেবাসহচরী;
তখন রাখালকে দিয়েছে আশ্রয়,
মধ্যাহ্নের তীব্রতায় দিয়েছে শান্তি।
এখন তাদের কোনো দায় নেই জ্যোৎস্নারাতে;
রাত্রের আলোর গায়ে গায়ে বসেছে ওরা,
ভাইবোনে মিলে বুলিয়েছে তুলি
খামখেয়ালি রচনার কাজে।
আমার দিনের বেলাকার মন
আপন সেতারের পর্দা দিয়েছে বদল ক'রে।
যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে,
তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ওই চাঁদ ওই তারা ওই তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।

শান্তিনিকেতন
শুক্লাষষ্ঠী। কার্তিক ১৩৪২

আট

আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
পাতার রঙ হলদে-সবুজ,
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা, বেগুনি রঙের।
প্রশ্ন করি, নাম কী,
জবাব নেই কোনোখানে।
ও আছে বিশ্বের অসীম অপরিচিতের মহলে
যেখানে আছে আকাশের নামহারা তারা।
আমি ওকে ধরে এনেছি একটি ডাক-নামে
আমার একলা জানার নিভৃতে।
ওর নাম পেয়ালী।
বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফুশিয়া,
এসেছে ম্যারিগোল্ড্,
ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়,
জাতে বাঁধা পড়ে নি;
ও বাউল, ও অসামাজিক।

দেখতে দেখতে ওই খসে পড়ল ফুল।
যে শব্দটুকু হল বাতাসে
কানে এল না।
ওর কুষ্ঠির রাশিচক্র যে নিমেষগুলির সমবায়ে
অণুপরিমাণ তার অঙ্ক,
ওর বুকের গভীরে যে মধু আছে
কণাপরিমাণ তার বিন্দু।
একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা,
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস।
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,

যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হল বেশ পরিবর্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

শান্তিনিকেতন
৫ নবেম্বর ১৯৩৫

নয়

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।
মেঘের গায়ে গায়ে দগ্ দগ্ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝক্‌ঝকে খাঁড়া;
বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত;
উত্তর-পশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁফ-ধরা একটা আওয়াজ,
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
বাতাসের ঝট্‌কা আসে
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো;
আকাশটা ভূতে-পাওয়া।

পথিক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে,
ঘন আঁধির ভিতর থেকে উঠছে ঘরহারা গোরুর উতরোল ডাক,
দূরে নদীর ঘাটে হৈ হৈ রব।

বোঝা গেল না কোন্ দিকে হুড়্মুড়্ দুড়্দাড়্ ক'রে
কিসের ওটা ভাঙচুর।
দুর্দুর্ করে বুক,
কী হল, কী হল ভাবনা।
কাকগুলো পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে মাটিতে,
ঠোঁট দিয়ে ঘাস ধরছে কামড়িয়ে,
ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে,
ঝট্পট্ করছে পাখাদুটো।
নদীপথে ঝড়ের মুখে বাঁশঝাড়ের লুটোপুটি,
ডালগুলো ডাইনে বাঁয়ে আছাড় খায়,
দোহাই পাড়ে মরিয়া হয়ে।
তীক্ষ্ম হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে
ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক।
হঠাৎ সোঁদা গন্ধের দীর্ঘনিশ্বাস উঠল মাটি থেকে,
মুহূর্তে এসে পড়ল বৃষ্টি প্রবল ঝাপটায়,
হাওয়ার চোটে গুঁড়োনো জলের ফোঁটা,
পাতলা পর্দায় ঢেকে ফেললে সমস্ত বন,
আড়াল করলে মন্দিরের চুড়ো,
কাঁসর-ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দের দিল মুখচাপা।
রাত তিন পহরে থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি,
কালি হয়ে এল অন্ধকার নিকষ পাথরের মতো;
কেবলই চলল ব্যাঙের ডাক,
ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ,
জোনাকির মিটিমিটি আলো,
আর যেন স্বপ্নে আঁতকে-ওঠা দমকা হাওয়ায়
থেকে থেকে জল-ঝরা ঝাউয়ের ঝর্ঝরানি।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৪০

দশ

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগ দ্বেষ ভয় ভাবনা,
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্ত রূপ।
এ সত্যের মুখোশ প'রে সত্যকে আড়ালে রাখে;
মৃত্যুর কাদামাটিতেই গড়ে আপনার পুতুল,

তবু তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস পেলেই
নালিশ করে আর্তকণ্ঠে।
খেলা করে নিজেকে ভোলাতে,
কেবলই ভুলতে চায় যে সেটা খেলা।
প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য;
স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্‌বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রে ও হাউইয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।
প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে,
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যায় বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত—
সেই-সব নিমন্ত্রণলিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনা মন্ত্র,
যে মন্ত্রে বলেছিলেন—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।
আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ,
বলি, হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,
তারও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
সেই সত্য তোমারই।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,

কখনো হিমাদ্রি-গিরিতটে—
বলেছে, 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
বলেছে, 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।'

শান্তিনিকেতন
৭ নবেম্বর ১৯৩৫

এগারো

ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়,
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় ক'রে
জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।
আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকূতি নেই।
নেই সেই নীরব সুরের ঝংকার
যা আমার নামকে দিয়েছিল রাগিণী।

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।
সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে, এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালোলাগার রঙে রঙিয়ে।

আজ তারই উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।
ভুলে গেছ, যতই দিতে এসেছিলে আপনাকে
ততই পেয়েছিলে আপনাকে বিচিত্র করে।
আজ আমাকে বঞ্চিত করে
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।
তোমার মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ
রইল আমার মনের স্তরে স্তরে।
সেদিনকার তোরণের স্তূপ,
প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে-ঢাকা বাগানের পথ।

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।
আর তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে,
পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল।

শান্তিনিকেতন
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

বারো

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে।
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে।
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।
মনে পড়ছে ভোগের আয়োজনে
ফাঁক পড়েছে বারংবার।
কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে
হাট জমে নি তখনো,
বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়
তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,
ফুরিয়েছে বেচাকেনার প্রহর।

অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল;
সেদিন তার চড়িয়েছি সেতারে,
গানে বসিয়েছি সুর।
যাকে শোনাব তার চুল যখন হল বাঁধা,
বুকে উঠল জাফ্‌রানি রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মুলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।
থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্‌ একজনের মনের তলায়,
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হল না আলো।

এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।
বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।
আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত
গৌড়-সারঙের আলাপ।
আজ বঞ্চিত জীবনকে বলি সার্থক,
নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয়
মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে,
তার দক্ষিণা রয়ে গেল কালের বেদীপ্রান্তে।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে;
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলে নি তার।

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।
তীরের গাছ থেকে
সেখানে বসন্ত-শেষের ফুল পড়ে ঝ'রে,
ছেলেরা ভাসায় খেলার নৌকো,
কলস ভরে নেয় তরুণীরা
বুদ্‌বুদফেনিল গর্গরধ্বনিতে।
নববর্ষার গম্ভীর বিরাট শ্যামমহিমা
তার বক্ষতলে পায় লীলাচঞ্চল দোসরটিকে।

কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট,
স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন,
অধৈর্যের আঘাত হানে তটবেষ্টনের স্থাবরতায়;
বুঝি তার মনে হয়
গিরিশিখরের পাগলা-ঝোরা পোষ মেনেছে
গিরিপদতলের বোবা জলরাশিতে।
বন্দী ভুলেছে আপনার উদ্‌বেলকে উদ্দামকে।
পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে নিরুদ্দেশের পথে
অজানার সংঘাতে বাঁকে বাঁকে
গর্জিত করল না সে আপন অবরুদ্ধ বাণী,
আবর্তে আবর্তে উৎক্ষিপ্ত করল না
অন্তর্গূঢ়কে।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
দুর্গম ভীষণের ওপারে
অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী;
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে;
ইতিহাস-বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দৈত্যের লৌহদুর্গে প্রচ্ছন্ন;
আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—
'এসো মৃত্যুবিজয়ী'।
বাজল ভেরী,
তবু জাগল না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে;
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

১ বৈশাখ ১৩৪৩

তেরো

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চার দিকে চিরকাল ধ'রে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী-ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকৃতি থেকে.
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।
নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখদুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবন-বহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণরস-প্রবাহে।
তার আবেগে বহে নিয়ে গেছে সর্বগৃধ্নু চেতনাকে
জগতের সর্বদান-যজ্ঞের প্রাঙ্গণে।
এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও করে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূর দিগন্তে
জনহীন মধ্যাদিনে মৌমাছির গুঞ্জন-মুখর অবকাশে।
হাত-ধরে-বসে-থাকা বাষ্পাকুল নির্বাক ভালোবাসায়
নেমে আসে এদেরই শ্যামল ছায়ার করুণা।

এদেরই মৃদুবীজন এসে লাগে
শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিত দয়িতার
নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের চেলাঞ্চলে।
প্রিয়-প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে
শিহর লাগাতে থাকে এদেরই দোলায়িত কম্পনে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।
এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।
এরা স্পন্দিত হয়েছে পুরুষের জয়শঙ্খধ্বনিতে
মর্ত্যলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্‌বারিত করবার জন্যে
দুর্দাম উদ্যমে,
জল-স্থল-আকাশ-পথে দুর্গম-জয়ের
স্পর্ধিত যার অধ্যবসায়।

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্‌ গুণীর কোন্‌ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

শান্তিনিকেতন
১০ বৈশাখ ১৩৪৩

চোদ্দো

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল,
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।
মুছে-আসা ঝাপসা পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকে-দিনের নতুন কালে।
পার যদি মেনে নিয়ো আমায় সখা বলে,
আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলনরাতে
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান;
তার সুরে পাবে দূরের নতুনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই
আপনার সীমানার অতীত পারে।
সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়-বন্দনার তান,
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।
আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওয়ায়।
সেদিনকার ব্যথা
অকারণে বাজবে তোমার বুকে;
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে।

ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী,
আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা ব'লে,
তোমার অন্যযুগের সখা।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ ১৩৪৩

পনেরো

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারী হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি, "না।"
অবাক হয় শুনে বলে, "জানা নেই পথ?"
আমি বলি, "না।"
প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?"
আমি বলি, "না।"

এমন করে দিন গেল;
আজ আপন মনে ভাবি,
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'

শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোক-তীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।

যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথী,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্‌ক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ও পাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল,
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।

তাকে বলেছি হাত জোড় ক'রে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে
হঠাৎ হল উচ্ছলিত,
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা,
নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়াল গাছের তলায়,
ফিরে তাকাল আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ
মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে,
"তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।"
আমি বললেম, "দুই না-চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধ'রে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।"

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে

কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।
আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।
ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

ষোলো

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি
যত ঊর্ধ্বে তোল তারে তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব। ভুলে গেছ, থামার পূর্ণতা
রচনার পরিত্রাণ; ভুলে গেছ নির্বাক্ দেবতা
বেদীতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।
মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি,
উপকরণের স্তূপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাঁকি
অমৃতের স্থান রোধি। নির্মাণ-নেশায় যদি মাত
সৃষ্টি হবে গুরুভার তার মাঝে লীলা রবে না তো।
থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা
নীড় গেঁথে গেঁথে পাখি আকাশেতে উড়িবার ডানা
ব্যর্থ করি দিবে। থামো তুমি থামো। সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শান্তির ইঙ্গিত নামে দিবসের প্রগল্ভ প্রকাশে।
ছায়াহীন আলোকের সভায় দিনের যত কথা
আপনারে রিক্ত করি রাত্রির গভীর সার্থকতা
এসেছে ভরিয়া নিতে। তোমার বীণার শত তারে
মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে
বিরাম বিশ্রামহীন—প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি
নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জনের লাগি
লয়ে তার গীত-অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৩

সংযোজন

এক

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।
আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ মাঘ ১৩৪৩

দুই

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।
ধূপ জ্বলল, ঘন্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে,
করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা—
কেননা ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ ক'রে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ওরা হিসাব রাখবে ম'রে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।
ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে।
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তুরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৪

শ্যামলী

শ্যামলী : শান্তিনিকেতন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ

ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎ-লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারি গাছের শ্রেণী।
দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমর-ভাঙা,
লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।
জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যূথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা, সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খ'সে খ'সে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
এক-সার মোটা পায়া-ভারী পাম উদ্ধত মাথা-তোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি পাহারাওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কল্‌মি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।

লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি—'নেত্রকোণা'।
ওরাওঁ জাতের মালী ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটি-গড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।
রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভী দুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে।
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি,
আল্‌সের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু-চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

শুনেছি এবার হেথায় তোমার ক'দিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি।
মেঘরৌদ্রের খেলার সৃষ্টি ওই পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে,
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম,
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন
মিলিবে মেঘের সাথে।

শান্তিনিকেতন
১ ভাদ্র ১৩৪৩

দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ-দুয়ারে।
যেমন ভোরবেলাকার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উসখুস,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি:
উষা যখন আপনা-ভোলা
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে,
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খসে পড়ে
উদয়-সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ সোনার কাঁচলি দিয়ে;
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।
একদিন আপন সহজ নিরালায় ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার;
একের মধ্যে একঘরে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ

আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

শেষ পহরে

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ-ভোলানো।
পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরোতেই।
তার বেশি আশা করি নি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল বিদায় নিয়ে যাবে
শুধু বলে যাবে, 'তবে আসি।'
যে কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ওই দুটি কথা,
ওইটুকু দরদের সরু বুনোনিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রইলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢলে,
তুমি যাবার কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা;
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।

বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চমকে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই,
যা পড়ে থাকবার তাই রইল পড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারি দিক—
যেমন চুপচাপ পাখিহারা পাখির বাসা
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাশে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাঙাশ-বরন শূন্য জীবনে।
গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁয়ায় কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হল, যদি সময় থাকে,
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে;
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

আমি

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়,
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
না কখন ফুটে উঠে হল হাঁ, মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে;
মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ;

মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে;
প্রলয়-সন্ধ্যায় জপ করবেন—
'কথা কও কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো, আমি ভালোবাসি'?

শান্তিনিকেতন
২৯ মে ১৯৩৬

সম্ভাষণ

রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,
বলি, চারু।
হঠাৎ ইচ্ছা হল আর-কিছু বলি,
যাকে বলে সম্ভাষণ,
যেমন বলত সত্যযুগের ভালোবাসায়।
সব চেয়ে সহজ ডাক— প্রিয়তমে।
সেটা আবৃত্তি করেছি মনে-মনে,
তার উত্তরে মনে-মনেই শুনেছি তোমার উচ্চহাসি।
বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয়;
এ যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী।

আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হল
এই তোমার প্রশ্ন।
বলি তবে।
কাজ ছিল না বেশি,
সকাল সকাল ফিরেছি বাসায়।
হাতে বিকেলের খবরের কাগজ,
বসেছি বারান্দায়, রেলিঙে পা দুটো তোলা।
হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরে
তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।
বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখি নি তোমাকে অনেক দিন;
দেখি নি এমন বাঁকা করে মাথা-হেলানো
চুল-বাঁধার কারিগরিতে,
এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়ি-বালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ওই ধানিরঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা,
কোথাও একটু টেনে নিলে নিচের দিকে,
কবিরা যেমন ছন্দ বদল করে
একটু-আধটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

আজ প্রথম আমার মনে হল
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।
এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ওই যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

বাগানে গেলেম নেমে।
ঠিক করেছি আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা
শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।
যখন ডাকব তোমাকে ঘরে
সে হবে যেন আবাহনী।
সামনেই লতা ভরেছে সাদা ফুলে—
বিলিতি নাম, মনে থাকে না—
নাম দিয়েছি তারাঝরা;
রাতের বেলায় গন্ধ তার
ফুলবাগানের প্রলাপের মতো।
এবার সে ফুটেছে অকালে,
সবুর সয় নি শীত ফুরোবার।
এনেছি তার একটি গুচ্ছ,
তারও একটি সই থাকবে আমার নিবেদনে।

আজ গোধূলিলগ্নে তুমি ক্লাসিক যুগের চারুপ্রভা,
আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।
দুটি কথা আজ বলব আমি,
সাজানো কথা—
হাসতে হয় হেসো।
সে কথা মনে-মনে গড়ে তুলেছি
যেমন করে তুমি জড়িয়ে তুলেছ তোমার খোঁপা।
বলব, "প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ওই কালো চুলে।"

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

স্বপ্ন

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থর্‌থর্ করছে দরজা,
খড়্‌খড়্ করে উঠছে জানালাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সারবাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি।
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো

দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ওই পদটা—
'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন
...স্বপন দেখিনু হেনকালে।'
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন,
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি'-চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়
তার চোখের চাহনিতে,
তিনশো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
দেখতে পাই নে স্পষ্ট করে।
আজ পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা শাড়ির আঁচল যেমন করে বাঁধে কাঁধের 'পরে,
খোঁপা যেমন করে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন করে চায় স্পষ্টচোখে
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিনশো বছর আগেকার কবির সামনে।

তবু—'রজনী শাঙন ঘন
...স্বপন দেখিনু হেনকালে।'
শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

প্রাণের রস

আমাকে শুনতে দাও
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজাড়-করে-দেবার গান।
ওরা আমার দেহ-মনকে নিল টেনে
নানা সুরের নানা রঙের
নানা খেলার
প্রাণের মহলে।
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই,
কেবল এইটুকু কথা—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।
এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্মে।
বিকালবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।

আমাকে একটু সময় দাও।
আমি মন পেতে আছি।
ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে-পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি,
মজ্জার মধ্যে লুকোনো খুশি,
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুশি।
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি;
এর মধ্যে ভালো নেই মন্দ নেই,
নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি—

জীবনস্রোতের উপর-তলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
রঙিন ডানার শেষ খেলা চুকিয়ে দিতে—
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।
বৃথা এনেছ তোমাদের যত দাবি।
আমি বসে আছি বর্তমানের পিছন মুখে
অতীতের দিকে গড়িয়ে-পড়া ঢালুতটে
নানান বেদনায় ধেয়ে-বেড়ানো প্রাণ
একদিন করে গেছে লীলা
ওই বনবীথির ডাল দিয়ে বিনুনি-করা
আলোছায়ায়।
আশ্বিনে দুপুর বেলা
এই কাঁপনলাগা ঘাসের উপর
মাঠের পারে কাশের বনে
হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
মিলেছে আমার জীবনবীণার ফাঁকে ফাঁকে।

যে সমস্যাজাল
সংসারের চারি দিকে পাকে-পাকে জড়ানো
তার সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথের যাত্রী পিছনে যায় নি ফেলে
কোনো উদ্‌যোগ, কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা;
কেবল গাছের পাতার কাঁপনে
এই বাণীটি রয়ে গেছে—
তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই, তার চেয়ে সত্য ওই কথাটি।
শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ,
প্রাণগঙ্গার পূর্বমুখী ধারায়
পশ্চিম প্রাণের যমুনার স্রোত।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

হারানো মন

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে,
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায় উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে।
তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

দেখছি শাড়ির কালো পাড়ের নীচে থেকে
তোমার কনক-গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা
ঘরের চৌকাঠের উপর।
আজ ডাকব না তোমাকে।
আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমার হালকা চেতনা
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে-আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়।

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষী যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে;
আনমনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,
উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চার দিকের বনের সঙ্গে।
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত-আলোয় ডুবিয়ে দিল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

আজ কোনো সীমানা দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনোখানে,
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

চিরযাত্রী

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরাপৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে,
ভেঙে-পড়া ভাষায়।

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।
যুদ্ধ হয় নি শেষ,
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহুশত যুগের পদপতন শব্দে
থর্‌থর্‌ করে ধরিত্রী,
অর্ধেক রাত্রে দুরুদুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।
তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,
যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজও তারাই চলেছে;
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
তারা জিয়ন-মরা, তাদের নিঝুম বস্‌তি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উলটিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল।

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।
যেই এঁকেছে নক্‌শা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথুনির
ছাদ তুলেছে মেঘ ঘেঁষে,
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিত হয়েছে ঝাঁঝরা;
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
তলিয়ে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষ হিসেবে বেরোল সর্বনাশ্।
সে জমা করেছে ভোগের ধন সাত হাট থেকে,
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুম্‌রে গুম্‌রে
গেছে ভোগের জোগান আঙার হয়ে।
তার রীতি, তার নীতি তার শিকল তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নীচে
গতযুগের কবরস্থানে।

কখনো বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতি-নেবা দালানে,
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন,
পাগ্‌লা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁঃ শব্দে ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাঁজরগুলোয় ঠক্ ঠক্ দিয়েছে নাড়া,
গুঙ্‌রে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে রক্তে-পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র শতাব্দীর বাইরে
পথ-না-চেনা দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে।
তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরুগুরু,
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।
কালের রথ-চলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশান,
বারে বারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে পাথর গুঁড়িয়ে
পার হয়ে পর্বত;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

শান্তিনিকেতন
৪ জুন ১৯৩৬

বিদায়-বরণ

চার প্রহর রাতের বৃষ্টি-ভেজা ভারী হাওয়ায়
থমকে আছে সকাল বেলাটা,
রাত-জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চার দিকে
হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে।

তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায়;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ওই ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী
ওকে একবার ডাকো ফিরে,
দিনান্তে সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে;
করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুল ফোটা আর ফুল ঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।
তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশবনের চিকন-ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপ্‌চে পড়া
আচম্‌কা রোদ্দুরের ছটায়।

শান্তিনিকেতন
৩ জুন ১৯৩৬

তেঁতুলের ফুল

জীবনে অনেক ধন পাই নি,
নাগালের বাইরে তারা,
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি,
হাত পাতি নি ব'লেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে,
এই তেঁতুলের ফুল।

বেঁটে গাছ পাঁচিলের ধারে,
বাড়তে পারে নি কৃপণ মাটিতে;
উঠেছে ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে।
ওর বয়স হয়েছে যায় নি বোঝা।

অদূরে ফুটেছে নেবু ফুল,
গাছ ভরেছে গোলকচাঁপায়,
কোণের গাছে ধরেছে কাঞ্চন,
কুরচি-শাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা।

স্পষ্ট ওদের ভাষা,
ওরা আমাকে ডাক দিয়ে করেছে আলাপ।
আজ যেন হঠাৎ এল কানে
কোন্ ঘোমটার নীচে থেকে চুপিচুপি কথা।
দেখি পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে
লাজুক একটি মঞ্জরী,
মৃদু বসন্তী রঙ,
মৃদু একটি গন্ধ,
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে।

শহরের বাড়িতে আছে
শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেক কালের তেঁতুল গাছ,
দিক্পালের মতো দাঁড়িয়ে
উত্তরপশ্চিম কোণে,
পরিবারের যেন পুরোনো কালের সেবক,
প্রপিতামহের বয়সী।
এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পর্বে,
সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে,
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।
ওই গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে,
তাদের কত লোকের নাম
আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,
তাদের কত লোকের স্মৃতি
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।
একদিন ঘোড়ার আস্তাবল ছিল ওর তলায়,
খুরের খট্খটানিতে অস্থির;
খোলার-চালা-দেওয়া ঘরে।
কবে চলে গেছে সহিসের হাঁক-ডাকা
সেই ঘোড়া-বাহনের যুগ
ইতিবৃত্তের ও পারে।
আজ চুপ হয়েছে হ্রেষাধ্বনি,
রঙ বদল করেছে কালের ছবি।
সর্দার কোচম্যানের সযত্নসজ্জিত দাড়ি,
চাবুক হাতে তার সগর্ব উদ্ধত পদক্ষেপ,
সেদিনকার শৌখিন সমারোহের সঙ্গে
গেছে সাজ-পরিবর্তনের মহানেপথ্যে।
দশটা বেলার প্রভাত-রৌদ্রে
ওই তেঁতুলতলা থেকে এসেছে দিনের পর দিন
অবিচলিত নিয়মে ইস্কুলে যাবার গাড়ি।
বালকের নিরুপায় অনিচ্ছার বোঝাটা
টেনে নিয়ে গেছে রাস্তার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

আজ আর চেনা যাবে না সেই ছেলেকে,
না দেহে, না মনে, না অবস্থায়।
কিন্তু চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে সেই আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছ
মানবভাগ্যের ওঠানামার প্রতি
ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

মনে আছে একদিনের কথা।
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি;
ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।
দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চার দিকে ঝাপট মারছে পাখা।
রাস্তায় দাঁড়াল জল,
আঙিনা গেছে ভেসে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ওই গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
গলির দুই ধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ওই গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।
অন্তহীন ইঁটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ওই ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি;
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।

কিন্তু যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে,
অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান,
ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী;
উদাসীন উদ্ধত।
সেদিন কে জেনেছিল—
ওই রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল, বসন্তের সভায় ওর কৌলীন্য।

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি।
যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী,
গানের সাধন করছে সে আপন মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুন্ গুন্ সুরে।

সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ওই প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবনমদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা-উতল-করা
কোন্‌-এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি,
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্‌ একজনের আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।
যদি সে শুধাত, কী নাম,
হয়তো বলতেম—
ওই যে রৌদ্রের এক টুকরো পড়েছে তোমার চিবুকে
ওর যদি কোনো নাম তোমার মুখে আসে
একেও দেব সেই নামটি।

শান্তিনিকেতন
৭ জুন ১৯৩৬

অকাল ঘুম

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে,
আচম্‌কা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল—
মেঝের 'পরে এলিয়ে পড়া
ওর অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে বাজছে সানাই সারঙ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া সকাল বেলায়।
স্তরে স্তরে দুখানি হাত গালের নীচে,
ঘুমিয়েছে শিথিলদেহে
উৎসবরাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার এক ধারে।
কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।

ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্তনিশ্বাসের ছন্দে।
ঘড়ির ইশারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্‌ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।
চল্‌তি মুহূর্তগুলি গতি হারাল ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমারাতের ঘুম-হারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়।

পোষা বিড়াল দুধের দাবি স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চমকে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমানভরে বললে, "ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ।"
কেন! আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমতো।

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে,
মনে যখন থমকে আছে প্রাণের হাওয়া
তখন সেই অব্যক্তের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ।
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না,
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকাচুরি করে রক্তে,
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই,
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্‌ নির্বাক্‌ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
"কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্‌ লোকে।"

সেদিন সকালে গলির ও পারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে;
ছাদ পিটচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে;
জানলার নীচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক।
আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূরকালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি।

শান্তিনিকেতন
১০ জুন ১৯৩৬

কনি

আমরা ছিলেম প্রতিবেশী।
যখন-তখন দুই বাসার সীমা ডিঙিয়ে
যা-খুশি করে বেড়াত কনি,
খালি পা, খাটো ফ্রকপরা মেয়ে;
দুষ্টু চোখদুটো
যেন কালো আগুনের ফিনকি-ছড়ানো।
ছিপ্‌ছিপে শরীর।
ঝাঁকড়া চুল চায় না শাসন মানতে,
বেণী বাঁধতে মাকে পেতে হত দুঃখ।
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াত
কোঁকড়া লোমওয়ালা বেঁটে জাতের কুকুরটা,
ছন্দের মিলে বাঁধা
দুজনে যেন একটি দ্বিপদী।

আমি ছিলেম ভালো ছেলে,
ক্লাসের দৃষ্টান্তস্থল।
আমার সেই শ্রেষ্ঠতার
কোনো দাম ছিল না ওর কাছে।

যে বছর প্রোমোশন পাই দু ক্লাস ডিঙিয়ে,
লাফিয়ে গিয়ে ওকে জানাই,
ও বলে, "ভারি তো,
কী বলিস টেমি।"
ওর কুকুরটা ডেকে ওঠে,
"ঘেউ।"

ও ভালোবাসত হঠাৎ ভাঙতে আমার দেমাক,
রুখিয়ে তুলতে ঠান্ডা ছেলেটাকে;
যেমন ভালোবাসত
দম্ করে ফাটিয়ে দিতে মাছের পটকা।
ওকে জব্দ করার চেষ্টা
ঝরনার গায়ে নুড়ি ছুঁড়ে মারা।
কলকল হাসির ধারায়
বাধা দিত না কিছুতেই।

মুখস্থ করতে বসেছি সংস্কৃত শব্দরূপ
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে,
ও হঠাৎ কখন দুম্ করে
পিঠে মেরে গেল কিল
অত্যন্ত প্রাকৃত রীতিতে।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ
মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই
বেণীটুকুর দোলন দেখিয়ে দিল দৌড়।
মেয়ের হাতের সহাস্য অপমান
সহজে সম্ভোগ করবার বয়স
তখনো আমার ছিল অল্প দূরে।
তাই শাসনকর্তা ছুটত ওর অনুসরণে,
প্রায় পৌঁছতে পারে নি লক্ষ্যে।
ওর বিলীয়মান শব্দভেদী হাসি
শুনেছি দূর থেকে,
হাতের কাছে পাই নি
কোনো দায়িত্ববিশিষ্ট জীব,
কোনো বেদনাবিশিষ্ট সত্তা।

এমনিতরো ছিল আমাদের আদ্যযুগ,
ছোটোমেয়ের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত।
দুরন্তকে শাসনের ইচ্ছা করেছি
পুরুষোচিত অসহিষ্ণুতায়;
শুনেছি ব্যর্থচেষ্টার জবাবে
তীব্রমধুর কণ্ঠে,
"দুয়ো দুয়ো দুয়ো।"

বাইরে থেকে হারের পরিমাণ
বেড়ে চলেছে যখন
তখন হয়তো জিত হয়েছে শুরু
ভিতর থেকে।
সেই বেতার-বার্তার কান খোলে নি তখনো,
যদিও প্রমাণ হচ্ছিল জড়ো।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবননাট্যে
সাজ হয়েছে বদল।
ও পরেছে শাড়ি,
আঁচলে বিঁধিয়েছে ব্রোচ,
বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।
আমি ধরেছি খাকি রঙের খাটো প্যান্ট
আর খেলোয়াড়ের জামা
ফুটবল-বলরামের নকলে।
ভিতরের দিকে ভাবের হাওয়ারও
বদল হল শুরু,
কিছু তার পাওয়া যায় পরিচয়।

একদিন কনির বাবা পড়ছেন বসে
ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বড়ো লোভ আমার ওই ছবির কাগজটার 'পরে।
আমি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি
উড়ো জাহাজের নক্‌শা।
জানতে পেরে তিনি উঠলেন হেসে।
তিনি ভাবতেন ছেলেটার বিদ্যার দম্ভ বেশি।
সেটা তাঁরও ছিল ব'লেই
আর কারো পারতেন না সইতে।
কাগজখানা তুলে ধরে বললেন,
"বুঝিয়ে দাও তো বাপু, এই ক'টা লাইন,
দেখি তোমার ইংরেজি বিদ্যে।"
নিষ্ঠুর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে
মুখ লাল করে উঠতে হল ঘেমে।
ঘরের এক কোণে বসে
একলা করছিল কড়িখেলা
আমার অপমানের সাক্ষী কনি।
দ্বিধা হল না পৃথিবী,
অবিচলিত রইল চার দিকের নির্মম জগৎ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি,
সেই কাগজখানা আমার টেবিলে—
শিবরামবাবুর ছবির কাগজ।

এত বড়ো দুঃসাহসের গভীর রসের উৎস কোথায়,
তার মূল্য কত,
সেদিন বুঝতে পারে নি বোকা ছেলে।
ভেবেছিলেম আমার কাছে কনির
এ শুধু স্পর্ধার বড়াই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে
আমাদের দুজনের অগোচরে,
তার জন্যে দায়িক নই আমরা।
বয়স-বাড়ার মধ্যে অপরাধ আছে
এ কথা লক্ষ করি নি নিজে,
করেছেন শিবরামবাবু।

আমাকে স্নেহ করতেন কনির মা,
তার জবাবে ঝাঁঝিয়ে উঠত তাঁর স্বামীর প্রতিবাদ।
একদিন আমার চেহারা নিয়ে খোঁটা দিয়ে
শিবরামবাবু বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে,
আমার কানে গেল—
"টুক্‌টুকে আমের মতো ছেলে,
পচতে করে না দেরি,
ভিতরে পোকার বাসা।"

আমার 'পরে ওঁর ভাব দেখে
বাবা প্রায় বলতেন রেগে,
"লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস ওদের বাড়ি।"
ধিক্কার হত মনে,
বলতেম দাঁত কামড়ে,
"যাব না আর কখ্‌খনো।"
যেতে হত দুদিন বাদেই
কুলতলার গলি দিয়ে লুকিয়ে।
মুখ বাঁকিয়ে বসে রইত কনি
দুদিন না-আসার অপরাধে।
হঠাৎ বলে উঠত,
"আড়ি, আড়ি, আড়ি।"
আমি বলতুম, "ভারি তো।"
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতুম আকাশের দিকে।

একদিন আমাদের দুই বাড়িতেই এল
বাসা ভাঙবার পালা।
এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু যাবেন পশ্চিমে
কোন্‌ শহরে আলো-জ্বালার কারবারে।

আমরা চলেছি কলকাতায়;
গ্রামের ইস্কুলটা নয় বাবার মনের মতো।
চলে যাবার দুদিন আগে
কনি এসে বললে, "এসো আমাদের বাগানে।"
আমি বললাম, "কেন।"
কনি বললে, "চুরি করব দুজনে মিলে;
আর তো পাব না এমন দিন।"
বললেম, "কিন্তু তোমার বাবা—"
কনি বললে, "ভীতু।"
আমি বললেম মাথা বাঁকিয়ে,
"একটুও না।"

শিবরামবাবুর শখের বাগান ফলে আছে ভ'রে।
কনি শুধোল, "কোন্ ফল ভালোবাস সব চেয়ে।
আমি বললেম, "ওই মজঃফরপুরের লিচু।"
কনি বললে, "গাছে চড়ে পাড়তে থাকো,
ধরে রইলেম ঝুড়ি।"
ঝুড়ি প্রায় ভরেছে,
হঠাৎ গর্জন উঠল, "কে রে";
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরি বিদ্যাই শেষ ভরসা।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কনির দুই চোখ দিয়ে
মোটা মোটা ফোঁটায়
জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে;
গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
অমন অচঞ্চল কান্না
দেখি নি ওর কোনোদিন।

তার পরে মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি
কনির হয়েছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে লালপেড়ে আঁচল,
কপালে কুঙ্কুম,
শান্তগভীর চোখের দৃষ্টি,
স্বর হয়েছে গম্ভীর।
আমি কলকাতায় রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।
আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।

একদিন কনির কাছ থেকে চিঠিতে এল
দেখা করতে অনুনয়।
গ্রামের বাড়িতে ভাগনির বিয়ে,
স্বামী পায় নি ছুটি,
ও একা এসেছে মায়ের কাছে।
বাবা গেছেন হুশিয়ারপুরে
বিবাহে মতবিরোধের আক্রোশে।

অনেক দিন পরে এসেছি গ্রামে,
এসেছি প্রতিবেশিনীর সেই বাড়িতে।
ঘাটের পাশে ঢালু পাড়িতে
ঝুঁকে রয়েছে সেই হিজল গাছ জলের দিকে,
পুকুর থেকে আসছে
সেই পুরোনো কালের মিষ্টি গন্ধ শ্যাওলার।
আর সিসুগাছের ডালে দুলছে
সেই দোলনাটা আজও।

কনি প্রণাম করে বললে, "অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায়, নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ, তাই ডেকেছি।"
বাগানে আসন পড়েছে অশথতলার চাতালে।
অনুষ্ঠান হল সারা;
পায়ের কাছে কনি রাখলে একটি ঝুড়ি,
সে ঝুড়ি লিচুতে ভরা।
বললে, "সেই লিচু।"
আমি বললেম, "ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।"
কনি বললে, "কী জানি।"
বলেই দ্রুত গেল চলে।

শান্তিনিকেতন
১২ জুন ১৯৩৬

বাঁশিওয়ালা

"ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম"
—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ও পারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ,
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ার-জলের দিকে চেয়ে,
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চল্‌তি বেলার আলোছায়া।
এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর,
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া

মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।
ডানা দেয় নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে;
সবাই বলে ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত করে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা;
কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি—
ডাক পড়ে অমর্ত্যলোকে;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে,
প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ম চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চারি দিকের ভীরুর ভিড়কে;
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন করে।
দোসর-হারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি,
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক্‌ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯৩৬

মিল-ভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে—
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজ,
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনো
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলি;
বনের মর্মর একবার জাগে
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।
পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চল্‌তি মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।
তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।
শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ও পারের ডাঙায়।
মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিংবা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তার পরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা,
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।
আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই-সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।

আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে গভীরের মধ্যে
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায়,
কখনো সফলতায়, কখনো প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে;
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি,
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খ্যাপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহু যুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত,
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছি সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু,
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে।
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

শান্তিনিকেতন
২০ জুন ১৯৩৬

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন।

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়,
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে,
যে দূরত্ব সর্ষেখেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা;
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।
হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে;
আলাপ করলেম শুরু—
কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে,
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।

বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়,
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথীদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হল কম সাহস নয়;
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।
গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য করে বলবে তো?"

আমি বললেম, "বলব।"
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"

একটুকু রইলেম চুপ করে;
তার পর বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।
ও বললে, "থাক্‌, এখন যাও ও দিকে।"
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে;
আমি চললেম একা।

শান্তিনিকেতন
২৪ জুন ১৯৩৬

কাল রাত্রে

বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিমঝিম প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী;
ছিল শিথিলশক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
"চাই চাই" করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
"চাই চাই" বলে
শূন্য হাৎড়ে বেড়িয়েছিল রাত-কানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল,
নেই সে নেই কোথাও নেই।

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে,
নাস্তিত্বের সেই শিকলবাঁধা ভৃত্যকে,
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ
নেমেছে যার মাথা।

ভোর হল রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধন-ছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখিদের ছোটো কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।

চলল তাদের সুরের তীরখেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুত তালের বাজন, যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।
মন দাঁড়িয়ে উঠল;
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল
আপনারই উদ্‌বেল তরঙ্গে।
তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝর্নার মতো;
উপচে উঠে মিলতে চলল
চার দিকের সব-কিছুর মধ্যে।
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাই নে কিছু চাই নে";
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

শান্তিনিকেতন
২৩ জুন ১৯৩৬

অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
"ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন—
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বল।"
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি,
বললে, "এ কি উপদেশ।"
আমি বললেম তার হাত চেপে ধরে,
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ
বুঝবে একদিন।"

বিরক্ত হল অমিয়া,
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।"
অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াল,
চলল ঘরের বাইরে।
আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"

দিন যায় রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই,
দেহের কল অচল হয়ে এল বলে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা
তার ফটিক জলের কলকলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুনগুনিয়ে বনের থেকে বনে।
দল বেঁধেছে নারকেল গাছ,
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে।
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।

ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দুহাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউগাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝর্‌ঝর্‌ করে উঠছে তার পাতা।
বেগ্‌নি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা,
টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।
শরৎ আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্‌ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে—
'ফিরে যেতে হবে।'
থেকে থেকে মনে পড়ছে
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝলে উঠেছিল যে আলো।

সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে;
মনে হল সেখানে বাস নেই কারো।
এলেম সদর দরজার সামনে,
দেখি তালা বন্ধ।
ধক্‌ করে উঠল বুকের মধ্যে;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে;
কোন্‌ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল পেরোনো গ্রাম,
একটি পুরোনো দিঘির ধারে;
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।

পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখে নি,
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে,
ছাই রঙের মোটা শাড়ি পরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো;
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সবজি-খেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।
চোখের আড়ে
আমার দামী জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে।"
বোঝা গেল না ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে,
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেশে শুধালেম,
"এখানে থাক কোথায়।"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্চের পর্দা দিয়ে ভাগ করা ঘরে।
একটা তক্তপোশের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া।
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তর কোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।
দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী,
আর রঙ-করা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাকছে কোকিল।
মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায় ঝিলমিল করছে
ঢালু পাড়ির তলায়
দিঘির উত্তর ধারের একটুকরো জল,
কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো,
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,
চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।
এমন সময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় করে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক গেলাস ডাবের জল।
মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।

খিদে নেই বললে মিথ্যে হত না,
রুচি নেই বললে সত্য হত,
কিন্তু খেতেই হল।
তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক,
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।
তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, “বিষয়কর্ম দেখো।”
ছেলে বললে, “কী হবে।”
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, “ভয় নেই,
নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।”
দু দিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে, “কী হবে।”
বাবা রেগে বললেন, “তবে তুমি আস কেন রোজ।”
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
“অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।”

অমিয়ার শেষ কথা এই,
"এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
আমি শুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"
অমিয়া বললে, "জেলখানায়।"

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই ১৯৩৬

দুর্বোধ

অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ,
সেটা হয়ে উঠল বোধের অতীত।
আমার সেই নাটকের কথা বলি।—

বইটার নাম 'পত্রলেখা',
নায়ক তার কুশলসেন।
নবনীর কাছে বিদায় নিয়ে সে গেল বিলেতে।
চার বছর পরে ফিরে এসে হবে বিয়ে।
নবনী কাঁদল উপুড় হয়ে বিছানায়,
তার মনে হল, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড।

নবনীকে কুশলের প্রয়োজন ছিল না ভালোবাসার পথে,
প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাতযাত্রার পথ।
সে কথা জানত নবনী,
সে পণ করেছিল হৃদয় জয় করবে প্রাণপণ সাধনায়।
কুশল মাঝে মাঝে
রুচিতে বুদ্ধিতে উঁচট খেয়ে ওকে হঠাৎ বলেছে রূঢ় কথা,
ও সয়েছে চুপ করে;
মেনে নিয়েছে নিজেকে অযোগ্য বলে;
ওর নালিশ নিজেরই উপরে।
ভেবেছিল দীনা বলেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।
এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
আজ নবনীর সেই দিনরাতের আরাধনার ধন গেল দূরে।
ওর দুঃখের থালাটি ছিল অশ্রুভেজা অর্ঘ্যে ভরা,
আজ থেকে দুঃখ রইবে কিন্তু দুঃখের নৈবেদ্য রইবে না।
এখন ওদের সম্বন্ধের পথ রইল
শুধু এপারে ওপারে চিঠিলেখার সাঁকো বেয়ে।

কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে,
অর্কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির 'পরে
কুশলের চোখের আড়ালে;
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের হাতে কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরল দেশে,
বিয়ের দিন করল স্থির।
আংটি এনেছে বিলেত থেকে,
গেল সেটা পরাতে;
গিয়ে দেখে ঠিকানা না রেখেই নবনী নিরুদ্দেশ।
তার ডায়ারিতে আছে লেখা,
"যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ,
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।"
এদিকে কুশলের বিশ্বাস
তার চিঠিগুলি গদ্যে মেঘদূত,
বিরহীদের চিরসম্পদ।
আজ সে হারিয়েছে প্রিয়াকে
কিন্তু মন গেল না চিঠিগুলি হারাতে,
ওর মমতাজ পালাল, রইল তাজমহল।
নাম লুকিয়ে ছাপালো চিঠি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে।

নবনীর চরিত্র নিয়ে
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর।
কেউ বলেছে বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে,
কেউ বলেছে রসাতলে।

অনেকে এসেছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে;
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"
বলেছি, "শাস্ত্রে বলে, দেবা ন জানন্তি।"
পাঠকবন্ধু বলেছে,
"নারীর প্রসঙ্গে না-হয় চুপ করলেম
হতবুদ্ধি দেবতারই মতো,
কিন্তু পুরুষ?
তারও কি অজ্ঞাতবাস চিররহস্যে।
ও মানুষটা হঠাৎ পোষ মানলে কোন্ মন্ত্রে।"

আমি বলেছি—
"মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই;
যেটুকু সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।
প্রশ্ন কোরো না
পড়ে দেখো কী বলছে কুশল।"

কুশল বলে, "নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই;
ওর মাধুর্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হল গৌণ।
সহজ হয়েছে ওকে সুন্দর ছাঁদে চিঠি লিখতে।
অভাব হয়েছে, করেছি দাবি,
ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা
মনকে করেছে রসসিক্ত, করেছে গর্বিত।
প্রত্যেক চিঠিতে আপন ভাষায় ভুলিয়েছি আপনারই মন।
লেখার উত্তাপে ঢালাই-করা অলংকার
ওর স্মৃতির মূর্তিটিকে সাজিয়ে তুলেছে দেবীর মতো।
ও হয়েছে নূতন রচনা।
এই জন্যেই খ্রীস্টান শাস্ত্রে বলে,
সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী।"
পাঠকবন্ধু আবার জিগেস করেছে,
"ও কি সত্যি বললে,
না, এটা নাটকের নায়কগিরি?"
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"

শান্তিনিকেতন
৫ জুলাই ১৯৩৬

বঞ্চিত

১

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানি নে তো।
মনে হল সময় নেই একটুও;
গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।
বাক্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ল সিকি দুয়ানি,
কিছু কুড়োলেম, কিছু রইল বা,
গুনে ওঠা হল না।
কাপড় ছাড়ি কখন।

নীলরঙের রেশমি রুমালখানা
দিলেম মাথার উপর তুলে কাঁটায় বিঁধে।
চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানি নে কতক্ষণ গেল,
পাঁচ মিনিট, হয়তো বা পঁচিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে-বলে;
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লালরঙের কুয়াশা, একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুচছি রুমালে।
কোন্‌-এক স্টেশনে
বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল।
গাড়িটাকে দেরি করাচ্ছে মিছিমিছি।
হুইস্‌ল্‌ দিলে শেষকালে;
সাড়া পড়ল চাকাগুলোয়, চলল গাড়ি।
গাছপালা, ঘরবাড়ি, পানাপুকুর
ছুটেছে জানলার দু ধারে পিছনের দিকে,
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না-পায়।
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর।
মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেক ক্ষণ,
খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।
আবার বাঁশি বাজল,
আবার চলল গাড়ি ঘটর ঘটর।
শেষে দেখা দিল হাবড়া স্টেশন।
চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির করে আছি
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে।
তারপরে দুজনের হাসি।

বিয়ের কনে, টোপর-হাতে আত্মীয়স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
যারা কনেকে নিতে এসেছিল গেল চলে।

যে জনস্রোত এ মুখে আসছিল
ফিরল গেটের দিকে।
গট্ গট্ করে চলতে চলতে
গার্ড আমার জানালার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে, মেয়েটা নামে না কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হল।

এই আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে
আমি একটিমাত্র খাপছাড়া।
মনে হল প্লাটফর্ম্‌টার
এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত প্রশ্ন করছে আমাকে;
জবাব দিচ্ছি নীরবে,
"না এলেই হত।"
আর-একবার পড়লুম পোস্টকার্ডখানা
ভুল করি নি তো।

এখন ফিরতি গাড়ি নেই একটাও।
যদি বা থাকত, তবু কি—
বুকের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
কত রকমের 'হয়তো'।
সবগুলিই সাংঘাতিক।

বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানি নে।
সামনে ছিল বাস্, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।

অপর পক্ষ

২

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরোল খাটের নীচে থেকে।
গলার বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ শুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের, মিনির জন্যে।
তাঁর মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকছে একবার ওর দিকে।
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরোলেম;
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা।

ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।
দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাট-বোঝাই গাড়িতে।
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিস্টবল;
নিরেট আপদ, ফাঁক দেয় না কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি ছেড়ে,
হনহনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া স্টেশনে।
কী জানি, কব্জি ঘড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি, আজ টাইমটেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন,
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।
নির্বোধের মতো এলেম উঁকি মেরে মেয়ে-গাড়িগুলোতে।
ডাকলেম নাম ধ'রে,
'কী জানি' ছাড়া আর-কোনো কারণ নেই
সেই পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্‌ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।
বেরিয়ে এলুম বাইরে—
জানি নে যাই কোন্‌ দিকে।
বাস্‌-এর নীচে চাপা পড়ি নি নিতান্ত দৈবক্রমে।
এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই
দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

শ্যামলী

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ-করে-থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল ভাষার জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল তোমার জামের বন পাতার মেঘে,

বলছে তারা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে—
"থামো, থামো,
থামো তোমরা পুব বাতাসের সওয়ারি।"

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে;
বাসা ভাঙ' বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড়' পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরিব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁঠছড়ার বাঁধন দাও না তাকে;
বাসর-ঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে।
মুখোমুখি বসব বলে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।
সেদিন গান গাইল পাখিরা,
তাদের নেই অচল খাঁচা,
তারা নীড় যেমন বাঁধে তেমনি আবার ভাঙে।
বসন্তে এ পারে তাদের পালা, শীতের দিনে ও পারের অরণ্যে।

সেদিন সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা।
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া—
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকিব ওরা,
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে;
আজ কানে কানে বলছ আমায়,
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"
আমি পাকা করে গাঁথি নি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদি নি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়-দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চলে।

৬ আগস্ট ১৯৩৬

খাপছাড়া

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
বন্ধুবরেষু

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা,
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার
শুধাব বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ভাদ্র ১৩৪৩

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চার দিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচ্‌কে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
দুটো বেগুন, একটা চড়ুইছানা,
জামের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটিমাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা,
টুক্‌রো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়্‌কে কাঠির,
নল্‌ছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা,
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ ১৩৪৩

১

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়।

২

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেট্‌কি।

আনবে কট্‌কি জুতো,
মট্‌কিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো;
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে
বোয়ালের পেট কি।

চিনেবাজারের থেকে
এনো তো করম্‌চা,
কাঁকড়ার ডিম চাই,
চাই যে গরম চা,
নাহয় খর্‌চা হবে
মাথা হবে হেঁট কি।

মনে রেখো বড়ো মাপে
করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়—
তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝড়িয়াতে
জিলিপির রেট্‌ কী।

৩

পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী,
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।'
শেষকালে একদিন
গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসালো মা গঙ্গায়;
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি;
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি।

৪

কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তুর,
রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ,
রেগেমেগে শেষকালে
বলে ওঠে—দুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল
মুখে ডালকুত্তোর।

৫

দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল-
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা-পাখি
গালে মারল থাবল।

দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্র সীমার মাত্রা—
নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওলপিণ্ডি যাত্রা।
উর্দু ভাষায় হাজাম এসে
বক্‌ল আবল-তাবল।

তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙল যখন পটাং,
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাত সাবল।

৬

ক

নিধু বলে আড়চোখে, 'কুছ্ নেই পরোয়া'—
স্ত্রী দিলে গলায় দড়ি, বলে, 'এটা ঘরোয়া।'
দারোগাকে হেসে কয়,
'খবরটা দিতে হয়'—
পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।
বলে, 'চরণের রেণু
নাহি চাহিতেই পেনু',
এই ব'লে নিধিরাম করে পায়ে-ধরোয়া।

খ

নিধু বাঁকা ক'রে ঘাড় ওড়নাটা উড়িয়ে,
বলে, 'মোর পাকা হাড়, যাব নাকো বুড়িয়ে।
যে যা খুশি করুক্-না,
মারুক্-না, ধরুক্-না,
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে।'
গালি তারে দিলে লোকে
হাসে নিধু আড়চোখে,
বলে, 'দাদা, আরো বলো, কান গেল জুড়িয়ে।'

গ

পিসে হয় কুলদার, ভুলুদার কাকা সে,
আড়চোখে হাসে আর করে ঘাড় বাঁকা সে।
যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়,
'কেয়ার করি নে' ব'লে তুড়ি মারে আকাশে।
যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুঁপিয়ে কাঁদে,
'তবে আসি' ব'লে হাসি চলে যায় ঢাকা সে।

৭

দু-কানে ফুটিয়ে দিয়ে
কাঁকড়ার দাঁড়া
বর বলে, 'কান দুটো
ধীরে ধীরে নাড়া।'
বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নায়
হাজার হাজার আছে
মেছনীর পাড়া
কোথাও ঘটে নি কানে
এত বড়ো ফাঁড়া।

৮

পাখিওয়ালা বলে, 'এটা
কালোরঙ চন্দনা;'
পানুলাল হালদার
বলে, 'আমি অন্ধ না—
কাক ওটা নিশ্চিত,
হরিনাম ঠোঁটে নাই।'
পাখিওয়ালা বলে, 'বুলি
ভালো করে ফোটে নাই,
পারে না বলিতে 'বাবা',
'কাকা' নামে বন্দনা।'

৯

রসগোল্লার লোভে
পাঁচকড়ি মিত্তির
দিল ঠোঙা শেষ করে
বড়ো ভাই পৃথ্বীর।
সইল না কিছুতেই, যকৃতের নিচুতেই
যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে
ব্যামো হল পিত্তির।
ঠোঙাটাকে বলে, 'বাজি ময়রার কারসাজি;'
দাদার উপরে রাগে—
দাদা বলে, 'চিত্তির!
পেটে যে স্মরণসভা
আপনারি কীর্তির।'

১০

হাতে কোনো কাজ নেই,
নওগাঁর তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।

ভাঙা খাট কিনেছিল,
ছ পয়সা খর্চা,
শোয় না সে, হয় পাছে
কুঁড়েমির চর্চা।

বলে, 'ঘরে এত ঠাসা
কিঙ্কর কিঙ্করী,
তাই কম খেয়ে খেয়ে
দেহটারে ক্ষীণ করি।'

১১

মেছুয়াবাজার থেকে
পালোয়ান চারজন
পরের ঘরেতে করে
জঞ্জাল মার্জন।
ডালায় লাগিয়ে চাপ
বাক্সো করেছে সাফ,
হঠাৎ লাগালো গুঁতো
পুলিসের সার্জন।
কেঁদে বলে, 'আমাদের
নেই কোনো গার্জন,
ভেবেছিনু হেথা হয়
নৈশ-বিদ্যালয়
নি-খর্‌চা জীবিকার
বিদ্যা-উপার্জন।'

১২

চৌরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টমবাবা,
নাম নিল বেণু।
শুদ্ধ নিয়ম-মতে
মুরগিরে পালিয়া,

গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া;
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু।

১৩

ইতিহাস-বিশারদ গণেশ ধুরন্ধর
ইজারা নিয়েছে একা বম্বাই বন্দর।
নিয়ে সাতজন জেলে
দেখে মাপকাঠি ফেলে—
সাগর-মথনে কোথা উঠেছিল চন্দর,
কোথা ডুব দিয়ে আছে ডানাকাটা মন্দর।

১৪

মুচ্‌কে হাসে অতুল খুড়ো,
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ,
'পরতে হবে মোজা।'
হাসল ভজা, হাসল নবাই,
'ভারি মজা' ভাবল সবাই—
ঘরসুদ্ধ উঠল হেসে,
কারণ যায় না বোঝা।

১৫

স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা;
নদী কিংবা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধা।
এমন সময় হঠাৎ দেখি
দিক্‌-সীমানায় গেছে ঠেকি
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা।
'নৌকোতে তোর পার করে দে'
এই ব'লে তার কাঁদা।
আমি বলি, 'ভাবনা কী তায়,
আকাশপারে নেব মিতায়,

কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা;
দেখছ আমার চতুর্দিকটা
স্বপ্নজালে ফাঁদা।'

১৬

বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি
রোগা ফণী আর মোটা পণ্ডিতে
মণিকর্ণিকা-ঘাটে ঠকাঠকি
যেন বাঁশে আর সরু কঞ্চিতে।
দুজনে না জানে এই বউ কার,
মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার,
পণ্ডি চেঁচায় শুধু হাউহাউ—
'পারবি নে তুই মোরে বঞ্চিতে।'
বউ বলে, 'বুঝে নিই দাউদাউ
মোর তরে জ্বলে ওই কোন্ চিতে।'

১৭

ইঁদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা,
হঠাৎ খেয়াল গেল যাবেই সে বর্মা।
দেখবে-শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
রাঁধবে বাড়বে, দেবে গোরুটাকে জাবনা,
সহধর্মিণী নেই, খোঁজে সহধর্মা।
গেল তাই খণ্ডালা, গেল তাই অণ্ডালে,
মহা রেগে গাল দেয় রেলগাড়ি-চণ্ডালে,
সাথী খুঁজে সে বেচারা কী গলদ্‌ঘর্মা,
বিস্তর ভেবে শেষে গেল সে কোডর্মা।

১৮

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।

অনুকূল বাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে,
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য!

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বি'ধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।

১৯

ভয় নেই, আমি আজ
রান্নাটা দেখছি।
চালে জলে মেপে নিখুঁ,
চড়িয়ে দে ডেক্‌চি।

আমি গণি কলাপাতা,
তুমি এসো নিয়ে হাতা,
যদি দেখ মেজবউ,
কোনোখানে ঠেক্‌ছি।

রুটি মেখে বেলে দিয়ো,
উনুনটা জেবলে দিয়ো,
মহেশকে সাথে নিয়ে
আমি নয় সে'কছি।

২০

মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক,
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নিয়্‌বাঁধুনিক।

পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

২১

কালুর খাবার শখ সব চেয়ে পিষ্টকে।
গৃহিণী গড়েছে যেন চিনি মেখে ইষ্টকে।
পুড়ে সে হয়েছে কালো,
মুখে কালু বলে 'ভালো';
মনে মনে খোঁটা দেয় দগ্ধ অদৃষ্টকে।
কলিক্‌-ব্যথায় ডাকে রুলে-বে'ধা খৃষ্টকে।

হাতে কোনো কাজ নেই,

'বাবা বলেছেন থাক'

২২

রাজা বসেছেন ধ্যানে,
বিশজন সর্দার
চীৎকার রবে তারা
হাঁকিছে—'খবরদার'।

সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তার সাথে
ঢাকঢোল-বর্দার।

ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রানীরা মূর্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।

২৩

নাম তার সন্তোষ,
জঠরে অগ্নিদোষ,
হাওয়া খেতে গেল সে পচম্বা।
নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘনাপাড়ায় থাকে
বউ তার বেঁটে জগদম্বা।

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন
দিল ইনজেক্‌শন,
দেহ হল সাত ফুট লম্বা।
এত বাড়াবাড়ি দেখে
সন্তোষ কহে হেঁকে,
'অপমান সহিব কথম্‌ বা।

শুন ডাক্তার ভায়া,
উঁচু করো মোর পায়া,
স্ত্রীর কাছে কেন রব কম বা,
খড়ম জোড়ায় ঘ'ষে
ওষুধ লাগাও কষে;'
শুনে ডাক্তার হতভম্বা।

২৪

বর এসেছে বীরের ছাঁদে
　　বিয়ের লগ্ন আট্‌টা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
　　গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
　　আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
　　মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
　　বর হেসে কয়—‘ঠাট্টা’।

২৫

নিষ্কাম পরহিতে কে ইহারে সামলায়—
স্বার্থেরে নিঃশেষে-মুছে-ফেলা মামলায়।

চলেছে উদারভাবে সম্বল-খোয়ানি,
গিনি যায়, টাকা যায়, সিকি যায় দোয়ানি,
　　হল সারা বাঁটোয়ারা উকিলে ও আমলায়।

গিয়েছে পরের লাগি অন্নের শেষ গুঁড়ো,
কিছু খুঁটে পাওয়া যায় ভূষি তুঁষ খুদকুঁড়ো,
　　গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়।

২৬

জামাই মহিম এল সাথে এল কিনি—
হায় রে কেবলই ভুলি ষষ্ঠীর দিনই।

　দেহটা কাহিল বড়ো রাঁধবার নামে,
　কে জানে কেন রে বাপু ভেসে যায় ঘামে।
বিধাতা জানেন আমি বড়ো অভাগিনী।
বেয়ানকে লিখে দেব, খাওয়াবেন তিনি।

২৭

ঘাসি কামারের বাড়ি
　　　　সাঁড়া,
গড়েছে মন্ত্র-পড়া
　　　　খাঁড়া।
　　খাপ থেকে বেরিয়ে সে
　　উঠেছে অট্টহেসে,

কামার পালায় যত
বলে, 'দাঁড়া
দাঁড়া।'
দিনরাত দেয় তার
নাড়ীটাতে
নাড়া।

২৮

যখনি যেমনি হোক জিতেনের মর্‌জি,
কথায় কথায় তার লাগে আশ্চর্যি।

অডিটর ছিল জিতু হিসাবেতে টঙ্ক
আপিসে মেলাতেছিল বজেটের অঙ্ক,
শুনলে সে, গেছে দেশে রামদীন দর্জি,
শুনতে না-শুনতেই বলে 'আশ্চর্যি'।

যে দোকানি গাড়ি তাকে করেছিল বিক্রি
কিছুতে দাম না পেয়ে করেছে সে ডিক্রি,
বিস্তর ভেবে জিতু উঠল সে গর্জি—
'ভারি আশ্চর্যি'।

শুনলে, জামাইবাড়ি ছিল বুড়ি ঝিনাদায়
ছ বছর মেলেরিয়া ভুগে ভুগে চিনা দায়,
সেদিন মরেছে শেষে পুরোনো সে ওর ঝি,
জিতেন চশমা খুলে বলে 'আশ্চর্যি'।

২৯

'শুনব হাতির হাঁচি'
এই ব'লে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।

শুঁড়ে সুড়্‌সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি,
সাত জালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি';
জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেষ্টা,
হেঁচে দু-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা।

৩০

আধা রাতে গলা ছেড়ে
 মেতেছিনু কাব্যে
ভাবি নি পাড়ার লোকে
 মনেতে কী ভাব্‌বে।
ঠেলা দেয় জানলায়
 শেষে দ্বার-ভাঙাভাঙি
ঘরে ঢুকে দলে দলে
 মহা চোখ-রাঙারাঙি,
শ্রাব্য আমার ডোবে
 ওদেরই অশ্রাব্যে।
আমি শুধু করেছিনু
 সামান্য ভনিতাই
সামলাতে পারল না
 অরসিক জনে তাই;
কে জানিত অধৈর্য
 মোর পিঠে নাব্‌বে!

৩১

গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার;
 নিন্দাবাদের দংশনে
অভিমানে মরতে গেল
 মোগলসরাই জংসনে।
কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে গুপি
ধরল ইজের, পরল টুপি,
দু হাত দিয়ে লেগে গেল
 কোফ্‌তা-কাবাব-ধ্বংসনে।
 গুরুপুত্র সঙ্গে ছিল,
 বললে তারে, ‘অংশ নে।’

৩২

বেণীর মোটরখানা
 চালায় মুখুজ্জে।
বেণী ঝেঁকে উঠে বলে,
 ‘মরল কুকুর যে!’

অকারণে সেরে দিলে
 দফা ল্যাম্‌-পোস্‌টার,
নিমেষেই পরলোকে
 গতি হল মোষটার।

যে দিকে ছুটেছে সোজা
ওদিকে পুকুর যে,
আরে চাপা পড়ল কে?
জামাই খুকুর যে।

৩৩

নাম তার ডাক্তার ময়জন্।
বাতাসে মেশায় কড়া পয়জন্।

গণিয়া দেখিল, বড়ো বহরের
একখানা রীতিমতো শহরের
টিঁকে আছে নাবালক নয়জন।

খুশি হয়ে ভাবে এই গবেষণা
না জানি সবার কবে হবে শোনা,
শুনিতে বা বাকি রবে কয়জন।

৩৪

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে,
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার।

৩৫

ঘোষালের বক্তৃতা
করা কর্তব্যই,
বেঞ্চি চৌকি আদি
আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি
পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি
নিজহাতে করেছে।
চোখ বুজে ভাবে, বুঝি
এল সব সভ্যই,
চোখ চেয়ে দেখে, বাকি
শুধু নিরেনব্বই।

৩৬

কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে
পাড়া চারিদিককার,
সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে
নিয়ে ঝুলি ভিক্ষার।

বলে সিধু গড়গড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
'ভিখ্ মেগে ফের', মনে
হয় না কি ধিক্কার?'
ঝুলি নিজে কেড়ে বলে,
'মাহিনা এ শিক্ষার।'

৩৭

মুরগি-পাখির 'পরে
অন্তরে টান তার,
জীবে তার দয়া আছে
এই তো প্রমাণ তার।
বিড়াল চাতুরী ক'রে
পাছে পাখি নেয় ধরে,
এই ভয়ে সেই দিকে
সদা আছে ক্যান তার—
শেয়ালের খলতায়
ব্যথা পায় প্রাণ তার।

৩৮

সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে
জুটল চুপিচুপি
গোপেন্দ্র মুস্তুফি।

রাত্রে যখন ফিরল ঘরে
সবাই দেখে তারিফ করে—
পাগ্‌ড়িতে তার জুতোজোড়া,
পায়ে রঙিন টুপি।

এই উপ্‌দেশ দিতে এল—
সব করা চাই এলোমেলো,
'মাথায় পায়ে রাখব না ভেদ'
—চেঁচিয়ে বলে গুপি।

৩৯

সভাতলে ভুঁয়ে
কাৎ হয়ে শুয়ে
নাক ডাকাইছে সুল্‌তান,
পাকা দাড়ি নেড়ে
গলা দিয়ে ছেড়ে
মন্ত্রী গাহিছে মুলতান।

এত উৎসাহ দেখি গায়কের
জেদ হল মনে সেনানায়কের—
কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে
নেচে করে সভা গুলতান।
ফেলে সব কাজ
বরকন্দাজ
বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।

৪০

নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।

সুরবোধ-সাধনায়
ধুরপদে বাধা নাই,
পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব—
অতি-ভালোমানুষেরও বুকে জাগে বীরত্ব।

৪১

ইঁটের গাদার নীচে
ফটকের ঘড়িটা।
ভাঙা দেয়ালের গায়ে
হেলে-পড়া কড়িটা।

পাঁচিলটা নেই, আছে
কিছু ইঁট সুর্‌কি।
নেই দই সন্দেশ,
আছে খই মুড়্‌কি।
ফাটা হুঁকো আছে হাতে,
গেছে গড়গড়িটা।
গলায় দেবার মতো
বাকি আছে দড়িটা।

৪২

নিজের হাতে উপার্জনে
  সাধনা নেই সহিষ্ণুতার।
পরের কাছে হাত পেতে খাই,
  বাহাদুরি তারি গুঁতার।

কৃপণ দাতার অন্নপাকে
ডাল যদি বা কম্‌তি থাকে
গান-মিশানো গিলি তো ভাত—
  নাহয় তাতে নেইকো সুতার।
নিজের জুতার পাত্তা না পাই,
  স্বাদ পাওয়া যায় পরের জুতার।

৪৩

আদর ক'রে মেয়ের নাম
    রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হল বিয়ের হাট
    ওই মেয়েরই দর নিয়া।

মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
    পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি
    নামজাদা সে বর নিয়া,
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
    নামের গুণ বর্ণিয়া।

৪৪

কন্‌কনে শীত তাই
    চাই তার দস্তানা,
বাজার ঘুরিয়া দেখে
    জিনিসটা সস্তা না।
কম দামে কিনে মোজা
    বাড়ি ফিরে গেল সোজা,
কিছুতে ঢোকে না হাতে,
    তাই শেষে পস্তানা।

৪৫

খবর পেলেম কল্য,
তাঞ্জামেতে চ'ড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চলল।

সময়টা তার জল্‌দি কাটে;
পৌঁছল যেই হল্‌দিঘাটে,
একটা ঘোড়া রইল বাকি
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরানহাটায় পৌঁছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল।

৪৬

'সময় চলেই যায়'
নিত্য এ নালিশে
উদ্‌বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।

কব্‌জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
একদম ক'রে দিল
দম তার বন্ধ,
সময় নড়ে না আর,
হাতে বাঁধা থালি সে,
ভুপুরাম অবিরাম—
বিশ্রাম-শালী সে।

ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্‌দুর,
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত
ডালাটার কাঁচটায়;
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিশে।
বিছানায় প'ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

৪৭

উজ্জ্বলে ভয় তার,
ভয় মিট্‌মিটেতে,
ঝালে তার যত ভয়
তত ভয় মিঠেতে।

ভয় তার পশ্চিমে,
ভয় তার পূর্বে,
যে দিকে তাকায়, ভয়
সাথে সাথে ঘুরবে।
ভয় তার আপনার
বাড়িটার ইঁটেতে,
ভয় তার অকারণে
অপরের ভিটেতে।

ভয় তার বাহিরেতে
ভয় তার অন্তরে,
ভয় তার ভূত-প্রেতে
ভয় তার মন্তরে।
দিনের আলোতে ভয়
সামনের দিঠেতে,
রাতের আঁধারে ভয়
আপনারি পিঠেতে।

৪৮

কনের পণের আশে
চাকরি সে ত্যেজেছে।
বারবার আয়নাতে
মুখখানি মেজেছে।

হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শ্বশুরে,
কনেও বাঁকালো মুখ,
বুকে তাই বেজেছে।
বরবেশ ছেড়ে হীরু
দরবেশ সেজেছে।

৪৯

বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।

পণ দেবে কত টাকা
লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
এসেছে সই-বাহিক।

৫০

আয়না দেখেই চমকে বলে,
'মুখ যে দেখি ফ্যাকাশে,
বেশিদিন আর বাঁচব না তো—'
ভাবছে বসে একা সে।
ডাক্তারেরা লুটল কড়ি,
খাওয়ায় জোলাপ, খাওয়ায় বড়ি,
অবশেষে বাঁচল না সেই
বয়স যখন একাশি।

৫১

বাদশার মুখখানা
গুরুতর গম্ভীর,
মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে;
কহিলা বাদশা-বীর—
'যতগুলো দম্ভীর
দম্ভ মুছিব চেঁচে পুঁছে।'

উঁচু মাথা হল হেঁট,
খালি হল ভরা পেট,
শপাশপ্ পিঠে পড়ে বেত।
কভু ফাঁসি কভু জেল,
কভু শূল কভু শেল,
কভু ক্রোক দেয় ভরা খেত।

মহিষী বলেন তবে—
'দম্ভ যদি না রবে
কী দেখে হাসিব তবে প্রভু;'
বাদশা শুনিয়া কহে—
'কিছুই যদি না রহে
হসনীয় আমি রব তবু।'

৫২

আপিস থেকে ঘরে এসে
মিলত গরম আহার্য,
আজকে থেকে রইবে না আর
তাহার জো।

বিধবা সেই পিসি ম'রে
গিয়েছে ঘর খালি ক'রে,
বন্দি স্বয়ং করেছে তার
সাহায্য।

৫৩

গব্বুরাজার পাতে
ছাগলের কোর্মাতে
যবে দেখা গেল তেলা-
পোকাটা
রাজা গেল মহা চ'টে,
চীৎকার ক'রে ওঠে—
'খানসামা কোথাকার
বোকাটা।'

মন্ত্রী জুড়িয়া পাণি
কহে, 'সবই এক প্রাণী।'
রাজার ঘুচিয়া গেল
ধোঁকাটা।
জীবের শিবের প্রেমে
একদম গেল থেমে
মেঝে তার তলোয়ার
ঠোকাটা।

৫৪

নামজাদা দানুবাবু
রীতিমতো খর্‌চে,
অথচ ভিটেয় তার
ঘুঘু সদা চরছে।
দানধর্মের 'পরে
মন তার নিবিষ্ট,
রোজগার করিবার
বেলা জপে 'শ্রীবিষ্ণু',
চাঁদার খাতাটা তাই
দ্বারে দ্বারে ধরছে।
এই ভাবে পুণ্যের
খাতা তার ভরছে।

৫৫

বহু কোটি যুগ পরে
সহসা বাণীর বরে
জলচর প্রাণীদের
কণ্ঠটা পাওয়া যেই
সাগর জাগর হল
কতমতো আওয়াজেই।
তিমি ওঠে গাঁ গাঁ ক'রে
চিঁ চিঁ করে চিংড়ি,
ইলিশ বেহাগ ভাঁজে
যেন মধু নিংড়ি';
শাঁখগুলো বাজে, বহে
দক্ষিণে হাওয়া যেই,
গান গেয়ে শুশুকেরা
লাগে কুচ-কাওয়াজেই।

৫৬

আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র,
তারি ঘরে দেখি মোর কুন্তল বৃষ্য।
কহিনু তাহারে ডেকে—
'এ শিশিটা এনেছে কে,
শোভন করিতে চাও হেঁশেলের দৃশ্য?'

সে কহিল, 'বরিষার
এই ঋতু; সরিষার
তেলে ক'ষে যায় ধাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।'
কহে, 'কাঠমুণ্ডার
নেপালের গুণ্ডার
এই তেলে কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।
লোকমুখে শুনেছি তো রাজা গোলকুণ্ডার
এই সাত্ত্বিক তেলে পূজার হবিষ্য।
আমি আর তাঁরা সবে চরকের শিষ্য।'

৫৭

রান্নার সব ঠিক,
পেয়েছি তো নুনটা,
অল্প অভাব আছে
পাই নি বেগুনটা।
পরিবেশনের তরে
আছি মোরা সব ভাই,

যাদের আসার কথা
অনাগত সব্বাই,
পান পেলে পুরো হয়
জুটিয়েছি চুনটা—
একটু-আধটু বাকি
নাই তাহে কুণ্ঠা।

৫৮

সর্দিকে সোজাসুজি
সর্দি ব'লেই বুঝি
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।
ডাক্তার দেয় শিস
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।

ভাবনায় গেল ঘুম
ওষুধের লাগে ধুম,
শঙ্কা লাগালো পারিভাষিকে।

আমি পুরাতন পাপী,
Hanging শুনেই কাঁপি,
ডরি নেকো সাদাসিধে ফাঁসিকে।

শূন্যে তবিল যবে
বলে 'পাঁচনেই হবে'—
চেতাইল এ ভারতবাসীকে।
নর্সকে ঠেকিয়ে দূরে
যাই বিক্রমপুরে,
সহায় মিলিল খাঁদুমাসিকে।

৫৯

হাস্যদমনকারী গুরু—
নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।
হাসিটা তার অপর্যাপ্ত,
তরঙ্গে তার বাতাস ব্যাপ্ত,
পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই
কাটেন মসীশ্বর।

ডাকি সরস্বতী মাকে,
'ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে,
মাস্টারিতে ভর্তি করো
হাস্যরসীশ্বর।'

৬০

ব্রিজটার প্ল্যান দিল
বড়ো এন্‌জিনিয়ার
ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ডের
সবচেয়ে সীনিয়ার।
নতুন রকম প্ল্যান
দেখে সবে অজ্ঞান,
বলে, 'এই চাই, এটা
চিনি নাই-চিনি আর।'

ব্রিজখানা গেল শেষে
কোন্‌ অঘটন দেশে,
তার সাথে গেছে ভেসে
ন-হাজার গিনি আর।

৬১

স্ত্রীর বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
'শ্যালী' ব'লে ভর্ৎসনা
করেছিল বনমালী।

এত বড়ো গালি শুনে
জ্ব'লে মরে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি.
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি।

৬২

ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা,
শ্যালা শুনে এল, তার
ডাক-নাম টঙ্কা।

বলে, 'হেন উপদেশ তোমারে দিয়েছে সে কে,
আজও আছে রাক্ষস, হঠাৎ চেহারা দেখে
রামের সেবক ব'লে করে যদি শঙ্কা।

আকৃতি প্রকৃতি তব হতে পারে জম্‌কালো,
দিদি যা বলুন, মুখ নয় কভু কম কালো,
খামকা তাদের ভয় লাগিবে আচমকা।
হয়তো বাজাবে রণডঙ্কা।'

৬৩

ভোলানাথ লিখেছিল
তিন-চারে নব্বই,
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই।

তিন-চারে বারো হয়
মাস্টার তারে কয়;
'লিখেছিনু ঢের বেশি'
এই তার গর্বই।

৬৪

একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে
চড়েছিল চাটুর্জে,
পড়ে গিয়ে কী দশা তার
হয়েছিল হাঁটুর যে!

বলে কেঁদে, 'ব্রাহ্মণেরে
বইতে ঘোড়া পারল না যে
সইত তাও, মরি আমি
তার থেকে এই অধিক লাজে
লোকের মুখের ঠাট্টা যত
বইতে হবে টাটুর যে!'

৬৫

থাকে সে কাহালগাঁয়;
কলুটোলা আফিসে
রোজ আসে দশটায়
এক্কায় চাপি সে।

ঠিক যেই মোড়ে এসে
লাগাম গিয়েছে ফেঁসে,
দেরি হয়ে গেল ব'লে
ভয়ে মরে কাঁপি সে,
ঘোড়াটার লেজ ধ'রে
করে দাপাদাপি সে।

৬৬

বটে আমি উদ্ধত
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো।
যেই দেখি গুণ্ডায়
ক্ষমি হেঁটমুণ্ডায়,
দুর্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো।
সাত্ত্বিক সাধকের এ আচার শুদ্ধ তো।

৬৭

ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলাব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।

বনমালী খুড়ো বলে—
'করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়ো না বক্ষে।'
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু 'ক্যাঙ'।

৬৮

পেঁচোটাকে মাসি তার
যত দেয় আস্কারা,
মুশকিল ঘটে তত
এক সাথে বাস করা।
হঠাৎ চিমটি কাটে
কপালের চামড়ায়
বলে সে, 'এমনি ক'রে
ভিমরুল কামড়ায়।'

আমার বিছানা নিয়ে
খেলা ওর চাষ-করা—
মাথার বালিশ থেকে
তুলোগুলো হ্রাস-করা।

৬৯

কেন মার' সিঁধ-কাটা ধূর্তে।
কাজ ওর দেয়ালটা খুঁড়তে।
তোমার পকেটটাকে করেছ কি ডোবা হে,
চিরদিন বহমান অর্থের প্রবাহে
বাধা দেবে অপরের পকেটটি পূরতে?
আর, যত নীতিকথা সে তো ওর চেনা না—
ওর কাছে অর্থ-নীতিটা নয় জেনানা;
বন্ধ ধনেরে তাই দেয় সদা ঘুরতে,
হেথা হতে হোথা তারে চালায় মুহূর্তে।

৭০

যে মাসেতে আপিসেতে
হল তার নাম ছাঁটা
স্ত্রীর শাড়ি নিজে পরে,
স্ত্রী পরিল গামছাটা।
বলে, 'আমি বৈরাগী,
ছেড়ে দেব শিগ্‌গির,
ঘরে মোর যত আছে
বিলাস সামিগ্‌গির।'
ছিল তার টিনে-গড়া
চা-খাওয়ার চাম্‌চাটা,
কেউ তা কেনে না সেটা
যত করে দাম ছাঁটা।

৭১

জমল সতেরো টাকা—
সুদে টাকা খেলাবার
শখ গেল, নবু তাই
গেল চলি ম্যালাবার।
ভাবনা বাড়ায় তার
মুনফার মাত্রা,
পাঁচ মেয়ে বিয়ে ক'রে
বাঁচল এ যাত্রা।
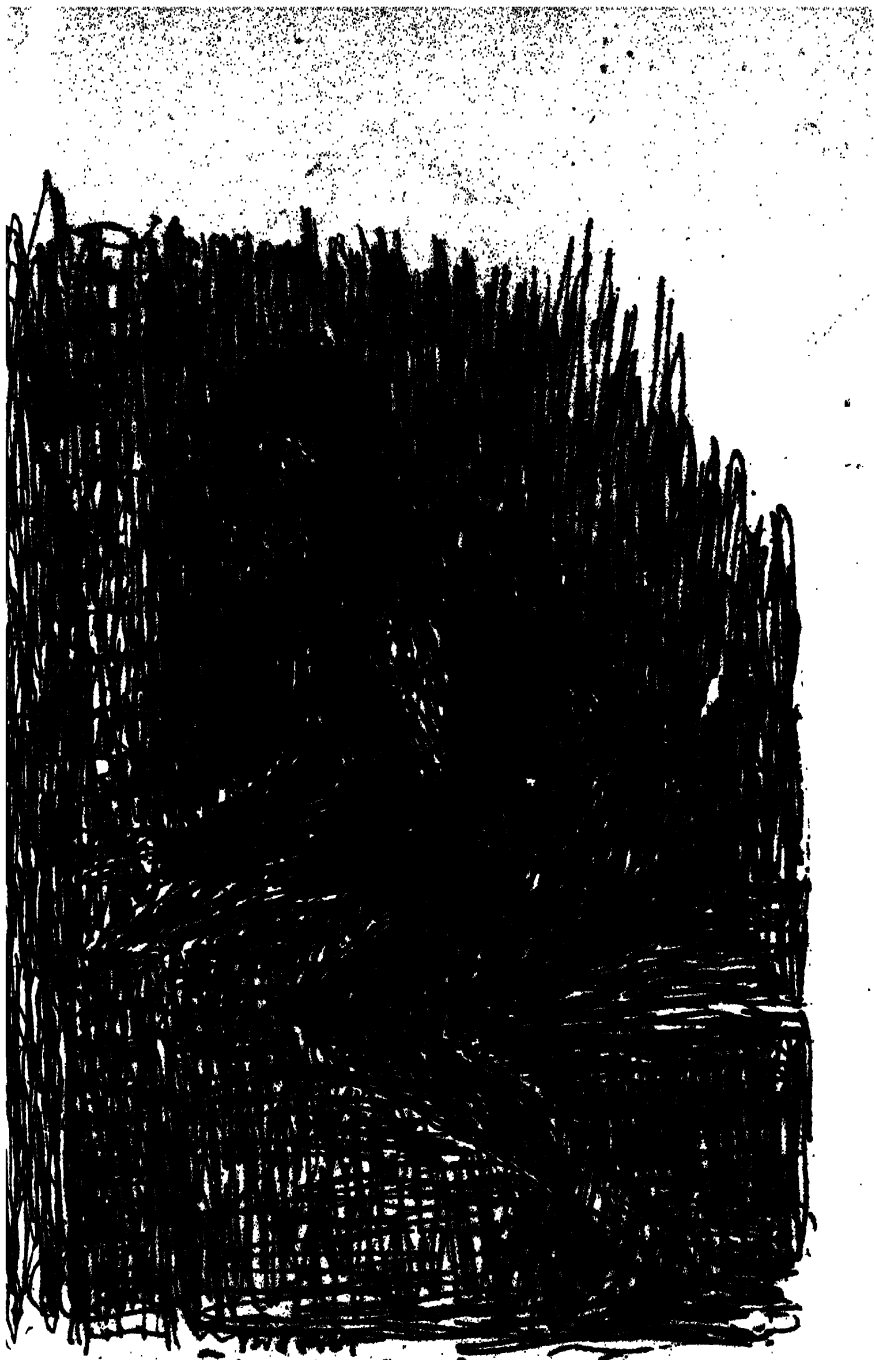
কাজ দিল কন্যারা
ঠেলাগাড়ি ঠেলাবার,
রোদ্‌দুরে ভার্যার
ভিজে চুল এলাবার।

৭২

বেদনায় সারা মন
করতেছে টনটন্‌
শ্যালী কথা বলল না
সেই বৈরাগ্যে।
মরে গেলে ট্রাস্‌টিরা
ক'রে দিক বণ্টন
বিষয়-আশয় যত,
সব-কিছু যাক গে।
উমেদারি-পথে আহা
ছিল যাহা সঙ্গী—
কোথা সে শ্যামবাজার
কোথা চৌরঙ্গি—
সেই ছেঁড়া ছাতা, চোরে
নেয় নাই ভাগ্যে—
আর আছে ভাঙা ওই
হ্যারিকেন লণ্ঠন
বিশ্বের কাজে তারা
লাগে যদি লাগ্‌ গে।

৭৩

ইস্কুল এড়ায়নে
সেই ছিল বরিষ্ঠ,
ফেল-করা ছেলেদের
সবচেয়ে গরিষ্ঠ।
কাজ যদি জুটে যায়
দুদিনে তা ছুটে যায়,
চাকরির বিভাগে সে
অতিশয় নড়িষ্ঠ,
গলদ করিতে কাজে
ভয়ানক দ্রঢ়িষ্ঠ।

৭৪

দাঁয়েদের গিন্নিটি
 কিপ্‌টে সে অতিশয়,
পান থেকে চুন গেলে
 কিছুতে না ক্ষতি সয়।
কাঁচকলা-খোসা দিয়ে
পচা মহুয়ার ঘিয়ে
ছেঁচ্‌কি বানিয়ে আনে—
 সে কেবল পতি সয়;
একটু করলে 'উহুঁ'
 যদি এক রতি সয়!

৭৫

আধখানা বেল
 খেয়ে কানু বলে—
 'কোথা গেল বেল
 একখানা।'
আধা গেলে শুধু
 আধা বাকি থাকে,
 যত করি আমি
 ব্যাখ্যানা,
সে বলে, 'তা হলে মহা ঠকিলাম,
আমি তো দিয়েছি ষোলো-আনা দাম।'
 হাতে হাতে সেটা করিল প্রমাণ
 ঝাড়া দিয়ে তার
 ব্যাগখানা।

৭৬

পাড়াতে এসেছে এক
 নাড়ীটেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায়
 অতি উঁচু নাক তার।

নাম লেখে ওষুধের,
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা,
 এই বড়ো জাঁক তার।

যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ী,
পাওনাটা আদায়ের
মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্বাক্‌পুরে
ভক্তের ঝাঁক তার।

৭৭

ইয়ারিং ছিল তার দুকানেই।
গেল যবে স্যাকরার দোকানেই,
মনে প'ল গয়না তো চাওয়া যায়,
আরেকটা কান কোথা পাওয়া যায়,
সে কথাটা নোটবুকে টোকা নেই।
মাসি বলে, 'তোর মতো বোকা নেই।'

৭৮

লটারিতে পেল পীতু
হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী-লেখার লোক
জুটিল সে-মাত্তর।

যখনি পড়িল চোখে
চেহারাটা চেক্‌টার
'আমি পিসে' কহে এসে
ড্রেন্‌ইন্‌স্‌পেকটার।
গুরু-ট্রেনিঙের এক
পিলেওয়ালা ছাত্তর
অযাচিত এল তার
কন্যার পাত্তর।

৭৯

চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট
দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে
দশ টাকার।

কাগজ-গন্‌তি মুনফা যতই
বাড়ে
টাকার গন্‌তি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে,
কিছুতে বুঝিতে পারে না
দোষটা কার।

৮০

জিরাফের বাবা বলে—
'খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
ক'মে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু
পিছনেতে খাটো
এমন দেহটা নিয়ে
কী করে যে হাঁটো।'

খোকা বলে, 'আপনার
পানে তুমি চেহো,
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তা কেহ।'

৮১

যখন জলের কল
হয়েছিল পলতায়
সাহেবে জানালো খুদু,
ভরে দেবে জল তায়।
ঘড়াগুলো পেত যদি
শহরে বহাত নদী,
পারে নি যে সে কেবল
কুমোরের খলতায়।

৮২

মহারাজা ভয়ে থাকে
পুলিশের থানাতে,
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে।
চর ফিরে তাকে তাকে,
সাধু যদি ছাড়া থাকে,

খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তাহা জানাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে।

৮৩

বাংলাদেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জল-হাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কী তোরে।
লড়াই ভালোবাসিস, সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে।

৮৪

ডাকাতের সাড়া পেয়ে
তাড়াতাড়ি ইজেরে
চোখ ঢেকে মুখ ঢেকে
ঢাকা দিল নিজেরে।

পেটে ছুরি লাগালো কি,
প্রাণ তার ভাগালো কি,
দেখতে পেল না কালু
হল তার কী যে রে!

৮৫

গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাবনায়
দিনরাত একা ব'সে কাটালো সে পাবনায়—
নাম তার চুনিলাল, ডাক নাম ঝোড়্কে।
১ গুলো সবই ১ সাদা আর কালো কি,
গণিতের গণনায় এ মতটা ভালো কি।
অবশেষে সাম্যের সামলাবে তোড় কে।

একের বহর কভু বেশি কভু কম হবে,
এক রীতি হিসাবের তবুও কি সম্ভবে।
৭ যদি বাঁশ হয়, ৩ হয় খড়্কে,
তবু শুধু ১০ দিয়ে জুড়বে সে জোড় কে।

যোগ যদি করা যায় হিড়িম্বা কুন্তীতে,
সে কি ২ হতে পারে গণিতের গন্‌তিতে।
যতই-না কষে নাও মোচা আর থোড়কে
তার গুণফল নিয়ে আঁক যাবে ভড়্‌কে।

৮৬

তম্বুরা কাঁধে নিয়ে
শর্মা বাণেশ্বর
ভেবেছিল তীর্থেই
যাবে সে থানেশ্বর।
হঠাৎ খেয়াল চাপে গাইয়ের কাজ নিতে
বরাবর গেল চলে একদম গাজ্‌নিতে,
পাঠানের ভাব দেখে
ভাঙিল গানের স্বর।

৮৭

নিদ্রা ব্যাপার কেন
হবেই অবাধ্য,
চোখ-চাওয়া ঘুম হোক
মানুষের সাধ্য;
এম.এস্‌সি বিভাগের ব্রিলিয়ান্‌ট্‌ ছাত্র
এই নিয়ে সন্ধান করে দিনরাত্র,
বাজায় পাড়ার কানে
নানাবিধ বাদ্য,
চোখ-চাওয়া ঘটে তাহে,
নিদ্রার শ্রাদ্ধ।

৮৮

দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই।
ব্যাবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্যি-fy।

ক্রিটিক মহল করেছি ঠান্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি-আন্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-
চারটি পাই,
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয়
certify।

৮৯

জান তুমি রাত্তিরে
নাই মোর সাথী আর—
ছোটোবউ জেগে থেকো
হাতে রেখো হাতিয়ার।
যদি করে ডাকাতি,
পারি নে যে তাকাতেই,
আছে এক ভাঙা বেত
আছে ছেঁড়া ছাতি আর।
ভাঙতে চায় না ঘুম
তা না হলে দুমাদুম্
লাগাতেম কিল ঘুষি
চালাতেম লাথি আর।

৯০

পণ্ডিত কুমিরকে
ডেকে বলে, 'নক্র,
প্রখর তোমার দাঁত,
মেজাজটা বক্র।'

আমি বলি, 'নখ তব
করো তুমি কর্তন,
হিংস্র স্বভাব তবে
হবে পরিবর্তন
আমিষ ছাড়িয়া যদি
শুধু খাও তক্র।'

৯১

শ্বশুরবাড়ির গ্রাম নাম তার কুল-কাঁটা।
যেতে হবে উপেনের চাই তাই চুল-ছাঁটা।
নাপিত বললে, 'কাঁচি
খুঁজে যদি পাই বাঁচি,
ক্ষুর আছে, একেবারে করে দেব মুল-ছাঁটা।
জেনো বাবু, তা হলেই বেঁচে যায় ভুল-ছাঁটা।'

৯২

খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুলনা
যত কেন রাগ কর, কে বলে তা ভুল না।

মালা গাঁথা পণ ক'রে আন যদি আমড়া,
রাগ করে বেত মেরে ফাটাও-না চামড়া,
তবুও বলতে হবে—ও জিনিস ফুল না।

বেঞ্চিতে বসে তুমি বল যদি 'দোল দাও',
চটে-মটে শেষে যদি কড়া কড়া বোল দাও,
পষ্ট বুঝিয়ে দেব, ওটা নয় ঝুল্‌না।

যদি বা মাথার গোলে ঘরে এসে বসবার
হাঁটুতে বুরুশ কর একমনে দশবার,
কী করি, বলতে হবে, ওখানে তো চুল না।

৯৩

নীলুবাবু বলে, 'শোনো
নেয়ামৎ দর্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'

শুনে নিয়ামৎ মিঞা যতনে পাঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু, 'এ কী আশ্চর্য!'
ঘরের গৃহিণী কয়, 'রয় না তো ধর্য।'

৯৪

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য।
বিড়াল কহিল, "ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে—
'ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষো।'
ওই দেখো পুকুরের ধারে আছে ঢালু ডাঙা,
ওইখানে শয়তান বসে থাকে মাছরাঙা,
কেন মিছে হবে ওর চঞ্চুর লক্ষ্য!"

৯৫

হরিপণ্ডিত বলে, 'ব্যঞ্জন সন্ধি এ,
পড়ো দেখি মনুবাবা একটুকু মন দিয়ে।'

মনোযোগহস্তীর
বেড়ি আর খন্তির
ঝংকার মনে পড়ে; হেঁশেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।
থেকে থেকে জল পড়ে চক্ষুর কোণ দিয়ে।

৯৬

ঝিনেদার জ্ঞানদার
ছেলেটার জন্যে
ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে
খুঁজে পেল কন্যে।

শহরেতে সব সেরা
ছিল যেই বিবেচক
দেখে দেখে বললে সে—
'কিবে নাক, কিবে চোখ;
চুলের ডগার খুঁত
বুঝবে না অন্যে।'

কন্যেকর্তা শুনে
ঘটকের কানে কয়—
'ওটুকু ত্রুটির তরে
করিস নে কোনো ভয়;
ক-খানা মেয়েকে বেছে
আরো তিনজন নে,
তাতেও না ভরে যদি
ভরি-কয় পণ নে।'

৯৭

খুদিরাম ক'ষে টান
দিল থেলো হুঁকোতে—
গেল সারবান কিছু
অন্তরে ঢুকোতে।
অবশেষে হাঁড়ি শেষ
করি রসগোল্লার

রোদে ব'সে খুদুবাবু
গান ধরে মোল্লার;
বলে, 'এতখানি রস
দেহ থেকে চুকোতে
হবে তাকে ধোঁয়া দিয়ে
সাত দিন শুকোতে।'

৯৮

প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায়-মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খত দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক,
কথা-শোনবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক;
ক্লাসে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত,
বেঞ্চিটেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।

৯৯

জন্মকালেই ওর. লিখে দিল কুষ্ঠি,
ভালো মানুষের 'পরে চালাবে ও মুষ্টি।

যতই প্রমাণ পায় বাবা বলে, 'মোদ্দা,
কভু জন্মে নি ঘরে এত বড়ো যোদ্ধা।'
'বেঁচে থাকলেই বাঁচি' বলে ঘোষগুষ্টি,
এত গাল খায় তবু এত পরিপুষ্টি।

১০০

টাকা সিকি আধুলিতে
ছিল তার হাত জোড়া;
সে-সাহসে কিনেছিল
পান্তোয়া সাত ঝোড়া।

ফুঁকে দিয়ে কড়াকড়ি
শেষে হেসে গড়াগড়ি;
ফেলে দিতে হল সব—
আলুভাতে পাত-জোড়া।

১০১

বেলা আটটার কমে
  খোলে না তো চোখ সে।
সামলাতে পারে না যে
  নিদ্রার ঝোঁক সে।
জরিমানা হলে বলে—
  'এসেছি যে মা ফেলে,
আমার চলে না দিন
  মাইনেটা না পেলে।
তোমার চলবে কাজ
  যে ক'রেই হোক সে,
আমারে অচল করে
  মাইনের শোক সে।'

১০২

বশীরহাটেতে বাড়ি
  বশ-মানা ধাত তার,
ছেলে বুড়ো যে যা বলে
  কথা শোনে যার-তার।

দিনরাত সর্বথা
  সাধে নিজ খর্বতা,
মাথা আছে হেঁট-করা,
  সদা জোড়-হাত তার,
সেই ফাঁকে কুকুরটা
  চেটে যায় পাত তার।

১০৩

নাম তার চিনুলাল
  হরিরাম মোতিভয়,
কিছুতে ঠকায় কেউ
  এই তার অতি ভয়।
সাতানব্বই থেকে
  তেরোদিন ব'কে ব'কে
বারোতে নামিয়ে এনে
  তবু ভাবে, গেল ঠ'কে।
মনে মনে আঁক কষে,
  পদে পদে ক্ষতি-ভয়।
কষ্টে কেরানি তার
  টিঁকে আছে কতিপয়।

১০৪

হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই
তুলেছিল হাজারটা বাঘে,
ময়মনসিংহের মাসতুত ভাই
গর্জি উঠিল তাই রাগে।
খেঁকশেয়ালের দল শেয়ালদহর
হাঁচি শুনে হেসে মরে অষ্টপ্রহর,
হাতিবাগানের হাতি ছাড়িয়া শহর
ভাগলপুরের দিকে ভাগে,
গিরিডির গিরগিটি মস্ত বহর
পথ দেখাইয়া চলে আগে।
মহিশুরে মহিষটা খায় অড়হর—
খামকাই তেড়ে গিয়ে লাগে।

১০৫

স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে
প্রাণ পেয়ে,
মৌন হতে
ঘ্রাণ পেয়ে।
ইন্দ্রলোকের পাগ্‌লাগারদ
খুলল তারই দ্বার,
পাগল ভুবন দুর্দাড়িয়া
ছুটল চারি ধার—
দারুণ ভয়ে মানুষগুলোর
চক্ষে বারিধার;

বাঁচল আপন স্বপন হতে
খাটের তলায় স্থান পেয়ে।
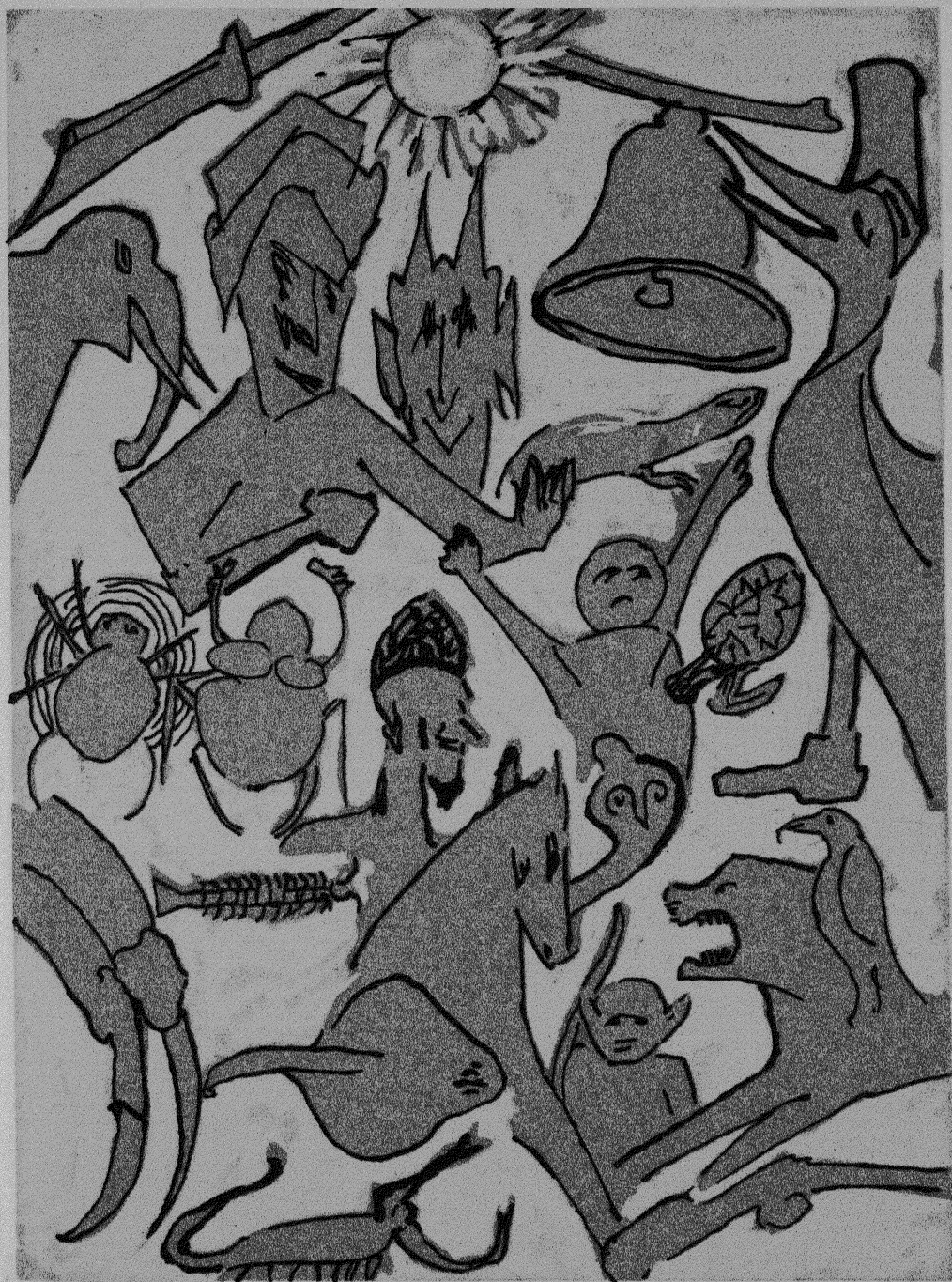
'স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে প্রাণ পেয়ে'

সংযোজন

১

মানিক কহিল, 'পিঠ পেতে দিই দাঁড়াও।
আম দুটো ঝোলে, ওর দিকে হাত বাড়াও।
উপরের ডালে সবুজে ও লালে
ভরে আছে, কষে নাড়াও।
নীচে নেমে এসে ছুরি দিয়ে শেষে
ব'সে ব'সে খোসা ছাড়াও।
যদি আসে মালী চোখে দিয়ে বালি
পার যদি তারে তাড়াও।
বাকি কাজটার মোর 'পরে ভার,
পাবে না শাঁসের সাড়াও।
আঁঠি যদি থাকে দিয়ো মালীটাকে,
মাড়াব না তার পাড়াও।
পিসিমা রাগিলে তাঁর চড়ে কিলে
বাঁদরামি-ভূত ঝাড়াও।'

২

ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন,
চড়েছেন চৌঘুরি।
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর
ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।

পথ দেখালো মাছরাঙাটায়,
দেখল এসে চিংড়িঘাটায়—
ঝুম্‌কো ফুলের বোঝাই নিয়ে
মোচার খোলা ভাসে।
খোকনবাবু বিষম খুশি
খিল্‌খিলিয়ে হাসে।

উত্তরায়ণ
৫।৯।৩৮

৩

গিন্নির কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই
'গিনি সোনা এনে দেব' কানে কানে কহ যেই।
না হলে তোমারি কানে দুর্গ্রহ টেনে আনে,
অনেক কঠিন শোনা— চুপ করে রহ যেই।

৪

ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি যত চায় শূন্যেতে ওড়াটা
কিছুতে কিছু-না-পানে পোঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
ছুটে মরে সারারাত, ছুটে মরে সারাদিন—
হয়রান হয়ে তবু আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

ট্রাম্-কন্ডাক্টার

হুইসেলে ফুঁক দিয়ে শহরের বুক দিয়ে
গাড়িটা চালায়, তার সীমা নেই জাঁকটার।
বারো-আনা ফাঁকা তার মাথাটার তেলো যে,
চিরুনির চালাচালি শেষ হয়ে এল যে।
বিধাতার নিজ হাতে ঝাঁট-দেওয়া ফাঁকটার
কিছু চুল দুপাশেতে ফুটপাত আছে পেতে,
মাঝে বড়ো রাস্তাটা বুক জুড়ে টাকটার।

মাস্টার বলে, 'তুমি দেবে ম্যাট্রিক,
এক লাফে দিতে চাও হবে না সে ঠিক।
ঘরে দাদামশায়ের দেখো example,
সত্তর বৎসরও হয় নিকো ample ।
একদা পরীক্ষায় হবে উত্তীর্ণ
যখন পাকবে চুল, হাড় হবে জীর্ণ।'

তিনকড়ি। তোল্‌পাড়িয়ে উঠল পাড়া,
তবু কর্তা দেন না সাড়া!
জাগুন শিগ্‌গির জাগুন।
কর্তা। এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কই সে বাজে—
তিনকড়ি। ঘড়ি পরে বাজবে, এখন
ঘরে লাগল আগুন।
কর্তা। অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে—

তিনকড়ি। জানলাটা ওই উঠল জ্বলে,
উর্ধ্বশ্বাসে ভাগ্ন।
কর্তা। বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা—
তিনকড়ি। জ্বলে যে ছাই হল ভিটা,
ফুটপাথে ওই বাকি ঘুমটা
শেষ করতে লাগ্ন।

৮

গাড়িতে মদের পিপে
ছিল তেরো-চোদ্দো,
এঞ্জিনে জল দিতে
দিল ভুলে মদ্য।
চাকাগুলো ধেয়ে করে
ধানখেত-ধ্বংসন,
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে
'কোথা কানু জংশন'—
ট্রেন করে মাতলামি
নেহাৎ অবোধ্য,
সাবধান করে দিতে
কবি লেখে পদ্য।

৯

রায়ঠাকুরানী অম্বিকা।
দিনে দিনে তাঁর বাড়ে বাণীটার লম্বিকা।
অবকাশ নেই তবুও তো কোনো গতিকে
নিজে ব'কে যান, কহিতে না দেন পতিকে।
নারীসমাজের তিনি তোরণের স্তম্ভিকা।
সয় নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।

১০

জর্মন প্রোফেসার দিয়েছেন গোঁফে সার কত যে!
উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে খোঁচা-খোঁচা ছাঁটা ছাঁটা—
দেখে তাঁর ছাত্রের ভয়ে গায়ে দেয় কাঁটা,
মাটির পানেতে চোখ নত যে।
বৈদিক ব্যাখ্যায় বাণী তাঁর মুখে এসে
যে নিমেষে পা বাড়ান ওষ্ঠের দ্বারদেশে
চরণকমল হয় ক্ষত যে।

১১

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।
আপিসেতে খেটে মরা তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো— এ কথায় নাই কোনো সন্দ।

১২

দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌ হেমবাবু দেয় লাফ,
মা বলেন, একি খেলা ভূতের নাচন নেচে?
নাকি সুরে বলে হেমা, ‘চলতে যে পারি নে মা,
সকালে সর্দি লেগে যেমনি উঠেছি হেঁচে
অমনি যে খচ্‌ করে পা আমার মচ্‌কেছে।’

১৩

কনে দেখা হয়ে গেছে, নাম তার চন্দনা;
তোমারে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না।
লোকে বলে, খিট্‌খিটে মেজাজটা নয় মিঠে—
দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা।
কুঁজো হোক, কালো হোক, কালাও না, অন্ধ না।

১৪

পাতালে বলিরাজার যত বলীরামরা
ভূতলেতে ঘাসিরাম আর ঘনশ্যামরা
লড়াই লাগালো বেগে; ভূমিকম্পন লেগে
চারি দিকে হাহাকার করে ওঠে গ্রামরা।
মানুষ কহিল, ‘ক্রমে খবর উঠছে জমে,
সেটা খুব মজা, তবু মরি কেন আমরা।’

১৫

মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাসে ফোটে বেলফুল।
হঠাৎ আনাড়ি কবি তুলি হাতে আঁকে ছবি,
অকারণে কাঁচা কাজে পেকে যায় চুল।

১৬

পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন,
রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন।
কাগজ হয়েছে সাদা; সংশোধনের বাধা
ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন—
কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন।

১৭

বলিয়াছিনু মামারে—
তোমারি ওই চেহারাখানি কেন গো দিলে আমারে।
তখনো আমি জন্মি নি তো, নেহাৎ ছিনু অপরিচিত,
আগেভাগেই শাস্তি এমন, এ কথা মনে ঘা মারে।
হাড় ক-খানা চামড়া দিয়ে ঢেকেছে যেন চামারে।

১৮

কাঁধে মই, বলে 'কই ভুঁইচাঁপা গাছ',
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ,
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা—
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা।

১৯

শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে।
নাকটা হেসে বলে, 'হায় রে যাই ম'রে।'
নাকের মতে, গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।

২০

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি।
প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো—
অক্সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

২১

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্‌,
তক্‌রার হলে আর নাই মিট্‌মাট্‌।
চশমায় চম্‌কায়, আড়ে চায় চোখ—
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

ছড়ার ছবি

ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উলটো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউয়ের রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা—শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই-সব ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার-চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমাকে

জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া,
যদুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুরবেলার খাওয়া;
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
একপহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন,
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে করব রাত্রিযাপন।
তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব আকাশের দিকে
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর পথের ওই পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।
উসুখুসু করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।
বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকালবেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
হেলেদুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।
আমারও পথ হাঁসের যে-পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্‌দুরে।
গিয়ে ভজনঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব শজনেডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুলতলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।

মাথনাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকা-দিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধারতলায় কোথায় হবে লীন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভজহরি

হংকঙেতে সারাবছর আপিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা,
দিয়েছিলেন মাকে,
ঢাকার নীচে যখন-তখন শিস দিয়ে সে ডাকে।
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা,
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ঝাপট দিত পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান,
অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দৈত্য,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরাত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।"

একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
"গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।"
শুনে আমার লাগল ভারি মজা,
এই আমাদের ভজা,
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
শুধাই তাকে, "বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে?"
ভজু বললে, "খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে।
কেউ বা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন-চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।
মোটা মোটা ফড়িঙ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারো রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা,
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।

পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম,
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।
আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে,
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।”

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিস্‌নি

কিশোর-গাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি,
পিস্‌নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।
একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো,
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হল।
আর-কোনো ঠাঁই হয়তো পাবে আর-কোনো এক বাসা,
মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকে অসম্ভবের আশা।
অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি,
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।
তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে,
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধুলির তলে।
শুধাই যবে কোন্‌ দেশেতে যাবে,
মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে—
কয় সে দ্বিধায়, “কী জানি ভাই, হয়তো আলম্‌ডাঙা,
হয়তো সান্‌কিভাঙা,
কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী।”
গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি,
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে।
গভীর নিশ্বাস ফেলে
চুপটি ক’রে ভাবে
এমন করে আর কতদিন যাবে।
দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্ঝাটে
তাদের বেলা কাটে।
তারা এখন আর কি মনে রাখে
এতবড়ো অদরকারি তাকে।
চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপসা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।

স্টেশন-মুখে গেল চলে পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে।

আলমোড়া
[২০?] জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
[৩? জুন ১৯৩৭]

কাঠের সিঙ্গি

ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়,
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।
গলায় বাঁধা রাঙা ফিতের দড়ি,
চিনেমাটির ব্যাঙ বেড়াত পিঠের উপর চড়ি।
ব্যাঙটা যখন পড়ে যেত ধম্‌কে দিতেম কষে,
কাঠের সিঙ্গি ভয়ে পড়ত বসে।
গাঁ গাঁ করে উঠছে বুঝি, যেমনি হত মনে,
'চুপ করো'—যেই ধম্‌কানো, আর চম্‌কাত সেইখানে।
আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো
সম্ভাবনা ছিল না কখ্‌খোনো।
মাংস ব'লে মাটির ঢেলা দিতেম ভাঁড়ের 'পরে,
আপত্তি ও করত না তার তরে।
বুঝিয়ে দিতেম, গোপাল যেমন সুবোধ সবার চেয়ে
তেমনি সুবোধ হওয়া তো চাই যা দেব তাই খেয়ে।
ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।
খুঁদি কইত মিছিমিছি, "ভয় করছে, দাদা,"
আমি বলতেম, "আমি আছি, থামাও তোমার কাঁদা—
যদি তোমায় খেয়েই ফেলে এমনি দেব মার
দু চক্ষে ও দেখবে অন্ধকার।"
মেজ্‌দিদি আর ছোড়্‌দিদিদের খেলা পুতুল নিয়ে
কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।
নেমন্তন্ন করত যখন যেতুম বটে খেতে,
কিন্তু তাদের খেলার পানে চাই নি কটাক্ষেতে।
পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,
এমন খেলার সাহস বলো ক-জন মেয়ের আছে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঝড়

দেখ্‌ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ওই করে ধড়্‌ফড়্‌।
আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি,
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্‌ রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।
বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চমকে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ওই রে মাঝি, খেপল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্‌।
সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচখির বাস,
হেথা-হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে সেলাই করে পাল।
রাত কাটাব ওইখানেতেই করব রাঁধাবাড়া,
এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাকতেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইঁটেখোলার মেলায় দেব সকাল সকাল পাড়ি।

আলমোড়া
১২।৬।৩৭
[২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে,
আপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক বসে আপন-মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।

আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌নড়ে এক তক্তপোশের ’পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই-করা কাঁথা।
নাতনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেমনি কচি গলায় ওকে ‘দাদু’ ব’লেই ডাকে।
ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।
বাইরে দারিদ্র্যের
কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি,
প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে;
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ওই বছরের শেষে;
শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে।
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক’রে নেইকো এমন বাক্।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক’রে পায় না ভেবে শেষে।

খাটুনিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাবনাগুলো ধোঁয়ায় মেলায়, ধোঁয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিস দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে,
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় খেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ ব’লেই তাহা জানে না ওর মন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে;
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারি পাশে।

নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটীর আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপসা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগ্‌নি রঙের রেখা।
যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।
শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, শেষ হল জল-ঢালা,
আকাশতলে শুরু হল শুভ্র আলোর পালা।
খেতের পরে খেত একাকার প্লাবনে রয় ডুবে,
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার মুখে নৌকোখানি বেয়ে
যায় কারা ওই, শুধাই, 'ওগো নেয়ে,
চলেছ কোন্‌খানে।'
যেতে যেতে জবাব দিল, 'যাব গাঁয়ের পানে।'
অচিন শূন্যে ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন জনের ভিড়।
অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে,
ওই অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।

দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।
সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।

আলমোড়া
২৮।৫।৩৭
[১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

যোগীনদা

যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।

'জুলুম তোদের সইব না আর', হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী,
ডেকে বলতেন, 'কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোঁকি।'
'ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া,'
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চার দিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী,
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি।
কেউ বা লজঞ্জুস,
সেটা ছিল মজলিসে তাঁর হাজরি দেবার ঘুষ।
কাজলি যদি অকারণে করত অভিমান,
হেসে বলতেন 'হাঁ করো তো', দিতেন ছাঁচি পান।
আপনসৃষ্ট নাৎনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি,
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়া-খয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও,
মায়ের হাতের জারকলেবু যোগীনদাদার প্রিয়।

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর-ভাঁজা দেহ,
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে বুঝত না তা কেহ।
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখদুটি জ্বল্‌জ্বলে,
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয় নি সে থল্‌থলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফ-জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি,
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্তশিষ্ট হয়ে,
কাঁসর-ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেকট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আঁধার বাড়ত ক্রমে,
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।
শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক,
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হত উল্‌টো পাল্‌টা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।

হুশিয়ারপুর পেরিয়ে গেল ছন্দোসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সরহরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার

বুলন্দশর আম্লোরিসর্সার।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায়-ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটরভাজা
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি,
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।
মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ,
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে।'
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।

ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য ক'রে বিয়ে,
নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল, খুঁজে না পায় লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায়, যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়,
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে,
গুলজারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে এল সরাই আলমগিরে,
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে।

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর,
জোড় হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর।'
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জম্‌কালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনাল সন্দেহ,
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়,
ওরে বাস রে, দেখে নি সে আর কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে,
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা,
কেমন করে কী যে হল লাগল বিষম ধাঁধা।

গুর্খা ফৌজ সেলাম করে দাঁড়াল চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে,
দেয় কারা সব জয়ধ্বনি উর্‌দুতে ফার্সিতে।
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছমন্‌-ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ূরপঙ্খি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিন্ডাতে দাঁড় করিয়ে জোরালো দূরবীনে
দখিন মুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বৎ।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্‌দুরে।

এইখানেতেই শেষে
যোগীনদাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে।
হেসে বললেন, 'কী আর বলব দাদা,
মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।'
'ও হবে না, ও হবে না' বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল, 'শেষ করতেই হবে।'
যোগীনদা কয়, 'যাক গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না-যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি ভাই যে-সে লোকের কর্ম।
মোটা মোটা পরোটা আর তিন পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের-হাওয়ায়-মানুষ সইতে পারে কি।
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা,
এগুলি কি সহ্য করা সোজা।
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।
যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা,
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু গুজব শুনতে পেলেম শেষে
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।'

'কেন তুমি ফিরে এলে,' চেঁচাই চারি পাশে,
যোগীনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম, আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে,
যোগীনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বুধু

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যাবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে।
ওইখানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু,
ঢিবির 'পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বুধু।
সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা,
শুকনো জমি, নেইকো ঘাসের ঘটা।
কী যে ওরা পাচ্ছে খেতে ওরাই সেটা জানে,
ছাগল ব'লেই বেঁচে আছে প্রাণে।
আকাশে আজ হিমের আভাস, ফ্যাকাশে তার নীল,
অনেক দূরে যাচ্ছে উড়ে চিল।
হেমন্তের এই রোদ্দুরটা লাগছে অতি মিঠে,
ছোটো নাতি মোগ্লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।
স্পর্শপুলক লাগছে দেহে, মনে লাগছে ভয়
বেঁচে থাকলে হয়।
দুটি তিনটি মরে শেষে ওইটি সাধের নাতি,
রাত্রিদিনের সাথী।
গোরুর গাড়ির ব্যাবসা বুধুর চলছে হেসে-খেলেই,
নাড়ী ছেঁড়ে এক পয়সা খরচ করতে গেলেই।
কৃপণ ব'লে গ্রামে গ্রামে বুধুর নিন্দে রটে,
সকালে কেউ নাম করে না উপোস পাছে ঘটে।
ওর যে কৃপণতা সে তো ঢেলে দেবার তরে,
যত কিছু জমাচ্ছে, সব মোগ্লু নাতির 'পরে।
পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ওই,
এক পয়সা আর কারো নয় ওই ছেলেটার বৈ।
না খেয়ে না প'রে নিজের শোষণ ক'রে প্রাণ
যেটুকু রয় সেইটুকু ওর প্রতি দিনের দান।

দেব্‌তা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্‌লুকে,
আঁকড়ে রাখে বুকে।
এখনো তাই নাম দেয় নি, ডাক নামেতেই ডাকে,
নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিষ্ঠুর দেব্‌তাকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

চড়িভাতি

ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে;
অফুরন্ত আতিথ্যে তার সকালে বৈকালে
বনভোজনে পাখিরা সব আসছে ঝাঁকে ঝাঁক।
মাঠের ধারে আমার ছিল চড়িভাতির ডাক।
যে যার আপন ভাঁড়ার থেকে যা পেল যেইখানে
মালমসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে।
জাত-বেজাতের চালে ডালে মিশোল ক'রে শেষে
ডুমুরগাছের তলাটাতে মিলল সবাই এসে।
বারে বারে ঘটি ভ'রে জল তুলে কেউ আনে,
কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আমবাগানের পানে।
হাঁসের ডিমের সন্ধানে কেউ গেল গাঁয়ের মাঝে,
তিন কন্যা লেগে গেল রান্না করার কাজে।
গাঠি-পাকানো শিকড়েতে মাথাটা তার থুয়ে
কেউ পড়ে যায় গল্পের বই জামের তলায় শুয়ে।
সকল কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি খোলা
চলে যাচ্ছে আপনি ভেসে সে কোন্‌ আঘাটায়
যথেচ্ছ ভাটায়।
মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই,
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেইদিনকার আল্‌গা-বিধির বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজও লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।
কারো কোনো স্বত্বদাবির নেই যেখানে চিহ্ন,
যেখানে এই ধরাতলের সহজ দাক্ষিণ্য,
হালকা সাদা মেঘের নীচে পুরানো সেই ঘাসে,
একটা দিনের পরিচিত আমবাগানের পাশে,
মাঠের ধারে, অনভ্যাসের সেবার কাজে খেটে
কেমন ক'রে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে।

সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু দুটি,
আশে পাশে এ'টোর লোভে কাক এল সব জুটি,
গাঁয়ের থেকে কুকুর এল, লড়াই গেল বেধে,
একটা তাদের পালাল তার পরাভবের খেদে।

রৌদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়ল বে'কে,
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলেছে হাট থেকে।
আবার ধীরে ধীরে
নিয়ম-বাঁধা যে-যার ঘরে চলে গেলেম ফিরে।
একটা দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,
পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি।

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

কাশী

কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে,
পষ্ট মনে আছে।
আমরা তখন ছিলাম না কেউ, বয়েস তাঁহার সবে
বছর-আষ্টেক হবে।
সঙ্গে ছিলেন খুড়ি,
মোরব্বা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি।
দাদা বলেন, আমলকী বেল পে'পে সে তো আছেই,
এমন কোনো ফল ছিল না এমন কোনো গাছেই
তাঁর হাতে রস জমলে লোকের গোল না ঠেকত, এটাই
ফল হবে কি মেঠাই।
রসিয়ে নিয়ে চালতা যদি মুখে দিতেন গু'জি
মনে হত বড়োরকম রসগোল্লাই বুঝি।
কাঁঠাল বিচির মোরব্বা যা বানিয়ে দিতেন তিনি
পিঠে ব'লে পৌষমাসে সবাই নিত কিনি।
দাদা বলেন, মোরব্বাটা হয়তো মিছেমিছিই,
কিন্তু মুখে দিতে যদি, বলতে কাঁঠাল বিচিই।
মোরব্বাতে ব্যাবসা গেল জ'মে,
বেশ কিঞ্চিৎ টাকা জমল ক্রমে।
একদিন এক চোর এসেছে তখন অনেক রাত,
জানলা দিয়ে সাবধানে সে বাড়িয়ে দিল হাত।
খুড়ি তখন চাটনি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে,
ধড়াস করে চোরের হাতে জানলা দিলেন চেপে।
চোর বললে, উহু উহু, খুড়ি বললেন, আহা,
বাঁ হাত মাত্র, এইখানেতেই থেকে যাক-না তাহা।
কে'দে-কেটে কোনোমতে চোর তো পেল খালাস,
খুড়ি বললেন, মরবি, যদি এ ব্যাবসা তোর চালাস।

দাদা বললেন, চোর পালাল, এখন গল্প থামাই,
ছ'দিন হয় নি ক্ষৌর করা, এবার গিয়ে কামাই।
আমরা টেনে বসাই, বলি, গল্প কেন ছাড়বে,
দাদা বলেন, রবার নাকি, টানলেই কি বাড়বে।
কে ফেরাতে পারে তোদের আবদারের এই জোর,
তার চেয়ে যে অনেক সহজ ফেরানো সেই চোর।
আচ্ছা তবে শোন্, সে মাসে গ্রহণ লাগল চাঁদে,
শহর যেন ঘিরল নিবিড় মানুষ-বোনা ফাঁদে।
খুড়ি গেছেন স্নান করতে বাড়ির দ্বারের পাশে,
আমার তখন পূর্ণগ্রহণ ভিড়ের রাহুগ্রাসে।
প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, মরছি যখন ডরে,
গুণ্ডা এসে তুলে নিল হঠাৎ কাঁধের 'পরে।
তখন মনে হল এ তো বিষ্ণুদূতের দয়া,
আর-একটুকু দেরি হলেই প্রাপ্ত হতেম গয়া।
বিষ্ণুদূতটা ধরল যখন যমদূতের মূর্তি
এক নিমেষেই একেবারেই ঘুচল আমার ফূর্তি।
সাত গলি সে পেরিয়ে শেষে একটা এঁধোঘরে
বসিয়ে আমায় রেখে দিল খড়ের আঁঠির 'পরে।
চোদ্দ আনা পয়সা আছে পকেট দেখি ঝেড়ে,
কেঁদে কইলাম, ও পাঁড়েজি, এই নিয়ে দাও ছেড়ে।
গুণ্ডা বলে, ওটা নেব, ওটা ভালো দ্রব্যই,
আরো নেব চারটি হাজার নয়শো নিরেনব্বই,
তার উপরে আর দু আনা, খুড়িটা তো মরবে,
টাকার বোঝা বয়ে সে কি বৈতরণী তরবে।
দেয় যদি তো দিক চুকিয়ে, নইলে— পাকিয়ে চোখ
যে ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিলে সেটা মারাত্মক।

এমন সময়, ভাগ্য ভালো, গুণ্ডাজির এক ভাগ্নি
মূর্তিটা তার রণচণ্ডী, যেন সে রায়বাঘ্নি,
আমার মরণদশার মধ্যে হলেন সমাগত
দাবানলের ঊর্ধ্বে যেন কালো মেঘের মতো।
রাত্তিরে কাল ঘরে আমার উঁকি মারল বুঝি,
যেমনি দেখা অমনি আমি রইনু চক্ষু বুজি।
পরের দিনে পাশের ঘরে, কী গলা তার বাপ,
মামার সঙ্গে ঠাণ্ডা ভাষায় নয় সে বাক্যালাপ।
বলছে, তোমার মরণ হয় না, কাহার বাছনি ও,
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরত দিয়ো,
আহা, এমন সোনার টুকরো— শুনে আগুন মামা
বিশ্রী রকম গাল দিয়ে কয়, মিহি সুরটা থামা।
এঁকেই বলে মিহি সুর কি, আমি ভাবছি শুনে।
দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বর্‌গা গুনে।

রাত্রি হবে দুপুর, ভাগ্নি ঢুকল ঘরে ধীরে,
চুপি চুপি বললে কানে, যেতে কি চাস ফিরে।
লাফিয়ে উঠে কেঁদে বললেম, যাব যাব যাব,
ভাগ্নি বললে, আমার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নাবো,
কোথায় তোমার খুড়ির বাসা অগস্ত্যকুণ্ডে কি,
যে ক'রে হোক আজকে রাতেই খুঁজে একবার দেখি;
কালকে মামার হাতে আমার হবেই মুণ্ডপাত।
আমি তো ভাই বেঁচে গেলেম, ফুরিয়ে গেল রাত।

হেসে বললেম, যোগীনদাদার গম্ভীর মুখ দেখে,
ঠিক এমনি গল্প, বাবা শুনিয়েছে বই থেকে।
দাদা বললেন, বিধি যদি চুরি করেন নিজে
পরের গল্প, জানি নে ভাই, আমি করব কী যে।

আলমোড়া
১০।৬।৩৭
[২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

প্রবাসে

বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা,
গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাতাস সর্বদা দেয় ঠেলা।
তাই তো সেদিন ছুটির দিনে টাইমটেবিল প'ড়ে
প্রাণটা উঠল নড়ে।
বাক্সো নিলেম ভর্তি করে, নিলেম ঝুলি থলে,
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ-খেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি গম-জোয়ারির খেতে
নবীন অঙ্কুরেতে
বাতাস কখন হঠাৎ এসে সোহাগ করে যায়
হাত বুলিয়ে কাঁচা শ্যামল কোমল কচি গায়।
আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখানা
শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর, জোড়া-বলদটানা।
আঁকাবাঁকা কল্‌কলানি করুণ জলের ধারায়—
চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভারে ভারায়।
ইঁদারাটার কাছে
বেগ্‌নি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
গ্রামটি দেখা যায়।
খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে
মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আম-কাঁঠালের ছায়ে।

গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে;
ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে
গম্ভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি
এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি।
বিকেল বেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে
খোলা দ্বারের পাশে
দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে
আপন-মনে অকারণে বাহির-পানে চেয়ে।
অশথতলায় বসে তাকাই ধেনুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।
মনে হত, চতুর্দিকে হিন্দি ভাষায় গাঁথা
একটা যেন সজীব পুঁথি, উল্‌টিয়ে যাই পাতা—
কিছু বা তার ছবি-আঁকা কিছু বা তার লেখা,
কিছু বা তার আগেই যেন ছিল কখন্‌ শেখা।
ছন্দে তাহার রস পেয়েছি, আউড়িয়ে যায় মন,
সকল কথার অর্থ বোঝার নাইকো প্রয়োজন।

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

পদ্মায়

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
জানি নে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্‌ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হাল্‌কা তুলির রেখা।
বালির 'পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,
তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল
ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে;
অলস দিনের উড়্‌নিখানার পরশ আকাশ হতে
বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে।
তারই মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে
দূর কোকিলের সুর,
মধুর হত আশ্বিনে রোদ্দুর।
পাশ দিয়ে সব নৌকো বড়ো বড়ো
পরদেশিয়া নানা খেতের ফসল ক'রে জড়ো
পশ্চিমে হাট-বাজার হতে, জানি নে তার নাম,
পেরিয়ে আসত ধীর গমনে গ্রামের পরে গ্রাম
ঝপ্‌ঝপিয়ে দাঁড়ে।
খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ি ছায়ানিবিড় পাড়ে।

যখন হত দিনের অবসান
গ্রামের ঘাটে বাজিয়ে মাদল গাইত হোলির গান।
ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে,
একটি কেবল দ্বীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে।
শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ;
স্বপ্নে যেন ব'কে উঠত রজনী নিস্তব্ধ।
পুবে হাওয়ার এল ঋতু, আকাশ-জোড়া মেঘ;
ঘরমুখো ওই নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।
ইলিশমাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনাবেচার ভিড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।
ডিঙি বেয়ে পাটের আঁঠি আনছে ভারে ভারে,
মহাজনের দাঁড়িপাল্লা উঠল নদীর ধারে।
হাতে পয়সা এল, চাষী ভাব্‌না নাহি মানে,
কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘর-পানে।
পরদেশিয়া নৌকোগুলোর এল ফেরার দিন,
নিল ভরে খালি-করা কেরোসিনের টিন;
একটা পালের 'পরে ছোটো আরেকটা পাল তুলে
চলার বিপুল গর্বে তরীর বুক উঠেছে ফুলে।
মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, থেমেছে দাঁড় বাওয়া,
ছুটছে ঘোলা জলের ধারা, বইছে বাদল হাওয়া।

শান্তিনিকেতন
৬।৬।১৯৩৭
[২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা; হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং-'পরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপ্সিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—

মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভর্তি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাব্‌না মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং,
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হাল্‌কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাব্‌নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

দেশান্তরী

প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে,
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে।
দূর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে,
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে
দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্যজয়ে,
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।
স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে,
আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে।
ছেলে গেছে জাম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি,
মা তারে আজ ভুলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি।
স্ত্রী বলেছে বারে বারে, যে ক'রে হোক খেটে
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে।
ঘর ছাইতে খড়ের আঁঠির জোগান দেবে সে যে,
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে।
মাঠের থেকে খড়্‌কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,
ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে।
ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,
খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।

দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে
কোনোমতেই ভাবনা যেন না রয় স্বামীর মনে।
সময় হল, ওই তো এল খেয়াঘাটের মাঝি,
দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি।
সেইখানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি,
মহেশখুড়োর মেঝো জামাই, নিতাই দাসের নাতি।
নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে
পৌঁছবে পাঁচদিনের পরে শহর কোনোমতে।
সেইখানে কোন্ হালসিবাগান, ওদের গ্রামের কালো,
সর্ষেতেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে খুব ভালো।
গেলে সেথায় কালুর খবর সবাই বলে দেবে—
তার পরে সব সহজ হবে, কী হবে আর ভেবে।
স্ত্রী বললে, কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো,
ওদের গাঁয়ের বাদল পালের জাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্রিশে বৈশাখে।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

অচলা বুড়ি

অচলবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতিমধুর জরা।
ফুলো ফুলো দুই চোখে তার, দুই গালে আর ঠোঁটে
উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।
পরিপুষ্ট অঙ্গটি তার, হাতের গড়ন মোটা,
কপালে দুই ভুরুর মাঝে উল্‌কি-আঁকা ফোঁটা।
গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে,
সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে।
খোঁড়া কুকুর সেই ছিল তার নিত্যসহচর;
আধপাগলি ঝি ছিল এক, বাড়ি বালেশ্বর।
দাদাঠাকুর বলত, বুড়ি, জমল কত টাকা,
সঙ্গে ওটা যাবে না তো, বাক্সে রইল ঢাকা,
ব্রাহ্মণে দান করতে না চাও নাহয় দাও-না ধার,
জানোই তো এই অসময়ে টাকার কী দরকার।
বুড়ি হেসে বলে, ঠাকুর, দরকার তো আছেই,
সেইজন্যে ধার না দিয়ে রাখি টাকা কাছেই।

সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবা এক মেয়ে,
এককালে সে সুখে ছিল বাপের আদর পেয়ে।
বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাঁই,
দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই।

শেষকালে সে ক্ষুধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে
চলে গেল হাঁসপাতালে রোগীসেবার কাজে।
এর পিছনে বুড়ি ছিল, আর ছিল লোক তার
কংসারি শীল বেনের ছেলে মুকুন্দ মোক্তার।
গ্রামের লোকে ছি-ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে,
একলা কেবল অচল বুড়ি আদর করে ডাকে।
সে বলে, তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।

জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক,
রাই ডোম্‌নির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক,
পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা
বললে ওকে যে ক'রে হোক দিতেই হবে সাজা।
মিশনরির স্কুলে প'ড়ে, কম্পোজিটরের
কাজ শিখে সে শহরেতে আয় করেছে ঢের—
তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড়-বাঁকানো চাল।
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল,
ডাক-লুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে।
ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি
ডোম্‌নি গেল ভিন গাঁয়েতে পাততে নতুন বাড়ি।
প্রতি মাসে অচল বুড়ি দামোদরের পারে
মাসকাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে।
যখন তাকে খোঁটা দিল গ্রামের শম্ভু পিসে
রাই ডোম্‌নির 'পরে তোমার এত দরদ কিসে;
বুড়ি বললে, যারা ওকে দিল দুঃখরাশি
তাদের পাপের বোঝা আমি হাল্‌কা করে আসি।

পাতানো এক নাৎনি বুড়ির একজ্বরি জ্বরে
ভুগতেছিল স্বরূপগঞ্জে আপন শ্বশুরঘরে।
মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলল দিন রাত্রি জেগে,
ফিরে এসে আপনি পড়ল রোগের ধাক্কা লেগে।
দিন ফুরল, দেব্‌তা শেষে ডেকে নিল তাকে,
এক আঘাতে মারল যেন সকল পল্লীটাকে।
অবাক হল দাদাঠাকুর, অবাক স্বরূপকাকা,
ডোম্‌নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।
জিনিসপত্র আর যা ছিল দিল পাগল ঝিকে,
স'পে দিল তারই হাতে খোঁড়া কুকুরটিকে।
ঠাকুর বললে মাথা নেড়ে, অপাত্রে এই দান
পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান।

শান্তিনিকেতন
[আষাঢ়] ১৩৪৪

সুধিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম,
গোয়ালবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোরু-চরার প্রকাণ্ড খেত, নদীর ওপার চরে,
কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি জমির 'পরে।
জেগে উঠত চারা তারই, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হত বিশ-পঞ্চাশ চালা,
জমত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,
গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

বছর তিনেক অনাবৃষ্টি, এল মন্বন্তর;
শ্রাবণ মাসে শোণনদীতে বান এল তার পর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শূন্য-পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর, টান লাগল গাছে;
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।
বন্যা যখন নেমে গেল, বৃষ্টি গেল থামি,
আকাশ জুড়ে দৈত্যো-দেবের ঘুচল সে পাগলামি।
শিউনন্দন দাঁড়াল তার শূন্য ভিটেয় এসে,
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি,
মনে হল সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।
ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে;
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন করে ফিরে ফিরে, তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে, দু হাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ,
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক;
বলে উঠল, দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি।
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজও রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক-নাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।
এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে,
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।

ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনোকালে।

এদিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনা-পাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
মাল তদন্ত করতে এল দুনিয়াচাঁদ বেনে,
দশবছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে—ওই সুধিয়া গাই
পুষবে ঘরে আপন ক'রে ওইটে নেহাত চাই।
সামরু বলে, তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই সুধিয়াকে কিনে নেবার মতো।
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ওই ধন,
আর যা আমার যায় সবই যাক, দুঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকে ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে।
বাপের কানে কী বললে সেই দুনিচাঁদের ছেলে,
জেদ বেড়ে তার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে।
শেঠজি বলে মাথা নেড়ে, দুই-চারি মাস যেতেই
ওই সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।

কালোয় সাদায় মিশোল বরন, চিকন নধর দেহ,
সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ।
আকাল এখন, সামরু নিজে দুইবেলা আধ-পেটা,
সুধিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনি পায় যেটা।
দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে
ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে।
কারো 'পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে
গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে।
সুধিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া ক'রে,
বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামরু যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেশা
ইচ্ছা করেছিল নিতে, ওই ছিল তার নেশা।
খবর পেল নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল
পাল্লা দেবে—সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।
বাপকে ব'লে গেল ছেলে, কথা দিচ্ছি শোনো,
এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্‌খোনো।
ফিরে এসে দেখতে পেলে সুধিয়া তার গাই
শেঠ নিয়েছে ছলে-বলে, গোয়ালঘরে নাই।

যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে,
দুনিচাঁদের গদি যেথায় নাজির-মহল্লাতে।
কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী, শেঠজি শুধায় তাকে।
সামরু বলে, ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে।
শেঠ বললে, পাগল নাকি, ফিরিয়ে দেব তোরে,
পরশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।
সুধিয়া রে সুধিয়া রে সামরু দিল হাঁক,
পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।
চেনা সুরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,
দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ওই হঠাৎ এল ছুটে।
দু চোখ বেয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা,
অন্নপানে দেয় নি সে মুখ, অনশনে-ভোগা।
সামরু ধরল জড়িয়ে গলা, বললে, নাই রে ভয়,
আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।
তোমার টাকায় দুনিয়া কেনা, শেঠ দুনিচাঁদ, তবু
এই সুধিয়া একলা নিজের, আর কারো নয় কভু।
আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে
তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।
চোখ পাকিয়ে কয় দুনিচাঁদ, পশুর আবার ইচ্ছে,
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে।
গোল কর তো ডাকব পুলিস। সামরু বললে, ডেকো,
ফাঁসি আমি ভয় করি নে, এইটে মনে রেখো।
দশবছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর,
সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

মাধো

রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ,
সোনারুপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত।
আপন বিদ্যা শিখিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে
এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে;
বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে
লাগিয়ে দিত যখন তখন, আবার মাঝে মাঝে
ছোটো মেয়ের পুতুল-খেলার গয়না গড়াবার
ফরমাশেতে খাটিয়ে নিত, আগুন ধরাবার
সোনা গলাবার কর্মে একটুখানি ভুলে
চড়-চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।
সুযোগ পেলেই পালিয়ে বেড়ায় মাধো যে কোন্‌খানে
ঘরের লোকে খুঁজে ফেরে বৃথাই সন্ধানে।

শহরতলির বাইরে আছে দিঘি সাবেককেলে
সেইখানে সে জোটায় যত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
গুলিডাণ্ডা খেলা ছিল, দোলনা ছিল গাছে,
জানা ছিল যেথায় যত ফলের বাগান আছে।
মাছ ধরবার ছিপ বানাত, সিসুডালের ছড়ি,
টাট্টুঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাত দড়্‌বড়ি।
কুকুরটা তার সঙ্গে থাকত, নাম ছিল তার বটু,
গিরগিটি আর কাঠবেড়ালি তাড়িয়ে ফেরায় পটু।
শালিখ পাখির মহলেতে মাধোর ছিল যশ,
ছাতুর গুলি ছড়িয়ে দিয়ে করত তাদের বশ।
বেগার দেওয়ার কাজে পাড়ায় ছিল না তার মতো,
বাপের শিক্ষানবিশিতেই কুঁড়েমি তার যত।

কিষনলালের ছেলে, তারে দুলাল ব'লে ডাকে,
পাড়াসুদ্ধ ভয় করে এই বাঁদর ছেলেটাকে।
বড়োলোকের ছেলে ব'লে গুমর ছিল মনে,
অত্যাচারে তারই প্রমাণ দিত সকল খনে।
বটুর হবে সাঁতারখেলা, বটু চলছে ঘাটে,
এসেছে যেই দুলালচাঁদের গোলা খেলার মাঠে
অকারণে চাবুক নিয়ে দুলাল এল তেড়ে,
মাধো বললে, মারলে কুকুর ফেলব তোমায় পেড়ে।
উঁচিয়ে চাবুক দুলাল এল, মানল নাকো মানা,
চাবুক কেড়ে নিয়ে মাধো করলে দু-তিনখানা।
দাঁড়িয়ে রইল মাধো, রাগে কাঁপছে থরোথরো,
বললে, দেখব সাধ্য তোমার, কী করবে তা করো।
দুলাল ছিল বিষম ভীতু, বেগ শুধু তার পায়ে,
নামের জোরেই জোর ছিল তার, জোর ছিল না গায়ে।

দশ-বিশ-জন লোক লাগিয়ে বাপ আনলে ধরে,
মাধোকে এক খাটের খুরোয় বাঁধল কষে জোরে।
বললে, জানিস নেকো বেটা, কাহার অন্ন ধারিস,
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস।
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে,
দুলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।

মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ।
দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।
মাকে শুধায়, এ কী কাণ্ড, মা শুনে কয়, নিজে
আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে।

মাধো চাইল চলে যেতে, আমি বললেম, যেয়ো,
এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।
স্বামীর 'পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞার,
বললে, তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।

পেরোল বিশ-পঁচিশ বছর; বাংলাদেশে গিয়ে
আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে।
ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী,
কোন্‌খানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।
এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক,
বললে, মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।
মাধো বললে, মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।

শেষ পালাতে পুলিস নামল, চলল গুঁতোগাঁতা,
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
মাধো বললে, সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।
চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে,
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।

শ্রাবণ ১৩৪৪

আতার বিচি

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল
দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।
বারান্দাটার পূর্ব ধারে টেবিল ছিল পাতা,
সেইখানেতে পড়া চলত; পুঁথিপত্র খাতা
রোজ সকালে উঠত জমে দুর্ভাবনার মতো;
পড়া দিতেন, পড়া নিতেন মাস্টার মন্মথ।
পড়তে পড়তে বারে বারে চোখ যেত ওই দিকে,
গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব ঠিকে।

অধৈর্য অসহ্য হত, খবর কে তার জানে
কেন আমার যাওয়া-আসা ওই কোণটার পানে।
দুমাস গেল, মনে আছে সেদিন শুক্রবার,
অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার।
অঙ্ক-কষার বারান্দাতে চুন-সুরকির কোণে
অপূর্ব সে দেখা দিল, নাচ লাগালো মনে।
আমি তাকে নাম দিয়েছি আতা গাছের খুকু,
ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কতটুকু।
দুদিন বাদেই শুকিয়ে যেত সময় হলে তার,
এ জায়গাতে স্থান নাহি ওর করত আবিষ্কার;
কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড,
আমার পড়ার ত্রুটির জন্যে দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।
দাদা বললেন, কী পাগলামি, শান-বাঁধানো মেঝে,
হেথায় আতার বীজ লাগানো ঘোর বোকামি এ যে।
আমি ভাবলুম সারা দিনটা বুকের ব্যথা নিয়ে,
বড়োদের এই জোর খাটানো অন্যায় নয় কি এ।
মূর্খ আমি ছেলেমানুষ, সত্য কথাই সে তো,
একটু সবুর করলেই তা আপনি ধরা যেত।

শ্রাবণ ১৩৪৪

মাকাল

গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল সেই যে-বছর আকাল।
গুরুমশায় বলেন তারে,
বুদ্ধি যে নেই একেবারে;
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছমাস ধরে নাকাল।
রেগেমেগে বলেন, বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল।

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু;
তার পর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি
সবাই তাকে শুধায়, এ কী,
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরুদুরু।

কোলের 'পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে কানে,
গুরুমশায় গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে!
রাখাল বলে, কখ্খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা,

সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে;
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো ওইখানে।

টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুরপাড়ের কাছে,
বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে।
বললে, দাদা সত্যি বোলো,
সোনার চেয়ে মন্দ হল?
তুমি শেষে বলতে কি চাও, গাল ফলেছে গাছে।
মাকাল আমি ব'লে রাখাল দু হাত তুলে নাচে।

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায়,
লেখাপড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায়।
খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু—মাকালচন্দ্র রায়।

৮ ডিসেম্বর ১৯৩১
[২২ অগ্রহায়ণ ১৯৩৮]

পাথরপিণ্ড

সাগরতীরে পাথরপিণ্ড ঢুঁ মারতে চায় কাকে,
বুঝি আকাশটাকে।
শান্ত আকাশ দেয় না কোনো জবাব,
পাথরটা রয় উঁচিয়ে মাথা, এমনি সে তার স্বভাব।
হাতের কাছেই আছে সমুদ্রটা,
অহংকারে তারই সঙ্গে লাগত যদি ওটা,
এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে
হুড়মুড়িয়ে ভেঙেচুরে পড়ত অগাধ জলে।
ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গিখানা কোটি বছর থেকে
ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ওই এঁকে।
পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি,
শুনি তাহা, কতক বুঝি, নাইবা কতক বুঝি।

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারাল তার ছুটোছুটি, হারাল তার তাপ।

দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জমে।
আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
সম্মুখে কোন্ নিঠুর শূন্যতায়।
স্তম্ভিত চীৎকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক,
যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠহারার ডাক।
আগুন ছিল পাখায় যাহার আজ মাটি-পিঞ্জরে
কান পেতে সে আছে ঢেউয়ের তরল কলস্বরে।
শোনার লাগি ব্যগ্র তাহার ব্যর্থ বধিরতা
হেরে-যাওয়া সে যৌবনের ভুলে-যাওয়া কথা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

তালগাছ

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গম্ভীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
পরিতৃপ্ত মূর্তিটি তার তৃপ্ত চিকন পাতায়,
দুপুরবেলায় একটুখানি হাওয়া লাগছে মাথায়।
মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছায়া, আঁচলখানি পাতে।
গোরু চরে রৌদ্রছায়ায় সারা প্রহর ধরে,
খাবার মতো ঘাস বেশি নেই, আরাম শুধুই চ'রে।
পেরিয়ে বেড়া ওই যে তালের গাছ,
নীল গগনে ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে পাতার নাচ।
আশেপাশে তাকায় না সে, দূরে-চাওয়ার ভঙ্গি,
এমনিতরো ভাবটা যেন নয় সে মাটির সঙ্গী।
ছায়াতে না মেলায় ছায়া বসন্ত-উৎসবে,
বায়না না দেয় পাখির গানের বনের গীতরবে।
তারার পানে তাকিয়ে কেবল কাটায় রাত্রিবেলা,
জোনাকিদের 'পরে যে তার গভীর অবহেলা।
উলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহে সামান্য সম্বলে
তার যেন ঠাঁই ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীদের দলে।

আলমোড়া
১৩।৬।৩৭
[৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

শনির দশা

আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর
নয় চেনা,
একলা বসে ভাবছে, কিংবা
ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝো মেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে
মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে।
উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন,
জিদ ধরেছে, হোক-না যেমন ক'রেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই।
আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে।
বাবু বললে, হয় কখনো তা কি,
মাসকাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি,
সাহেব শুনলে আগুন হবে চটে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।
মেয়ের দুঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।
সুবুদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি,
আসন্ন পেনসনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।
নিজেকে সে বললে, ওরে, এবার নাহয় কিনিস
ছোটো ছেলের মনের মতো একটা-কোনো জিনিস।
যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুশি হয়তো হবে উমি।
কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রুপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলই মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার-ভাটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম্‌টেবিলখানা,
কদিন থেকে ইস্‌টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল।
চিন্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।

কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উস্‌খুসিয়ে একটুখানি কেশে,
শুধাই তারে ব'সে তাহার কাছে,
কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।
বললে বুড়ো, কিচ্ছুই নয় মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়,
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি।
আমি বললেম, কাজ কী।
রাগে বুড়োর গরম হল মাথা,
বললে, থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা,
কেনার সময় রইবে না আর আজিকার এই দিন বৈ,
কিনব আমি, কিনব আমি, যে ক'রে হোক কিনবই।

আলমোড়া
৪।৬।৩৭
[২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধানো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ-যে নেই তারই শব্দ বাজে
ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে সারা দুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্‌বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে,
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।
বর্ষা হলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে,
কূল-হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার; দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টিধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।
খেতের মধ্যে কল্‌কলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা-পানার দল।

রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে,
সমস্ত নিঃঝুম
জাগাও নেই কোনোখানে, কোত্থাও নেই ঘুম।

আলমোড়া
১০।৬।৩৭
[২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি,
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।

ধাঁধা ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁদিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার মুখোশ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া,
হাঁ-করা মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি, কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস,
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।
শুধাই আমি, আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই?
মনে হল জবাব এল, আমরা নাই নাই।
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই,
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, আমরা নাই নাই।
আমি শুধাই, কিসের কাজে এসেছ এইখানে।
জবাব এল, সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই, নাই।

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা,
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,

কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি,
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা হারা,
দেনা-পাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন-মাজার,
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার আমরা নাই নাই।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭
[২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

আকাশ

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরন ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।
দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি,
নীল অদৃশ্যপানে;
আকাশপ্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে।
স্তব্ধ ডানা প্রখর আলোর বুকে
যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে।
তীক্ষ্ণ তীব্র সুর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূরের হতে দূর
ভেদ করে যায় চলে।
বৈরাগী ওই পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।

আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহন-স্নানে।
আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল,
দিকে দিকে ঝাপটে বেড়ায় স্পর্ধাবেগের ডানা,
মানতে কোথাও চায় না কারো মানা,
বারে বারে তড়িৎশিখার চঞ্চু আঘাত হানে
অদৃশ্য কোন্ পিঞ্জরটার কালো নিষেধ-পানে,

আকাশে আর ঝড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে।
তাই তো খবর পাই,
শান্তি সেও মুক্তি, আবার অশান্তিও তাই।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭
[২৬? জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে—
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথার থেকে পেলে।
ওই হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা,
গম্ভীরতায় অটল যেমন, চঞ্চলতায় পাকা।
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,
ঝড়ের দিনে কী পাগলামি চাপে যে ওর মাথায়।
ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্‌ সুগম্ভীরের রূপে।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হল, দেখি সকালবেলায়
চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর-খোলার খেলায়।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক একরাশি,
প্রকাণ্ড এক হাসি।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ছবি-আঁকিয়ে

ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।
পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।
যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।
ওই যে গরিবপাড়া,

আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্রমাসের মাঠ করছে ধু ধু।
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায়,
ইচ্ছে ক'রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায়।
তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে,
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে।
হঠাৎ তখন ঝেঁকে উঠে আমরা বলি, তাই তো,
দেখার মতোই জিনিস বটে, সন্দেহ তার নাই তো।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পোছে না কেউ নাম—
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো,
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।
ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব,
এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

ওগো চিত্রী, এব্বার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চৈশ্রবা ত্যেজে।
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে,
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ ক'রে সবজি-ক্ষেতে দেখলে।
আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে।
ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার,
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

অজয় নদী

এককালে এই অজয় নদী ছিল যখন জেগে
স্রোতের প্রবল বেগে
পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি
আপন জোরের গর্ব ক'রে চিকন-চিকন বালি।
অচল বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে
জোর গেল তার কমে,
নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে,
নদী গেল পিছন-পানে সরে;

অনুচরের মতো
রইল তখন আপন বালির নিত্য অনুগত।
কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে
বালির প্রতাপ ঢাকে।
পূর্বযুগের আক্ষেপে তার ক্ষোভের মাতন আসে,
বাঁধনহারা ঈর্ষা ছোটে সবার সর্বনাশে।
আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক,
বুকের মধ্যে ঘুরে ওঠে হাজার ঘূর্ণিপাক।
তার পরে আশ্বিনের দিনে শুভ্রতার উৎসবে
সুর আপনার পায় না খুঁজে শুভ্র আলোর স্তবে।
দূরের তীরে কাশের দোলা, শিউলি ফুটে দূরে,
শুষ্ক বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্দুরে।
চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখ-পানে সূর্য ডোবার দেশে
মনের মধ্যে ভাবি
অস্তসাগর-তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।
তাদের হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথায় টান লাগে না মনে,
কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্‌নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁঠি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ওই যা-কিছুর মাঝে।
ওই যা-কিছুর ছবির ছায়া দুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর চিত্ত নাচিয়ে তোলা ছড়াগুলির তালে—
তির্‌পুর্নির চরে
বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে,

কোন্ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ওই যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভ্রমণী

মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে
পোষ্যপুত্র ক'রে।
ইঁটপাথরের আলিঙ্গনের রাখল আড়ালটিকে
আমার চতুর্দিকে।
মন রইত ব্যাকুল হয়ে দিবস রজনীতে
মাটির স্পর্শ নিতে।
বই প'ড়ে তাই পেতে হত ভ্রমণকারীর দেখা
ছাদের উপর একা।
কষ্ট তাদের, বিপদ তাদের, তাদের শঙ্কা যত
লাগত নেশার মতো।
পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।
চলার ক্ষুধায় চলতে সে চায় দিনের পরে দিনে
অচেনাকেই চিনে।
লড়াই ক'রে দেশ করে জয়, বহায় রক্তধারা,
ভূপতি নয় তারা।
পলে পলে পার যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি—
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি,
আপন বোঝা বাহি
অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

[আলমোড়া]
৬ আষাঢ় ১৩৪৪
[২০ জুন ১৯৩৭]

আকাশপ্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশপানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে,
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে অচেনা পর্বত,
তারই মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাইবোন।
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

পতিসর
৮ [?] শ্রাবণ ১৩৪৪

প্রান্তিক

অস্ত সিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্ত পানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, জীবনের দিগন্ত আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে দিল ধৌত করি
ব্যথার দ্রাবক রসে, দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে,
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায়—সেইমতো জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে, অন্তঃশীলা
জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীর-বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরি-ব্যবধানসম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত। বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

শান্তিনিকেতন
২৫।৯।৩৭

২

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে

ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্ত্যের প্রান্তপথ
দীপ্ত ক'রে দিক, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্বসমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচলচূড়ে
অরুণকিরণতলে একদিন অমর্ত্য প্রভাতে।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৩

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা-মাঝে
মেলিনু নয়ন; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৪

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারাল প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায়; ক্ষয়ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদিমূল্য তার।
চতুষ্পথে দাঁড়াল সে ললাটে পণ্যের ছাপ নিয়ে
আপনারে বিকাইতে, অঙ্কিত হতেছে তার স্থান
পথে-চলা সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়।
হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে
আরতিশঙ্খের ধ্বনি যে লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,
মনে হল, মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশা-প্রত্যাশার কোলাহল। মনে হল,
পরের মুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্ন-মোছা
অসজ্জিত আদি-কৌলীন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে

একাকীর একতারা হাতে। আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্‌ণ বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।
বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথিপারে
পূর্ব ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে।
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয়হুংকারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙা পরম বিস্ময়ে
শুকতারানিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে।

শান্তিনিকেতন
১।১০।৩৭

৫

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৬

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, ঊর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার

শরৎ প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত-উৎসারিত।
সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধুলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে। অনিঃশেষ যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহ মন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ওই নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরসসম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।

হে সংসার,

আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি' চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্র রশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৭

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

ধন্য এ জীবন মোর—

এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। নানা রন্ধ্রে প্রাণের ফোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের নানা বেদনায়।

এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাত্রির শিশিরজলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহস্পর্শনে—তবু আজো
আছে তারা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে,
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্যগন্ধে বিজড়িত।
কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী
রসে পূর্ণ করিয়াছে থরে থরে মনের বাতাস,
প্রভাত-আকাশ যথা চেনা-অচেনার বহু সুরে
কূজনে গুঞ্জনে ভরা। অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাই নি যা বহু সাধনায়
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। কল্পনায়
বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে,
বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে, আলোকিত রঙ্গমঞ্চে,
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টিরহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্‌বারিত
আমার জীবনরচনায়, তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণক্ষণে
অপরূপ অনির্বচনীয়। আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

শান্তিনিকেতন
৭।১০।৩৭

৮

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি-মুছে-যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে। এতকাল
যে সাজে রচিয়াছিনু আপনার নাট্যপরিচয়
প্রথম উঠিতে যবনিকা, সেই সাজ মুহূর্তেই
হল নিরর্থক। চিহ্নিত করিয়াছিনু আপনারে
নানা চিহ্নে, নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে,
মুছিল তা, আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা
আমারে করিল স্তব্ধ, সূর্যাস্তের অন্তিম সংকারে
দিনান্তের শূন্যতায় ধরার বিচিত্র চিত্রলেখা

যখন প্রচ্ছন্ন হয়, বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে

শান্তিনিকেতন
৯।১০।৩৭

৯

দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনাল রজনী,
বিহঙ্গের মৌন গান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১০

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার; দেখি নি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া। সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,

জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১১

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি,
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হয়ে এল; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে এসে।
আকাশের আঙিনায় শান্ত যেথা পাখির কাকলি
সুরসভা হতে সেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার
বাষ্পে-বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—
কেহ শুধাবে না নাম, অধিকারগর্ব নিয়ে তার
ঈর্ষা রহিবে না কারো, অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১২

শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি, প্রদোষের
নির্মলতিমিরতলে। ভৃতি তব সেবার শ্রমের
সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে;
এক প্রহরের মূল্য আরেক প্রহরে ফিরে নিতে
কুণ্ঠা কভু নাহি তার; বাহির-দ্বারের যে দক্ষিণা

অন্তরে নিয়ো না টেনে; এ মুদ্রার স্বর্ণলেপটুকু
দিনে দিনে হাতে হাতে ক্ষয় হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে,
উঠিবে কলঙ্করেখা ফুটি। ফল যদি ফলায়েছ বনে
মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাঙ্গ হল
ফুল ফোটাবার ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হয়ে যাক
লোকমুখবচনের নিশ্বাসপবনে দোল খাওয়া।
পুরস্কারপ্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।
যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
সে যে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত,
নবজাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১৩

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

শান্তিনিকেতন
১৯।১২।৩৭

১৪

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র-জীর্ণপুষ্প-সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনীপ্রভাতে
অস্তসিন্ধুপরপারে। কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে; কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর,

দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩৪১

১৫

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়

বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

১৬

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের; অন্তর্হিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধূলায় প্রণত, যে ধূলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধূলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ বৈশাখ ১৩৪১

১৭

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্ত ধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাথায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে

সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-’পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

শান্তিনিকেতন
২৫।১২।৩৭

১৮

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

শান্তিনিকেতন
খ্রীস্ট-জন্মদিন
২৫।১২।৩৭

সেঁজুতি

উৎসর্গ

ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার
বন্ধুবরেষু

অন্ধ তামস গহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে চেতনা সারারাতি
সুখদুঃখের নাট্যলীলায়
জেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নবপ্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে।
আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি,
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১ শ্রাবণ ১৩৪৫

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো, অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্যপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।

তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুন্ন রবে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশিরকণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলিসূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্বদেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে

লীন হত জড়যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষপ্রহরের ঘণ্টা; সেইসঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

গৌরীপুর ভবন। কালিম্পং
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

পত্রোত্তর

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত

বন্ধু,

চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্র ললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গণদ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা,
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা—
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
'দেখেছি দেখেছি' এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।

তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি;
পরুষকলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনো-কিছু
কে তাহা বলিতে পারে।
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে।
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে,
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথী।

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।
জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্‌, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

মংপু। দার্জিলিং
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

যাবার মুখে

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।

যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপনশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে দিনে জমা-করা
প্রবঞ্চনায় ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।
রাজা মহারাজা মিলায় শূন্যে ধুলার নিশান তুলে,
তারা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
যাওয়ার আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি করে।

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ওই চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল ওই-যে শজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।

যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরই ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাত-রবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি—
'যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি'।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

যায় যদি তবে যাক,
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এ'কে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন যাক।

শান্তিনিকেতন
২২ মাঘ ১৩৪৩

অমর্ত্য

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।
ওইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ওই মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুলশাখায় সাধা,
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখনা তুলি।
দায়-ভোলা মোর মন
মন্দে-ভালোয় সাদায়-কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ
ছাড়িয়ে গেছে দূর দিগন্তপানে
আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্‌ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

শান্তিনিকেতন
১১ মার্চ ১৯৩৭

পলায়নী

যে পলায়নের অসীম তরণী
বাহিছে সূর্যতারা
সেই পলায়নে দিবসরজনী
ছুটেছে গঙ্গাধারা।
চিরধাবমান নিখিলবিশ্ব
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে।
জলের ছায়া সে দ্রুততালে বয়,
কঠিন ছায়া সে ওই লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে।

সৃষ্টি যখন আছিল নবীন
নবীনতা নিয়ে এলে।
ছেলেমানুষির স্রোতে নিশিদিন
চল অকারণ খেলে।
লীলাছলে তুমি চিরপথহারা,
বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা,
তোমার কূলেতে সীমা দিয়ে কারা
বাঁধন গড়িছে মিছে।

আবাঁধা ছন্দে হেসে যাও সরি
পাথরের মুঠি শিথিলিত করি,
বাঁধা ছন্দের নগরনগরী
ধূলায় মিলায় পিছে।

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে।
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।
ভিত ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল,
তারা বুঝিল না—অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।
বিজয়তোরণ গাঁথে তারা যত
আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত,
খেলা করে কাল বালকের মতো
লয়ে তার ভাঙা ঢেলা।

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে।
কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর
নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
নাই বা মিলিল কোনো।
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো।

এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
দুঃখই তাহে মেলে।
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
তাই নাও, দাও ফেলে।
যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
আলোক আঁধার বহি।

দাঁড়াবে না কিছু তব আহবানে,
ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা-পানে,
ভেসে যদি যাও যাবে একখানে
সকলের সাথে রহি।

শান্তিনিকেতন
১৯ চৈত্র ১৩৪৩

স্মরণ

যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।
ওদের এনেছে ডেকে আদি সমীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।
সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন,
চারি দিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার,
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই,
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।
সেদিনের হারা আমি—চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,

হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বান-পাঁতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথী
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।
দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল,
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩৪৩

সন্ধ্যা

চলেছিল সারা প্রহর
আমায় নিয়ে দূরে
যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকো
অনেক ঘাটে ঘুরে।
দূর কেবলি বেড়ে ওঠে
সামনে যতই চাই,
অন্ত যে তার নাই।
দূর ছড়িয়ে রইল দিকে দিকে,
আকাশ থেকে দূর চেয়ে রয় নির্নিমিখে।
দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে
যাত্রাপথের সুর,
অনেক দূর-যে অনেক অনেক দূর।
ওগো সন্ধ্যা শেষ প্রহরের নেয়ে,
ভাসাও খেয়া ভাঁটার গঙ্গা বেয়ে।
পৌঁছিয়ে দাও কূলে,

যেথায় আছ অতি-কাছের
দুয়ারখানি খুলে।
ওই যে তোমার সন্ধ্যাতারা
মনকে ছুঁয়ে আছে,
ছায়ায় ঢাকা আমলকী বন
এগিয়ে এল কাছে।

দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁদা—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
দিল অনেক বাধা।
নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানান দিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।
ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে, করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই।

শান্তিনিকেতন
২৩ এপ্রিল ১৯৩৭

ভাগীরথী

পূর্বযুগে; ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি
মর্ত্যের ক্রন্দনবাণী;
সঞ্জীবনী তপস্যায় ভগীরথ
উত্তরিল দুর্গম পর্বত,
নিয়ে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান-
ডাক দিল, আনো আনো প্রাণ,
নিবেদিল, হে চৈতন্যস্বরূপিণী তুমি,
গৈরিক অঞ্চল তব চুমি
তৃণে শষ্পে রোমাঞ্চিত হোক মরুতল;
ফলহীনে দাও ফল,

পুষ্পবন্ধ্যালতিকার ঘুচাও ব্যর্থতা,
নির্বাক ভূমির মুখে দাও কথা।
তুমি যে প্রাণের ছবি,
হে জাহ্নবী—
ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে
জাগ্রত কল্লোলে
গানে মুখরিয়া উঠে মাটির প্রাঙ্গণ,
দুই তীরে জেগে ওঠে বন;
তট বেয়ে মাথা তোলে নগরনগরী
জীবনের আয়োজনে ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরি ভরি।

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়
নাহি জানে;
তাই সে হেরিছে ধ্যানে,
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে
অক্ষয় অমৃতস্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।
পুণ্যতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।

সে ডাকিছে, মিথ্যাশঙ্কা-নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি সে তুমি মুছাও;
গম্ভীর অভয়মূর্তি মরণের
তব কলধ্বনি-মাঝে গান ঢেলে দিক তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে;
নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব,
নিক সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব;
শেষ দণ্ডে ভরে দিক তার কান
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য-অভিসার-গান।

শান্তিনিকেতন
২৬ এপ্রিল ১৯৩৭

তীর্থযাত্রিণী

তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে
শেষ আধক্রোশটুকু টেনে টেনে চলে কোনোমতে।
হাতে নামজপ-ঝুলি,
পাশে তার রয়েছে পুঁটুলি।
ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে,

আর-কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আর-কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্ঘ্যেরে ফিরে পায়,
যেথা গিয়ে ছায়া
কোনো-এক রূপ ধরি পায় যেন কোনো-এক কায়া।
বুকের ভিতরে ওর পিছু হতে দেয় দোল,
আশৈশব-পরিচিত দূর সংসারের কলরোল।
প্রত্যাখ্যাত জীবনের প্রতিহত আশা
অজানার নিরুদ্দেশে প্রদোষে খুঁজিতে চলে বাসা।

যে পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন
সেখানে নবীন
আলোকে আকাশ ওর মুখ চেয়ে উঠেছিল হেসে।
সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।
যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে সুখে মেশা,
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

আজিকে চলেছে যারা খেলার সঙ্গীর আশে
ওরে ঠেলে যায় পথপাশে;
যে খুঁজিছে দুর্গমের সাথী
ও পারে না তার পথে জ্বালাইতে বাতি
জীর্ণ কম্পমান হাতে
দুর্যোগের রাতে।
একদিন যারা সবে এ পথ নির্মাণে
লেগেছিল আপনার জীবনের দানে,
ও ছিল তাদেরই মাঝে
নানা কাজে,
সে পথ উহার আজ নহে।
সেথা আজি কোন্ দূত কী বারতা বহে
কোন্ লক্ষ্য-পানে
নাহি জানে।
পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।

হায় সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

আলমোড়া
২২ মে ১৯৩৭

নতুন কাল

কোন্ সে কালে কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

অনেক বাণীর বদল হল, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে-সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া
তারা ছিল আরেক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।
তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,
ইহকালের পরকালের হাজার-রকম ভয়।
জাগত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নামত দেশে,
ভাগ্যে লাগত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেষে।
ঘরের থেকে খিড়কি ঘাটে চলতে হত ডর,
লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।
আঙিনাতে শুনত পালাগান,
বিনা দোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।
সামান্য ছুতায়
ঘরের বিবাদ গ্রামের শত্রুতায়
গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।
হারত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চলত চাষ।
ধর্ম ছাড়া কারো নামে পাড়বে যে দোহাই
ছিল না সেই ঠাঁই।
ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কওয়া, সংকোচে মন ঘেরা,
গৃহস্থবউ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা,
আলতা পায়ে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
ঘরের কোণে জ্বালে মাটির দীপ।
মিনতি তার জলে স্থলে, দোহাই-পাড়া মন,
অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ।
আয়ুলাভের তরে
বলির পশুর রক্ত লাগায় শিশুর ললাট-'পরে।

রাত্রিদিবস সাবধানে তার চলা,
অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা।
ও দিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
এ দিকে সংসারের পথে অপদেব্‌তা নানা।
জানা কিংবা না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
ভয়ে তারি হয় না মাথা সোজা।
এরই মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

সেদিনও সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁজ-সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনি,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাতকালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।
সন্ধেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,
হাঁস-বলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।
ডাঙায় উনুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে।
শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে।

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,
কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।
ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা,
বইবে নদীর ধারা,
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পান্‌সি রইবে বাঁধা।

তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

আলমোড়া
২৫ মে ১৯৩৭

চলতি ছবি

রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায় ওই যে দূরের গ্রাম
যেমন ঝাপসা না-জানা ওর নাম।
পাশ দিয়ে যাই উড়িয়ে ধুলি, শুধু নিমেষতরে
চলতি ছবি পড়ে চোখের 'পরে।

দেখে গেলেম, গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা,
দেখে গেলেম, পথের ধারে ব্যাবসা চালায় মুদি;
দেখে গেলেম, নতুন বধু আধেক দুয়ার রুধি
ঘোমটা থেকে ফাঁক ক'রে তার কালো চোখের কোণা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বটগাছের তলায় পড়ন্তি রোদের বেলায়
গ্রামের ক'জন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।
এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে।

ওই না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকাল বেলায় পূবে
সূর্য ওঠে, সন্ধে বেলায় পশ্চিমে যায় ডুবে।
দিনের সকল কাজে,
স্বপ্ন-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে,
ওই ঘরে, ওই মাঠে,
ওইখানে জল-আনার পথে ভিজে পায়ের ঘাটে,
পাখি-ডাকা ওই গ্রামেরই প্রাতে,
ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা,
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।
তারা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ওই আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রিদিনকে কাঁদিয়ে-তোলা ব্যাকুল প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্‌বেলতা,
তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে
মানবচিত্ত-তুঙ্গশিখর হতে
সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া
কান্নাহাসির পাকে,
তাহা হলে তেমনি করেই দেখে নিতেম তাকে
চমক লেগে হঠাৎ পথিক দেখে যেমন ক'রে
নায়েগারার জলপ্রপাত অবাক দৃষ্টি ভ'রে।

যুদ্ধ লাগল স্পেনে;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়-রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই যে লক্ষ-কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্ত-মহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল;
ওই তো তাহা সম্মুখেতেই, চার দিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায় নি তো
তাহারি মাঝখানে-বসা আমার চিত্তখানি।
এই প্রকাণ্ড জীবননাট্যে কে দিয়েছে টানি
প্রকাণ্ড এক অটল যবনিকা।
ওদের আপন ক্ষুদ্র প্রাণের শিখা
যে আলো দেয় একা,
পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি যায় না তাহে দেখা।

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বলিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।
কিন্তু এই যে এই মুহূর্তে বেদন-হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্তল
বিশ্বধারায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্ত্যজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে,
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরামহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র-আলোকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৪৪

ঘরছাড়া

তখন একটা রাত—উঠেছে সে তড়বড়ি,
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রেতে ঘড়ি
কর্কশ সংকেত দিল নির্মম ধ্বনিতে।
অঘ্রানের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে
ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।
পিছে পড়ে থাকে
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।
জরাগ্রস্ত তক্তপোশ কালিমাখা-শতরঞ্চ-পাতা;
আরামকেদারা ভাঙা-হাতা;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ-ধরা;
পোকা কাটা হিসাবের খাতা-ভরা
কাঠের সিন্দুক এক ধারে;
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা।

ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকারপরুষরবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে-তিন।

শূন্যপানে চক্ষু মেলি
দীর্ঘশ্বাস ফেলি
দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার।
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়াল বাহিরে।
ঊর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।

বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।
সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের
পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের পাতা-ছাওয়া— ক্ষীণ আলো করে মিট্‌মিট্‌,
পাশে ভেঙে-পড়া পাঁজা। তলায় ছড়ানো তার ইঁট।
রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে
লুপ্তরেখা সংসারের ছবি— ধান-কাটা কাজে
সারাবেলা চাষীর ব্যস্ততা;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈ হৈ রবে; হাটবারে ভোরবেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা,
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ও পারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে চলা।
নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।

যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
আঁকাবাঁকা গলি
রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি;
দুই পাশে বাসা সারি সারি;
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরামশয্যা-'পরে।
নিবিড় আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া স্তব্ধতাকে
শুকতারা দিল দেখা।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূরে।

শ্রীনিকেতন
২২ নভেম্বর ১৯৩৬

জন্মদিন

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ওই লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে,
শজনে পাতার মতো যাদের হালকা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙিন করছে ওরে,
নিলাজ মঞ্চে রাখছে তুলে ধ'রে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত;
লুকোয় কোথা ভেবে না পায়, আড়াল ভূমিসাৎ।

দাও-না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ-আলো শ্যামল-ছায়া বিরল-কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি-'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।

ভোরবেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে
ঠেকল যখন সব-প্রথমের চেনাশোনার দেশে,
নামল ঘাটে যখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগল আকাশ থেকে,
যেমন ক'রে লাগে তরীর পালে,
যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে।
নাম-ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টিসুরের দাম;
কানে কানে সে নাম-ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুই প্রহরে।
আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি
সেই নিমেষের তারিখ দিল লিখি।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে;

ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে;
সর্ষে-তিসির খেতে
দুইরঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই-যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

আলমোড়া
২২ বৈশাখ ১৩৪৪

প্রাণের দান

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তার পর হতে তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায় ফেলায়।
প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।
আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায়; পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

শান্তিনিকেতন
১ মার্চ ১৯৩৮

নিঃশেষ

শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ বেগ;
ক্লান্তি আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিক্‌হারা তার ঝড়ের মত্ত লীলা,
বিদ্যুৎপ্রিয়া স্মৃতির গভীরে হল অন্তঃশীলা।
সময় এসেছে, নির্জনগিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।

অস্তসাগর পশ্চিমপারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্তঋষির নীরব বীণার রাগিণীতে লীন হবে।
তবু যদি চাও শেষদান তার পেতে,
ওই দেখো ভরা খেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।

শান্তিনিকেতন
৮।৪।৩৮

প্রতীক্ষা

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয় নি যে দেখা আজো কোনোখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি।

বাতাসে আকাশে যে নবরাগিণী
জগতে কোথাও কখনো জাগে নি
রহস্যলোকে তারি গান সাধা
চলে অনাহত রবে।
ভেঙে যাবে বাঁধ স্বর্গপুরের,
প্লাবন বহিবে নূতন সুরের,
বধির যুগের প্রাচীন প্রাচীর
ভেসে চলে যাবে তবে।

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি,
যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৬

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি
পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, এ আমাদেরই লোক।
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা,
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে—
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণলিখন-পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে
সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ ১৩৪৩

পালের নৌকা

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালের নৌকা ছাড়ি—
গাছের পরে গাছ ছুটে যায়, বাড়ির পরে বাড়ি।
দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রামে
ঘাটের পরে ঘাটগুলো সব পিছিয়ে চলে যায়
ভোজবাজিরই প্রায়।

নাইছে যারা তারা যেন সবাই মরীচিকা
যেমনি চোখে ছবি আঁকে মোছে ছবির লিখা।
আমি যেন চেপে আছি মহাকালের তরী,
দেখছি চেয়ে যে খেলা হয় যুগযুগান্ত ধরি।
পরিচয়ের যেমন শুরু তেমনি তাহার শেষ,
সামনে দেখা দেয়, পিছনে অমনি নিরুদ্দেশ।
ভেবেছিলুম ভুলব না যা তাও যাচ্ছি ভুলে,
পিছু-দেখার ঘুচিয়ে বেদন চলছি নতুন কূলে।

পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া।
এই নাড়াতেই লাগছে খুশি, লাগছে ব্যথা কভু,
বেঁচে-থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু।
বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া-
একেই বলে জীবনতরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।
তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড় টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার-তীর্থগামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা
যে সমুদ্রে অস্তে নামে কালপুরুষের তারা।

আলমোড়া
৮ জুন ১৯৩৭

চলাচল

ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের,
ওরা কাজে চলছে ছুটে, তুমি কাজের পারের।
বয়স তোমায় অনেক দিল, অনেক নিল কেড়ে,
রইল যত তাহার চেয়ে অধিক গেল ছেড়ে।
চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে,
কোনো চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।

যেথায় ছিল চেনা লোকের নীড়
অনায়াসে জমল সেথায় অচেনাদের ভিড়।
তুমি শান্ত হাসি হাস যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাবে।

আলমোড়া
২৯ মে ১৯৩৭

মায়া

করেছিনু যত সুরের সাধন
নতুন গানে,
খসে পড়ে তার স্মৃতির বাঁধন
আলগা টানে।
পুরানো অতীতে শেষে মিলে যায়—
বেড়ায় ঘুরে,
প্রেতের মতন জাগায় রাত্রি
মায়ার সুরে।

২

ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায়
যে সুরখানি
স্বপ্নগহনে লুকিয়ে বেড়ায়
তাহার বাণী।
বুকের কাঁপনে নীরবে দোলে সে
ভিতর-পানে,
মায়ার রাগিণী ধ্বনিয়া তোলে সে
সকল খানে।

৩

দিবস ফুরায়, কোথা চলে যায়
মর্ত্য কায়া,
বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়
ছায়ার ছায়া।
নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা
দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা,
স্বপ্ন আসিয়া রচি দেয় তার
রূপের মায়া।

[শান্তিনিকেতন
অক্টোবর ১৯৩৭]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ,

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন,
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্যমাঝে
অমল শুভ্রতার।

শান্তিনিকেতন
১৯ অগস্ট ১৯৩৮

ছুটি

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে—ছুটির মহাদেশ।
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটি সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

প্রহাসিনী

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে,
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারায়ে
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু,
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্ অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে ঝলকে,
তারা কেহ ধ্রুব নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে।

তিমির আসনে যবে ধ্যানমগ্ন রাতি
উল্কাবরিষনকর্তা করে মাতামাতি,
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গণা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে
বিধাতার স্নেহ তাহে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে,
মূল্য তার মনে মনে জানি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়,
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হর্‌দম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই
মনে রেখো তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক A.D., সে যে B.C. নয়,
মোর যারা মেয়ে বোন, নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিযশে তারি কাছে বারো-আনা ঋণী যে।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরী-নিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ যে।
সেকালেও কালিদাস বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।

জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখ অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে।
ওই দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।
বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি,
ক্ষমা ক'রে কোরো সেই অপরাধমুক্তি।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে।
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পুরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাক, "আহা, মন্দ বা কী।"
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কজনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণ পবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে,
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে
তা হলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আব্‌দার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।

এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।
অতএব মন, তো কলসি ও দড়ি আন্‌,
অতলে মারিস ডুব Mid-Victorian।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে,
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।

তোমাদের মুখে থাক্‌ হাস্যের রোশনাই,
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝরে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামী যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা Cinical।
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে, ঢাকা থাক্‌ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।

ভিড় ক'রে ঘটা করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না, ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো,
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ,
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টি'কে না যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টি'কাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে।
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই-সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে,
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায়;
তারা তো মন্দ-মধুর দোলায়

শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি,
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীষ তব, দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার,
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—
স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি,
তাহার অধিক মিঠে কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি,
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত,
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা,
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেল্‌কি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

পরিণয়মঙ্গল

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্‌ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে,
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

'পাক প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

যা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি,
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়,
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উল্টিয়ো মনুসংহিতাটি,
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয়।

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু-তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে।

দ্রুত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক ইষ্ট।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে রে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে,
তার পরে আরো কী বা রবে অবশিষ্ট।

প্রয়াগ
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
সাতভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে
করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদী
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির rank-এ,
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে thank-এ।
এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া,
ধরিল পারুল দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি।
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে গেল ঘামি সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হল
ভোজ্য অগুন্তি।

বড়ো থালা কাংসের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা
হয়ে গেল পূর্ণ।
সুঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘূর্ণো।
জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা,
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী।
নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি।
চোখ রেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, "দিদি মোর,"
কেহ বলে, "বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ো স্মরণ গো।"
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ।
ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ।
লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি,
একি মিছে বকুনি।
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে

ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব,
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে
যা রয়েছি তাই হয়ে
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে,
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা,
ধুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
বোনটার ধ'রে চুল
টেনে তার দেব দুল,
খেলার পুতুল তার
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তার কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,
রাক্ষুসি বলে তার
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হলে নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।
ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত।

ভাইদ্বিতীয়া
১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগেরে ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশী,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে,
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি,
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,
কবিরাজিও নারাজ হবে
তখন আবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে
অম্লশূলসাধনকৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত,
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত।

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা,
যত দূর জানা আছে সেটা নয় তামাশা।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো।

বউমার অবারিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চর্ব্য ও কত পেয়,
ডেকে ডেকে বলেছেন, যত পার তত খেয়ো।
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের,
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূধরের;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা
অন্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, ক্ষতি নেই আমাদের।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে।
বিশ্বে ছড়াল খ্যাতি, বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, বলো দেখি, হল কী হে।
এত বড়ো রটনার কারণ ঘটান যিনি
তাঁর কাছে কবি রবি চিরদিন রবে ঋণী।

গরঠিকানি

বেঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি।
দাদুর পদবী
পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো ক'রে
কভু কি ঠেকানো যায়।
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি;

ছন্দেই তার
　　জবাবটা থাক মিটি।
নিশ্চিত্ত তুমি
　　জানিতে মনের মধ্যে—
গর্ব আমার
　　খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
　　শক্ত জাতেরই ঘোড়া,
বয়সের দোষে
　　কিছু তো হয়েছে খোঁড়া।
তোমাদের কাছে
　　সেই লজ্জাটা ঢেকে
মনে সাধ, যেন
　　যেতে পারি মান রেখে।
তোমার কলম
　　চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
　　চালাব সে ঝাঁপতালে;
হাঁপ ধরে, তবু
　　এই সংকল্পটা
টেনে রাখি, পাছে
　　দাও বয়সের খোঁটা।
ভিতরে ভিতরে
　　তবু জাগ্রত রয়
দর্পহরণ
　　মধুসূদনের ভয়।
বয়স হলেই
　　বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
বড়ো ঘৃণা মোর
　　সেই অভাগার 'পরে।
প্রাণ বেরোলেও
　　তোমাদের কাছে তবু
তাই তো ক্লান্তি
　　প্রকাশ করি নে কভু।

কিন্তু একটা
　　কথায় লেগেছে ধোঁকা
কবি বলেই কি
　　আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
　　করে বটে নানা লোকে

সহ্য তো করি
        স্পষ্ট দেখেছ চোখে,
সেই কারণেই
        তুমি থাক দূরে দূরে,
বলেছ সে কথা
        অতি সকরুণ সুরে।
বেশ জানি তুমি
        জান এটা নিশ্চয়
উৎপাত সে যে
        নানা রকমের হয়।
কবিদের 'পরে
        দয়া করেছেন বিধি—
মিষ্টি মুখের
        উৎপাত আনে দিদি।
চাটু বচনের
        মিষ্টি রচন জানে,
ক্ষীরে সরে কেউ
        মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিলকণ্ঠে
        কেউ বা কলহ করে,
কেউ বা ভোলায়
        গানের তানের স্বরে।
তাই ভাবি, বিধি
        যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
        বরাদ্দ দেন তুলে,
শুকনো প্রাণটা
        মহা উৎপাত হবে,
উপমা লাগিয়ে
        কথাটা বোঝাই তবে।
সামনে দেখো-না
        পাহাড়, শাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রিকের
        খোঁটা পোঁতে তার বুকে;
সন্ধেবেলার
        মসৃণ অন্ধকারে
এখানে সেখানে
        চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
        ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
        শৈলশিখর-পানে—

বলে, "আজ হতে
জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
লাগাব না আর রাতে",
ভেবে দেখো, তবে
কথাটা কি হবে ভালো,
তাপের জ্বলন
আনে কি সবারই আলো।

এখানেই চিঠি
শেষ করে যাই চলে
ভেবো না যে তাহা
শক্তি কমেছে ব'লে;
বুদ্ধি বেড়েছে
তাহারই প্রমাণ এটা,
বুঝেছি, বেদম
বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি যাহা তাই
কম, এ কথাটা মানি—
চেঁচিয়ে বলার
চেয়ে ভালো কানাকানি।
বাঙালি এ কথা
জানে না ব'লেই ঠকে,
দাম যায়, আর
দম যায় যত বকে।
চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্টিরিয়ায় পাওয়া।
তারে বলে আর্ট
না-বলা যাহার কথা,
ঢাকা খুলে বলা
সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো-না
নাম-ঢাকা তব নাম;
নামজাদা খ্যাতি
ছাপিয়ে যে ওর দাম।

এই দেখো দেখি,
ভারতীর ছল কী এ।
বকা ভালো নয়,
এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
বকুনি যা হল জমা
আর্টের দেবী
করিবে কি তারে ক্ষমা।
সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা—
রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে;
তাই ব'কে যাই
যত কথা আসে মুখে।
এ যেন কলপ
চুলে লাগাবার কাজ,
ভিতরেতে পাকা
বাহিরে কাঁচার সাজ।
ক্ষীণ কণ্ঠেতে
জোর দিয়ে তাই দেখাই
বকবে কি শুধু
নাতনিজনেরা একাই।
মানব না হার
কোনো মুখরার কাছে,
সেই গুমরের
আজো ঢের বাকি আছে।

কালিম্পং
৬ আষাঢ় ১৩৪৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি রে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিংবা পদ্যে।
পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে—

কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় আড়া,
ধাক্কা খেয়ে যে জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে
ভেসে বেড়ায় ধীরে,
মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
শজনেগুচ্ছ-সাথে।

এদিকে যে লেখনী মোর
একলা বিরহিণী;
দৈবে যদি কবি হতেন তিনি
বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নীচের লেখার ছাঁদে আমায়
দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকুটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান।
স্বাধিকারে প্রমত্ত কি ছিলাম কোনোদিন।
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ।
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।
পত্রপটে অক্ষর রূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা।

ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামী
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় টেবিল-'পরে দুটি,
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম,
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জনায় বিসর্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী।

পলাতকা

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
এক্‌জামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের 'পরে ঝুঁকে থাক',
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া।
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
সম্মুখে নফর বনমালী।
'সম্মুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিঁচে,
বিনাদোষে দিই তারে গালি।
ভোজন ওজনে অতি কম,
নাই রুটি, নাই আলু-দম,
নাই রুইমাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু-পেয়ালা Chinese-tea-য়ে
আধসের দুগ্ধ ঢালিয়া।
উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
রুটি-তোস্‌ শুধু খান-তিন।
গোটা-দুই কলা খাই গুনে,
তারই সাথে বিলিতি-বেগুনে
কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন।

মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই দু-চারিটে,
খেজুর গুড়ের সাথে মেখে।
পিরিচে পেরাকি যবে আনে
আড়চোখে চেয়ে তার পানে
'পরে খাব' বলে দিই রেখে।
তারপর দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁই নেকো কোফ্‌তা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব।
করছি নে exaggerate,
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সেও অল্প না।
বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
পনেরো আনাই কল্পনা।
অতএব এই চিঠি-পাঠে
পরান তোমার যদি ফাটে
খুব বেশি রবে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভ'রে দিয়ো হাহারবে
কবি-নাতনির রেখো মান।

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়
যদি কোনো নীতিবাদী কয়
কোস্‌ তারে, "অতিশয় উক্তি—
মসলার যোগে যথা রান্না,
আবদারে ছল ক'রে কান্না,
নাকী সুর যোগে যথা যুক্তি।
ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
কানে ঝুমকোর ফুল দামী।
কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম
জমকালো করেছি তো আমি।"
অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই,

কেবলই বানানো বচনেই
ভরা এ যে ছলায় কলায়।
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা,
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
না-হয় না হলে কবিবর,
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো
তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।
যে ভাষায় কথা কয়ে থাকো
আদর্শ তারে বলে নাকো,
আমার পক্ষে সে তো ঢের,
flatter করিতে যদি পার
গ্রাম্যতাদোষ যত তারও
একটু পাব না আমি টের।

শান্তিনিকেতন
৮ মাঘ ১৩৪১

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপিকিনিসু,
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুম্ফ শ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদ্‌খেয়ালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারুনী সইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোঁফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনী
বলেন না তো, 'দ্বিধা হও, মা ধরণী'।

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
"দাতা বটে ষোলো আনা।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
খুঁজিয়া না পাবে চাবি,
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবি।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে।
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ,
ধন্য ধন্য গৌড়।

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা যত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু সত্য এ কথা—
বারো আনা অভদ্রতা
কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক' তারে,

ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চুকে।

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয়।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম
সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজফারের কাছে।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ,
তা নিয়ে কাঁদ না ভেউ-ভেউ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছ
নামের আদর নাহি যাচ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোক্কর।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা।
লজঞ্জুসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য।
তাই তো নিজেরে বলি ধিক্,
তোমারি হিসাব-জ্ঞান ঠিক।
বস্তু-অবস্তুর সেন্স্
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স্
পষ্ট তোমার কাছে খুবই
তাই, হে লজঞ্জুস-লুভি,
মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক্ টেবিলের কোণে;
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি-চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তবে অন্তত
মান রবে আজকের মতো।
ছ বছর পরে নিয়ো খাতা
পোকায় না কাটে যদি পাতা।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৪৫

খা প ছা ড়া

১

পাবনায় বাড়ি হবে গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি,
রাঁধুনি মহল তরে করোগেট-শীট্ কিনি।
ধার ক'রে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত দুড়দাড় কী বিষম শব্দ যে
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্ খিট্ খিট্‌কিনি।

কী করি না ভেবে পেয়ে মথুরায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে আরেকটা পাকা বাড়ি
বানাবার মতলবে পোড়ো এক ভিট কিনি।
তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,
সিঁড়িটা রইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেরই,
তাই নিয়ে গৃহিণীর কী যে নাক-সিট্‌কিনি।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৪

২

বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায়
মাথার নীচে ইঁট দিয়ে।
কাঁথা নেই, সে প'ড়ে থাকে
রোদের দিকে পিঠ দিয়ে।
শ্বশুর বাড়ি নেমন্তন্ন,
তাড়াতাড়ি তারি জন্য
ছেঁড়া গামছা পরেছে সে
তিনটে চারটে গিঁঠ দিয়ে।
ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে
ছড়ি ক'রে চায় বানাতে,
রোদে মাথা সুস্থ করে
ঠাণ্ডা জলের ছিট দিয়ে।
হাসির কথা নয় এ মোটে,
খেঁকশেয়ালিই হেসে ওঠে
যখন রাতে পথ করে সে
হতভাগার ভিট দিয়ে।

৩

পাঁচদিন ভাত নেই, দুধ এক রত্তি,
জ্বর গেল, যায় না যে তবু তার পথ্যি।
সেই চলে জল সাবু,
সেই ডাক্তার বাবু,
কাঁচা কুলে আমড়ায় তেমনি আপত্তি।

ইস্কুলে যাওয়া নেই সেইটে যা মঙ্গল—
পথ খুঁজে ঘুরি নেকো গণিতের জঙ্গল।
কিন্তু যে বুক ফাটে
দূর থেকে দেখি মাঠে
ফুটবল ম্যাচে জমে ছেলেদের দঙ্গল।

কিনুরাম পণ্ডিত মনে পড়ে টাক তার,
সমান ভীষণ জানি চুনিলাল ডাক্তার।
খুলে ওষুধের ছিপি
হেসে আসে টিপিটিপি,
দাঁতের পাটিতে দেখি দুটো দাঁত ফাঁক তার।
জ্বরে বাঁধে ডাক্তারে, পালাবার পথ নেই;
প্রাণ করে হাঁসফাঁস যত থাকি যত্নেই।
জ্বর গেলে মাস্টারে
গিঁঠ দেয় ফাঁসটারে,
আমারে ফেলেছে সেরে এই দুটি রত্নেই।

উদয়ন
শান্তিনিকেতন
১৫।৯।৩৮

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা—
লেগেছি প্রুফ-করেক্‌শনে গলায় কুন্দমালা।
ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজন ঘরে একা,
এমন সময় নাতনি দিলেন দেখা।

সোনার কাঠির শিহরলাগা বিশবছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।
হঠাৎ পাশে আসি
কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
"কোন্‌ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে।"
একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিয়ে চোখ
বলে দিলেম, "যেই বা সে-জন হোক
বলব না তার নাম,
কী জানি ভাই, কী হয় পরিণাম।
মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
একটুকুতে বুক জ্বালায়।"
বললে শুনে বিংশতিকা, "এই ছিল মোর ভালে—
বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগী।"
আমি বললেম, "কেনই বা দাও লাজ,
করোই-না আন্দাজ।"
বলে উঠল, "জানি জানি ওই আমাদের ছবি,
আমারই বান্ধবী।
একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্‌ল্‌-স্কুলে,
তোমার নামে চোখ পড়ে তার ঢুলে।
তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
মুগ্ধ আঁখি পক্ষপাতের কটাক্ষ সন্ধানে।"
আমি বললেম, "নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
আমাদের ওই জগা মালী, মৃদুস্বরে কই।"
নাতনি বলে, "হায় কী দুরবস্থা,
বয়স হয়ে গেছে ব'লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
যে গলাটায় আমরা গলগ্রহ
জগামালীর মালা সেথায় কোন্‌ লজ্জায় বহ।"
আমি বললেম, "সত্য কথাই বলি,
তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।

নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
ওই যে কঠিন কালো।
জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
রস কিছু তার পাই যে অনুভবে।
এ-সব কথা বলতে মানি ভয়,
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—
এ বাণী বস্তুত
কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছুতো,
ডাইডাক্‌টিক্‌ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নতুন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি, উপদেষ্টা নই।
বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ওই গাছে
গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—
যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
ব্যঙ্গকুটিল দুর্বাক্য-চয়নী,
ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
হরিজনের প্রপাগ্যান্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।
এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে
সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
আজকে যদি বলি 'আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি',
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।"
নাতনি কহেন, "ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
আমার মনে সত্যি লাগায় ব্যথা।
তোমার বয়স চারি দিকের বয়সখানা হতে
চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে।
একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাতি,
নাইকো তোমার আপন দরের সাথী।
জগামালীর মালাটা তাই আনে
বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে।"
আমি বললেম, "দয়াময়ী, ওইটে তোমার ভুল,
ওই কথাটার নাইকো কোনো মূল।
জান তুমি, ওই যে কালো মোষ
আমার হাতে রুটি খেয়ে মেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় ব'লে সে আছে কি তার দোষ।

জগামালীর প্রাণে
যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে,
কী নাম দেব তার,
একরকমের সেও অভিসার।
কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,
সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয়।"
নাতনি হেসে বলে,
"কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি,
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।"
আমি বললেম, "যদি কোনোক্রমে
জন্মগ্রহের ভ্রমে
ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,
হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে।"
নাতনি বলে, "সত্যি বলো দেখি,
আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি।"
আমি বললেম, "নিশ্চয় লিখবই,
আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য করেই কই।
বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভুরু,
শোনো তবে, এইমতো তার শুরু।—
'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।
শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা।
তা ছাড়া ওই পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'
তার পরেকার বর্ণনা এই—'তামাক-সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।'"

নাতনি বললে বাধা দিয়ে, "আমি জানি জানি,
কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অনুমানি।
যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায়।
বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য।"
আমি বললেম, "ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্‌টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।"

নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৮

সংযোজন

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু[১] মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
টপাল্,[২] টপাল্, কঁহা টপাল্‌রে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরিবাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পানি নেক্‌লা।
সর্বদা মন কেমন করতা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হুহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,[৩]
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজসাহেব[৪] কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজসাহেবকি বেটা!
গাড়ি চড়্‌কে লাঠিন পড়কে তুম্ তো যাতা ইস্কিল্,
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমারা বহুৎ মুস্কিল!
এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সম্‌ঝে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌খিল্ কর্কে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মতো তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

[১] সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২] চিঠির ডাক।
[৩] ইন্দিরা দেবী।
[৪] অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথের পিতা।

সুসীম চা-চক্র

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চলো
চলো চলো হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে!

এল চীন-গগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে!

এসো পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কান্ডারী,
এসো গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূবিবরণ ভান্ডারী।
এসো বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত!
এসো হিসাব-পত্তর-ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে!

এসো গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এসো চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।

এসো কনস্‌টিট্যুশন
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,
এসো কমিটি-পলাতক
বিধানঘাতক
এসো দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে।

[শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৩১]

চাতক

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন চা-চক্রে আহূত অতিথিগণের প্রতি

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শাস্ত্র গিরিশিরে!
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে!

পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে।
নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি,
গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে।

অনুস্বরে ধনুঃশর-টংকারের সাড়া
শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে।
শংকর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,
পালি ভাষায় শাসায় ভীরুদেরে।

চা-রস ঘন শ্রাবণধারাপ্লাবন লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা—
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,
চকোর-বেশে বিধুরে কেন ঘেরা!

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি যাঁদের সাথে
পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির
ভবিষ্যতের লক্ষ্য,

উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে
　　মিলন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক
　　নানা রসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের
　　ডেকেছিলেন দক্ষ
অনাহূত পড়ল এসে
　　মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো,
　　মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত
　　দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া
　　ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের
　　আশিস লক্ষ লক্ষ—
“তাদের ভাগ্যে অবিলম্বে
　　জুটুন কারাধ্যক্ষ।”
এর পরে আর মিল মেলে না
　　য র ল ব হ ক্ষ।

[? ১৯২৮]

নাতবউ

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
　　সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
　　মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
　　সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে।

সযতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি
　　আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
　　মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে
　　মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে।

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সংগীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গিতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে।

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত বঙ্কিম বেণীভঙ্গিমা?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে?

দার্জিলিং
বিজয়া দ্বাদশী
১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রুর কটাক্ষে
কখন বজ্র হানতে পার অত্যাশায়।

দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন না হয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো।
জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।

বলবে তুমি, 'বালাই! কেন বকছ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি।

১ জুন ১৯৩৫

নামকরণ

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,
গুরুভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরার ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নির্দেশ,
যাহা কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি।

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাক্ খ্যাক্ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

দিনখাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে—
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে—
দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদসভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মুলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারি।

শান্তিনিকেতন
৭ মার্চ ১৯৩৯

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটর্‌কে এগিয়ে আনে; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিস্টিক; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেবতাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটারি, নয় মেনকা-রম্ভা—
রিয়লিস্টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা—
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম।

রেলেটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে,
দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু, সে সুধাময় লোকবিশেষে তো
হাস্যরাস্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে,
অথচ তাহার সংস্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।
প্রকাশ্যে এক রূপ যার
ঘোমটায় আর।

তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবাই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে, সংসারে
দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কভু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাব' যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
সকাল
৩০।১২।৩৮

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ;
খাওয়া ছোঁয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষরাতে জাগে;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা;
মাজা-ঘষা শেষ করে আঙিনায় ছোটে—
ধড়্‌ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধ'রে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে,
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটিকুটি বানায় ইঁচোড়;
চাকা চাকা করে থোড়,
আঙুলে জড়ায় তার সুতো;
মোচাগুলো ঘস্‌ ঘস্‌ কেটে চলে দ্রুত;

চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তার পরে হাতা বেড়ি খুন্তি;
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাশে—
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগির কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম;
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
বলবে "বজ্জাত ভারি"।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি।

জনার্দন ঠাকুরের
পানাপুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,
ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি
খস্‌খস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছম্‌ছমে অন্ধকারছায়ে।
সন্ধেবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর—কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়—
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে;
তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারই খরচের হল বন্দোবস্ত।

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্জেমশা'র অনুমত—
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে।

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশন্যাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি. এ. এম. এ. পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টিকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।

বৃহস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

মধুসন্ধায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দদ্যাৎ' বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে প'ড়ে তাই
লুচি-পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দদ্যাৎ',
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদ্যাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিশ্বাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গদ্য হতে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য।

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬

২

তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের
চারি দিকে লক্ষণ মধু-দুর্ভিক্ষের।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠান্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভান্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
জাম্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা।

এইভাবে করা ভালো সন্তোষ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৩

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণা বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্ণে পরাহ্ণে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।
যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দেবে তোমারে আমার পরিহাস;
তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে;
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে।

৫ মার্চ ১৯৪০

৪

দূর হতে কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
কমলাকানন তব না হউক শূন্য।
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে,
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য।
তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ন।'
আরবার কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য।
রুটি বলে জয়-জয়,
লুচিও যে তাই কয়,
মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তারুণ্য।

৭ মার্চ ১৯৪০

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্‌ভন্‌-ভন্‌ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ
দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচা-গন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন;
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
বসে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত—
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভু ও।

পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ;
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত;
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে;
কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে।
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,

ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই!

চারি দিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্-ভন্-ভন্কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
বার বার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।
অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ—
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে বোসো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
কোরো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহো প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের—
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্ ভন্‌ভন্
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
যতই আমি নাবছি
আমায় মনে আছে কি না
ভয়ে ভয়ে ভাবছি।
কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,
হাই তুললে দুটো;

বললে উসখুস করে,
“কোথায় গেল নুটো।”
ডেকে তারে বলে দিলে,
“ড্রাইভারকে বলিস,
আজকে সন্ধ্যা নটার সময়
যাব মেট্রোপলিস।”
কুকুরছানার ল্যাজটা ধরে
করলে নাড়াচাড়া;
বললে আমায়, “ক্ষমা করো,
যাবার আছে তাড়া।”

তখন পষ্ট বোঝা গেল,
নেই মনে আর নেই।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই—
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি;
কুকুরছানার ল্যাজের দিকে
পড়ত নাকো দৃষ্টি।
সেই সেদিনের সহজ রঙটা
কোথায় গেল ভাসি;
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রুজ-মাখানো হাসি।
বুটসুদ্ধ পা-দুখানা
তুলে দিলে সোফায়;
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে
ঘা লাগালে খোঁপায়।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কূলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে।

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার।

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ ১৩৪৭

তুমি

ওই ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত।
দশটা বাজল তবু আস নাই;
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই;
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও।
কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয়।
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি,
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি;
বয়স হয়েছে আশি, তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও।

আমার হতেছে মনে বিশ্বাস—
সকালে ভুলালো তব নিশ্বাস
রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা,
শুনতে পাও নি তাই ঘণ্টা।

শুঁটকিমাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া।
আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে।
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।

কাঁকড়ার চচ্চড়ি ম্রদ্যে,
এ'টো তারি পড়ে আছে পাত্রে।
'সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরালো ছবি' ব'লে রাগ' যে।

যত দেরি হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
অতিশয় খ্তখ্তে রীতিটা।
সাফ্‌সোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতিমাত্র—
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বিড়িটানা শহুরে
যে চাল ধরেছ আটপহুরে,
মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।

শান্তিনিকেতন
৪ অগস্ট ১৯৪০

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হত একাকার।
প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।
সৃষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো-আঁধার 'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।

বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎকণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি-চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।
বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস, ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্‌পেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গদ্য কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সন্ধ্যা
১৯ জানুয়ারি ১৯৪১

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী!
যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি।
মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
আমারি লেখার ঘরে আজি তার শ্রাদ্ধ কি!
যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—
আমারি চরণজাত তাহাদের খাদ্য কি!
বাঁশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-জোড়া পাখ সে-
দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাদ্য কি।
আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
মশারি দিনের বেলা কভু আচ্ছাদ্য কি!
গাল তারে মিছে দিই অতি অশ্রাব্য,
হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—

এ কাজে লাগাব শেষে চটি-জোড়া পাদ্য কি।
পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনেরো মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি।

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা-
জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা!
কী হল যে দশা—
মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
হয়ে গেছি মশা।
দীন হতে দীন আমি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ—
একমাত্র নাম জপ করেছি ভরসা।
হিংস্র নীতি নাহি আর,
অতি শান্ত নির্বিকার
ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—
কী হল যে দশা!

মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা,
হেন হীন দশা।

জোড়াসাঁকো
৩০।১০।৪০

আকাশপ্রদীপ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
কল্যাণীয়েষু

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।
মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু-আঁধার বিদায়-রাতের শেষে
যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশপানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

[শান্তিনিকেতন]
২৪।৯।৩৮

ভূমিকা

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।
এই দাবি
জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন্ত্র পড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
'রহিল' বলিয়া, যায় অদৃশ্যের পানে;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।
আমি বন্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয় দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা বলে মানি।

[শান্তিনিকেতন]
১৬।৩।৩৯

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
কতক জলের ধারা, আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।
শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
হালকা করে বুঝিয়ে সে দেয় কই।
বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই,
কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগী তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।
অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল, রইনু বসে চুপ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।
সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন মানিকটার।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।

[আলমোড়া]
৯।৬।৩৭

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়া গাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্ত বর্ষার।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সঙ্গ-রহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।

পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম;
হয়তো সে আদিম প্রাণের .
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে.
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিত গতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্‌বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান;
নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ;
গাছের স্বরূপ
সহজে অন্তর মোর করিত পরশ।
অনাদৃত সে বাগান চায় নাই যশ
উদ্যানের পদবীতে।
তারে চিনাইতে
মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো।
যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে।

কুলগাছ দক্ষিণে কুয়োর ধারে,
পূব দিকে নারিকেল সারে সারে,
বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা

কবে যত্নে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো। বাঁধানো চাতাল;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে।
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনী-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গিতে।
সদ্য ঘুম থেকে জাগা
প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাত না কিছুতেই।
কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,
কেবল চড়ুই,
আর ছিল কাক।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত। দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গি, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে,
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে—
এ রিক্ত বাগানটিরে দিয়েছিল বিশেষ কী দাম।
দেখিতাম, আবছায়া ভাবনায় ভালোবাসিতাম।

[শান্তিনিকেতন]
১৪।১০।৩৮

ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে
নির্জন দুপুরে,

রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারি ধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ওপাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহ কোলাহলে
মনেরে জাগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক ঊর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতিহাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ
পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে।
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বাহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে

যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ
কভু মৃদুবেগে ধীরে,
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।

চোখে দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল যেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

[শান্তিনিকেতন]
২১।১০।৩৮

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—'বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র-আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,

সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলাল। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা;
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।
অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।
অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগালো হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
'তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।'
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে

অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

[শান্তিনিকেতন]
২৫।১০।৩৮

জল

ধরাতলে
চঞ্চলতা সব আগে নেমেছিল জলে।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্‌বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
নৃত্যহীন ঔদাসীন্যে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার।
গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বরনের মানা।
ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তব্ধ সময়।
হোথা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া
ইতিহাস-পলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানামতো।
উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মানিকদর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।
তার পরে মনে হল একদিন,

সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,
বন্দী তারা যারা পায় নাই।
এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই
ভূমির নিষেধগণ্ডি হতে পার।
অনাত্মীয় শত্রুতার
সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
জলে আর তীরে
আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।
আঁকিড়িয়া সাঁতারের ঘড়া
অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে।
পুলকিত সাবধানে
নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
ধরিত জড়ায়ে।
হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
দেহময়
রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে।
এক দিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
অন্য দিকে দূর নিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।
সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়;
তার পরে দেখিলাম এ পুকুর এও বাতায়ন,
এক দিকে সীমা বাঁধা অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।
করিয়াছি পারাপার
যত শত বার
ততই এ তটে-বাঁধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি ক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়,
গেছে চলি ভয়।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।১০।৩৮

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকাল বেলার রোদে বাদাম গাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্ম স্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতি মৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
এক পাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেশনের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে

মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত পায় নাই লাজ।
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, 'জানি হাত দেখা',
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিল রেখা—
বলেছিল, 'তোমার স্বভাব—
প্রেমের লক্ষণে দীন।' দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩১।১০।৩৮

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে
যাক গে সে কথা যাক গে

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্ গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন
এ ছল কিসের জন্য।
পরিতাপে জ্বলি' আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদিনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।
বলি আরবার এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,
আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
আমারে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।

ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।
দুখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন।
দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি।
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

[শান্তিনিকেতন]
২৯।১১।৩৮

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারই মতো।

পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা
চোখে পড়ে পড়েও না;
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো, সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি শাড়ি ভুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,
আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু ষোলো আনা নাই।

থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজপত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেন্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ। ল্যাভেন্ডার
শিশিভরা রোদ্দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আল্মারিভরা বই আছে;
ওরা বারো আনা
পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিনু কোনো-এক কালে;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন,
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।
দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,

ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন; ঝাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১১।৯।৩৮

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।
হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী,
ছিল অনেক গুণী।
কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
ভাঙল দ্বিধার বাঁধ,
সমস্বরে জাগল সাধুবাদ।
উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
মণিমালার মান,
স্বয়ং রাজার দান।
রাজধানীময় যশের বন্যাবেগে
নাম উঠল জেগে।

দিন ফুরাল। খ্যাতিক্লান্ত মনে
যেতে যেতে পথের ধারে
দেখল বাতায়নে,
তরুণী সে, ললাটে তার
কুঙ্কুমেরই ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা।
সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।
বিকেল বেলার রোদ্দুরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ওই তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি।

মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বাক্যের অতীত।

ওই যে বাকলখানি
রয়েছে ওর পর্দা টানি
ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
বলা-কওয়া কী হয় দিনে রাতে,
পরের মনের স্বপ্নকথার সম
পৌঁছবে না কৌতূহলে মম।
দুয়ার-দেওয়া যেন বাসরঘরে
ফুলশয্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
অনুমানেই জানি,
আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী।
ফাগুন আসে বছরশেষের পারে,
দিনে দিনেই খবর আসে দ্বারে।
একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো,
স্নিগ্ধ আলো
এ অঘ্রানের শিশির-ছোঁয়া প্রাতে,
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে
শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে,
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

জাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লাল্‌চে কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।
ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্‌ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে একসমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।
কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,
সকালবেলার ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

এই যে বহায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগ্‌লাঝোরা,
কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথাটাই ভাবি।

এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুলদেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
এ তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেইমতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্‌ সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙিমায়
তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড়-করা ওই শালিখগুলির নাচে।
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে।
তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত,
প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি,
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত-অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে।
দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা—
যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়,
অসীমতার মিথ্যা পরাজয়।

তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৬।১২।৩৮

বেজি

অনেকদিনের এই ডেস্কো—
আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।
যমজ সোদর ওরা যে সব লেখার—
ছাপার লাইনে পেল ভদ্রবেশে ঠাঁই,
তাদের স্মরণে এরা নাই।
অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, পদকল্পতরু,
ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,
এগুলোর একপাশে চা রয়েছে ঢাকা
পেয়ালায়, মডার্ন্ রিভিয়ুতে চাপা।
পড়ে আছে সদ্যছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায়।
বেলা যায়,
ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,
বৈকালী ছায়ার নাচ
মেঝেতে হয়েছে শুরু, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা।
খাতাখানি আছে খোলা।—
আধঘণ্টা ভেবে মরি,
প্যান্থীজ্‌ম্ শব্দটাকে বাংলায় কী করি।

পোষা বেজি হেনকালে দ্রুতগতি এখানে সেখানে
টেবিল-চৌকির নীচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধানে-
দুই চক্ষু ঔৎসুক্যের দীপ্তিজ্বলা,
তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা
দামি দ্রব্য যদি কিছু থাকে,
ঘ্রাণ কিছু মিলিল না তীক্ষ্ন নাকে
ঈপ্সিত বস্তুর। ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে,
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরসুলার খোঁজ নেই ব'লে।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যান্থীজ্‌ম্‌ শব্দটার বাংলা বুঝি নেই।

[শান্তিনিকেতন]
৪ অক্টোবর ১৯৩৮

যাত্রা

ইস্‌টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই,
স্পষ্ট মনে নাই।
উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে।
পাশাপাশি তারি
আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিত্তিত।
সরকারী যা আইনকানুন তাহার যাথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা,
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা
ভিন্ন ভিন্ন চাল।
অদৃশ্য তার হাল,
অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,
সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই।
প্রত্যেকেরই রিজার্ভ-করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র;
দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র
মুক্ত চোখের 'পরে
সমান সবার তরে,
তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গ-তর্জনীতোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে। ডিনার টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে,
তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
ইলেক্‌ট্রিকের আলো-জ্বালা কক্ষমাঝে
একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই মেশা
চক্ষু কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা
কিছুক্ষণের তরে
মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে।
চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
বুদ্‌বুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত।
বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়,
ফেনিল সুনীল তেপান্তরে মরণ-ঘেরা ভয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নীচে।
খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবাঁকে
কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে।
কোথাও দেখি সেলুনঘরে ঢুকে,
ক্ষুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনায়-মগ্ন মুখে।
হোথায় রান্নাঘর,
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।
গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
স্নানের ঘরে জায়গা পাবার ত্বরা।
নীচের তলার ডেকের 'পরে কেউ বা করে খেলা,
ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
বুকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিদ্রা যায়,
পায়চারি কেউ করে ত্বরিত পায়।
স্টুয়ার্ড হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।
আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন ঘরের পথ
নেহাত থতোমতো।
সে শুধাল, নম্বর তার কত।
আমি বললেম যেই,
নম্বরটা মনে আমার নেই—
একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
ঘেমে উঠি উদ্‌বেগে আর লাজে।
আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে।
যেটাই দেখি মনেতে হয় এইটে হতে পারে,
সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে।
ভাবছি কেবল কী যে করি, হল আমার এ কী—
এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি,
নিছক স্বপ্ন এ যে,
এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে-যে।

গভীর রাত্রি; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সার্সি,
রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাঁশি।

[শান্তিনিকেতন]
২৬। ২। ৩৯

সময়হারা

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার-গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই।
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।
হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই,
ইচ্ছে করে পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুক-পোড়া, একলা কঠিন ভুঁয়ে
চ্যাটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন-মনে—
'উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।'
আমার চেয়ে কম ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিষ্ফল।
কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর,
শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, 'সাঙাত মোর,
আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে যাকে দাওয়াই?'
নেই কিছু তো, দু-এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্যমনা;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা
সেই দালানের বাহির ঝোপে;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্‌ বকম্‌।
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম-রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি।
ছাতিম গাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি
শঙ্খমণির খালে,
মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কালে

তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো।
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি, কাৎলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ঝাউগুঁড়িটার 'পরে
কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।
আঁধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কল্মিদিঘির ডাঙা পাড়ির থেকে।
পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান হঠাৎ ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে।
বাদুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে মনে,
ঝড়েতে কাত জারুলগাছের ডালে ডালে
পিরভু নাচে হাওয়ার তালে।

•

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে ব'লেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
শজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে,
গোধূলিতে সূর্যিমামার বিয়ে,
মামি থাকেন সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে ব'লেই জানার সুযোগ হল,
'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ওই যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুক্‌রো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে;

আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে।
আগে ছিল সাটন্ বীজে বিলিতি মৌসুমি,
এখন মরুভূমি।
সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলই ঘেউ ঘেউ
লাগায় আমার দ্বারে; আমি বোঝাই তারে কত
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু,
শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
জানিয়ে দিলে লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটার 'পরে
অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।
সময় আমার গিয়েছে তাই, গাঁয়ের ছাগল চরাই,
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে।
ওরই ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুইপাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা।

সন্ধে নামে পাতাঝরা শিমুলগাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পসটারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,
'ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম বায়না-নেওয়া
খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে;
আজ চেয়ে দেখ্, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে।

সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি নেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা।
ওই যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চ্যাটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা,
ওই যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি,
এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি।
পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পাল্‌কি আনে, শব্দ কি পাস তাহার।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে।
কী জানি বা ভাগ্যি তোমার ভালো,
বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক রাজ্যসুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল পাঁজি ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।'

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র,
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
১।১।৩৯

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম,
চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট ক'রে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।
রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে
কী আছে কে জানে।

জীবনের যে সীমায়
এসেছ গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙ্গ উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে
না ভাবিয়া আগুপিছু।
কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু।
হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্রডালে
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতামন্থর,
তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অন্তিম চাঁপায়
মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
নিকুঞ্জের ম্লান মৃদু ঘ্রাণে,
সেই ঘ্রাণ একদিন পাঠায়েছ প্রাণে,
তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
জাগায়ে দিয়েছে নামখানি।
সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারি দিকে,
ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব শেষ দেখা।
সেই দেখা মম
পরিস্ফুটতম।
বসন্তের শেষমাসে শেষ শুক্লাতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,
উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অন্তে চিন্তা ক'রে বলা,
দাম্ভিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা,
বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই।
জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
যেমন চমকি জেগে উঠে
সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,
সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তুলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা।
পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী,
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি;
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারি পাশে,
কুমোরের ঘুর-খাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে।
বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে;
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্তস্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত
ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘূর্ণিবায়ে ঘুরি ঘুরি,
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী।

[শান্তিনিকেতন]
[২১ চৈত্র] চৈত্রপূর্ণিমা। ১৩৪৫

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগ্‌নি সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্‌ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্‌ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।

হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি—
কদিন হল জানি নে কোন্‌ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্‌ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

শান্তিনিকেতন
২৮।৩।৩৯

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারুময়ী কায়া,
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্‌ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।

নিশ্চিত পেয়েছি ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,
মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি-অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সে-ই কাছের পাওয়ারে,
পূর্ণ করে তারে।

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা
উচ্চতত্ত্বে ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।
হায় রে, দুর্গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝক্‌ঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, 'তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব-কটা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো, অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।'
আমি শুধালেম, 'আর তোমাদের?'
সে কহিল, 'আমাদের চারি দিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জান।'
আমি শুধালেম, 'তার মানে?'
সে কহিল, 'আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,
কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।'
কহিলাম হাসি,
'আমি যাহা বলেছিনু সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।'
সে কহিল একটুকু থেমে,
'নেই বলিলেই হয় এ কথা নিশ্চিত।
জোর করে বলিবই
আমরা কাঙাল কভু নই।'
আমি কহিলাম, 'ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের জিত।'

'কেন শুনি'
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, 'যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে ভাগ করা সে কি সাদা কালো।
ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।

এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই
তোমরা ভোল না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু কয়ে,
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ—
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া,
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।'

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।

পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
বলে গেল, 'ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।'

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে।
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান।

[এপ্রিল ১৯৩৯]

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
সকালে বসি চাতালে।
অনুকূল অবকাশ;
তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে।
লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস।

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বে-দরদী শাসনকর্তা বাঁধন হাতে।
বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে ঝুলে,
নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
একটা একলা কুড়চিগাছ
আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে।
প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে
ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।
তার উদাসীন দৃষ্টি
কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা লেখায়;
করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা,
তা হলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।
হাসি পেল ওর ওই গম্ভীর উপেক্ষায়,
ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।

দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য
সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,
তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।
ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।
কিন্তু ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দাম যাবে না কমে।
আর মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে;
খাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো।
ভাবলুম আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তা হলে পর্শুদিনের অন্ত্যসংকার এগিয়ে রাখব মাত্র।

এমন সময় আওয়াজ এল কানে,
'দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি।'
ওই এসেছে, ময়ূর না,
ঘরে যার নাম সুনয়নী,
আমি যাকে ডাকি শুনায়নী ব'লে।
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি সকলের আগে।
আমি বললেম, 'সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।'
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, 'আচ্ছা তাই সই।'
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে,
বললে, 'তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।'
ব'লে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, 'কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে।'

সে বললে, 'অকবির মতো হল তোমার কথাটা;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।'
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে।

মনে মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারি উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য।

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

[এপ্রিল ১৯৩৯]

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে।
যখন দেখলুম অস্থির ব্যগ্রতায়
হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে—
তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম
বদল হয়েছে পালের হাওয়া।
পুব দিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল।
সেদিন গেছে যেদিন দৈবে পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি,
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি,
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।
পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।

কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
চার দিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে;
ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
ঝাড়ে লণ্ঠনে।
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।
কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়
আলতা-পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না,
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।
তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সংগে।
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত;
কিন্তু ভ্রূকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না আমি ছেলেমানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।
তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।
তা হোক কিন্তু এ কথা মানি
আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি।
মন একান্তই চাইত ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।
একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
কতকগুলো রঙিন পুঁথি:
ভাবলে চমক লাগিয়ে দেবে।
হেসে উঠল সে, বলল,
‘এগুলো নিয়ে করব কী।’
ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্র্যাজেডি
কোথাও দরদ পায় না,
লজ্জার ভারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
দেয় মাথা হেঁট ক'রে।
কোন্ বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।
তবু এরই মধ্যে দেখা গেল সস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ওই উচ্চাসনার,
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।

প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।
গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে খায়
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।
একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আমি কুড়িয়ে এনেছিলুম,
ও বলল, 'কে বলেছে তোমাকে আনতে।'
আমি বললুম, 'কেউ না।'
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে;
সে বললে, 'এমন ক'রে ফল আনতে হবে না।'
চুপ করে রইলুম।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে,
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

[শান্তিনিকেতন]
৮।৪।৩৯

নবজাতক

সূচনা

আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায় সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চার দিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম কারণ দেশবিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।

উদয়ন
৪ এপ্রিল ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবজাতক

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা-সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিতেছে আনি।

শান্তিনিকেতন
১৯ অগস্ট ১৯৩৮

উদ্‌বোধন

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণ-যুগপ্রভাতের রবি।

গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে।

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনী সংগীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বন-নীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
দূর-আকাশের অরুণিম উৎসবে।

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

শেষদৃষ্টি

আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে।
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের দুয়ার খুলি,
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষ তুলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়
সন্ধ্যার রঙগুলি।

যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,
অস্তরবির দেহলি দুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মুলতান রাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি।

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
বিষাদ-করুণ শিল্পছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন।

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়।
মরণপরশে আজি কুণ্ঠিত,
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয়।

যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী।

সেঁজুতি। শান্তিনিকেতন
১২ জানুয়ারি ১৯৪০

প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্‌গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ন দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

ওই দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।

দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

উদয়ন
বিজয়াদশমী
[১৭ আশ্বিন] ১৩৪৫

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।

আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস,
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি ১৯৩৮

কেন

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদীতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির-মণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্য-জগতে
ভেসে চলে সুখদুঃখ কল্পনা ভাবনা কত পথে।
কোথাও বা জ্বলে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্বুদপুঞ্জ বহি।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যুতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু কেন।

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—
শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন.
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবসনিশার
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্যকলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা

সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার,
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন।
কিন্তু কেন।

শান্তিনিকেতন
১২ অক্টোবর ১৯৩৮

হিন্দুস্থান

মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
তাণ্ডবের তালে তালে,
দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীরঝংকার আর দূরে শকুনির ধ্বনি-সাথে
কালের মন্থনদণ্ডঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
অদৃষ্টের অট্টহাস্য অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে।
লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা
জটিল রেখার জালে শুভ-অশুভের আল্‌পনা।
নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।
প্রাঙ্গণপ্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
দস্যুদল,
অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল,
করেছে আসন-কাড়াকাড়ি,
ক্ষুধিতের অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি।
রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়—
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর

প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত;
সেথা জয়ী আর পরাজিত
একত্রে করেছে অবসান
বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান।
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

শান্তিনিকেতন
১৯ এপ্রিল ১৯৩৭

রাজপুতানা

এই ছবি রাজপুতানার;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিষহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।
ওই তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ওই তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অন্তরে
গ্লানি অনুভব নাহি করে,
আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাসে—
জানে না সে
পরিপূর্ণ কত শতাব্দীর পণ্যরথ
উত্তীর্ণ না হতে পথ
ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে,
ম্রিয়মাণ আলোকের প্রহরে প্রহরে
বেড়িয়াছে অন্ধ বিভাবরী
নাগপাশে, ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি
একমাত্র শান্তি তাহাদের।
লঙ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের
অন্তিম নিষেধসীমা—
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহীন প্রচ্ছন্ন মহিমা;
জেগে থাকে কল্পনার ভিতে

ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে।
কিন্তু এ নির্লজ্জ কারা! কালের উপেক্ষাদৃষ্টি-কাছে
না থেকেও তবু আছে।
একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা।
হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে,
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।
এ দিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।
শেষের পঙ্‌ক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড-উদ্ধারের শেষ হবে পালা,
যন্ত্রের কিঙ্করগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন।
উদাত্ত যুগের রথে বল্গাধরা সে রাজপুতানা
মরুপ্রস্তরের স্তরে একদিন দিল মুষ্টি হানা,
তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা-ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল; তারি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে,
সে যুগের সুদূর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি এই কৃপণ কালের দৈন্যপাশে
জর্জরিত নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে
গলবন্ধ পশুশ্রেণীসম চলে দিন পরে দিন
লজ্জাহীন।
জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল, তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া। নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা
মনে হয় সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ

নহে তো সহজ, মৃত্যুর বেদীতে যার কোনো দান
নাই কোনো কালে, সেই তো দুর্ভর অতি,
আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্‌ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

মংপু
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ,
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্বদিগন্তের কাছে।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।
ভগ্ন গৃহে লগ্ন ওই অর্ধেক প্রাচীর;
আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল।
আকাশে তাকায় শিলালেখ,
তাহার প্রত্যেক
অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে
ক্লান্ত সুরে প্রশ্ন করে
আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা,
শেষ হয়ে যায় নি বারতা।

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তি-'পরে
করে আছে চুপ

অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার অসম্পূর্ণ রূপ।
অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারি ভিতে
নীরবতা-উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক।
একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত,
অন্য পথে গেছে অকস্মাৎ
তাদের চকিত আশা,
স্থগিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয় নি চলা সারা,
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা।
আজিও কালের সভামাঝে
তাদের প্রথম সাজে
পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো তাই
সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হতে,
শৈবালে ঢাকে নি তারে বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে,
স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ,
কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ
তারে নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল,
না দেয় নীরস হতে মজ্জাগত গুপ্ত অশ্রুজল।
যাত্রাপথ-পাশে
আছ তুমি আধো-ঢাকা ঘাসে,
পাথরে খুদিতেছিনু, হে মূর্তি, তোমারে কোন্ ক্ষণে
কিসের কল্পনে?
অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর।
মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি,
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।
সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্ম-মাঝে রয়েছে আমার,
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।

আলমোড়া
১৬ মে ১৯৩৭

ভূমিকম্প

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে—
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখ
আঁচলতলে যেথায় ঢাক
কঠিন লোহ, মৃত্যুদূতের চরণধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির।

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্ত্যে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায়।

অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।
যে বিশ্বাসের আবাসখানি
ধ্রুব বলেই সবাই জানি
এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে।

বিপুল প্রতাপ থাক্-না যতই বাহির দিকে
কেবল সেটা স্পর্ধাবলে রয় না টিঁকে।
দুর্বলতা কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে
হঠাৎ কখন দিগ্ব্যাপিনী কীর্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো।

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার
যুগে যুগে উদ্ঘাটিলে সামনে সবার।
জাগল দম্ভ বিরাট রূপে,
মজ্জায় তার চুপে চুপে
লাগল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্বনাশা,
রূপক নাট্যে ব্যাখ্যা তারি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায়।

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে
সেই তো ভীষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা।

৬ চৈত্র ১৩৪০

পক্ষীমানব

যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি।
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি।

বিধাতার দান পাখিদের ডানাদুটি—
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথী।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা একজাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা,
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা;
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে।

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্বতে;
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা-পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করে নি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করে নি তপন
মানে নি তাহারে চাঁদ।

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশ স্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

আহ্বান

কানাডার প্রতি

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে,
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগ-যুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানব পদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে,
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে ভুলো না আপনায়।

মিথ্যা দিয়ে চাতুরি দিয়ে রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১ এপ্রিল ১৯৩৯

রাতের গাড়ি

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি,
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।
অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর-তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।
চালায় যে নাম নাহি কয়,
কেউ বলে যন্ত্র সে আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বার বার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ ১৯৪০

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে,
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসি-তামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়,
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্যভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী
যেমনই তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্‌কার প্রাণে
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহ বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি,
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দমহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভনিশ্বাসে।

শান্তিনিকেতন
৮ জুলাই ১৯৩৮

অস্পষ্ট

আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি,
উপছায়া-চলা বনে বনে মন
আবছা পথের যাত্রী।
ঘুম-ভাঙানিয়া জোছনা
কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে
একটুকু কাছে বোসো-না।
ফিস্‌ফিস্‌ করে পাতায় পাতায়,
উস্‌খুস্‌ করে হাওয়া।
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।
চন্দনিদহে থৈ থৈ জল
ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে আলোতে,
জামরুলগাছে ফুলকাটা কাজে
বুনুনি সাদায় কালোতে।
প্রহরে প্রহরে রাজার ফটকে
বহু দূরে বাজে ঘণ্টা।
জেগে উঠে বসে ঠিকানা-হারানো
শূন্য-উধাও মনটা।
বুঝিতে পারি নে কত কী শব্দ,
মনে হয় যেন ধারণা
রাতের বুকের ভিতরে কে করে
অদৃশ্য পদচারণা।
গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে
তন্দ্রা তারায় তারায়,
কাছের পৃথিবী স্বপ্নপ্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।
রাতের পৃথিবী ভেসে উঠিয়াছে
বিধির নিশ্চেতনায়,

আভাস আপন ভাষার পরশ
খোঁজে সেই আনমনায়।
রক্তের দোলে যে-সব বেদনা
স্পষ্ট বোধের বাহিরে,
ভাবনাপ্রবাহে বুদ্‌বুদ তারা
স্থির পরিচয় নাহি রে।
প্রভাত-আলোক আকাশে আকাশে
এ চিত্র দিবে মুছিয়া,
পরিহাসে তার অবচেতনার
বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া।
চেতনার জালে এ মহাগহনে
বস্তু যা-কিছু টিঁকিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল
জাগ্রত সেই প্রাপণার
প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রঙ রেখে যাবে আপনার।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে
চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া,
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৭ মার্চ ১৯৪০

এপারে-ওপারে

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে-আড়ে কাছে-কাছে।
যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।

অকারণে হাত ধরে;
যে যাহারে চেনে,
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে
কথা-কাটাকাটি চলে, গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।
পরস্পরে দেখা হয়,
বাঁধা ঠাট্টা করে বিনিময়।
কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে
হেসে ওঠে অহেতু কৌতুকে।
'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে,
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।
পথপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে বসি
ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো-হাতে দর-কষাকষি।
একই সুরে দম দিয়ে বার বার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটারি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ-ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাস-পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চীৎকার।
যেদিন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে জামাই উদয় হয় আসি,
মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি,
টেপাটেপি, কানাকানি,
অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি।
দেউড়িতে ছাতে বারান্দায়
নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়।

হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।
অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে
দিনে রাত্রে কাজের আভাসে।
উঠোনে অনবধানে-খুলে-রাখা কলে
জল বহে যায় কলকলে;
সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁৎসেঁতে।

বেলা হলে ওঠে ঝন্‌ঝনি
বাসন মাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘর-করনার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।
কড়ায় সর্ষের তেল চিড়্‌বিড়্‌ ফোটে,
তারি মধ্যে কইমাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক্‌ করে ওঠে।
বন্দেমাতরম্‌-পেড়ে শাড়ি নিয়ে তাঁতি বউ ডাকে
বউমাকে।
খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ আঙিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্‌চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
দুইবার জোয়ার-ভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।
হোথা পড়ামুখস্থের একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,
এগ্‌জামিনেশনে দেয় তাড়া।

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গিতে ওরা মেশে।
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।
রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
মনের ধূসর কূলে
প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।
চারি দিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝক্‌ঝক্‌ করে
রিক্তরস উদ্দীপ্ত প্রহরে।
ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা,
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল

ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।
তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে ক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

পুরী
২০ বৈশাখ ১৩৪৬

মংপু পাহাড়ে

কুজ্‌ঝটিজাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর-পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এল গেল, ম'ল এরি মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা-কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ওই ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নীচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও' মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানাপাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে
রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজি তো বয়স তার কেবল আটাত্তর,
সাতের পিঠের কাছে একফোঁটা শূন্য,
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।
ছোটো আয়ু মানুষের, তবু একি কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রহ্মাণ্ড;

কত সুখে দুঃখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভা-সজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি,
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি'।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি'
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু অঙ্গনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য,
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারি কী লোকসান যদি হই শূন্য,
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চিরদিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি,
বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি।

মংপু
১০ জুন ১৯৩৮

ইস্‌টেশন

সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল্‌ করে তার
শেষ মিনিটের দোষে।

দিনরাত গড়্‌গড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌,
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে, কভু পূর্বে।

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্যমেলার নিত্যভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে
ভিড় জমা হয় কত,
পতাকাটা দেয় দুলিয়ে
কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখ দুঃখ
ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।

সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই,
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই।

ওদের চলা ওদের পড়ে থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে
কেবল ছবি আঁকায়।
খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে
তার পরে যায় মুছে,
আত্ম অবহেলার খেলা
নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে
পথের প্রান্ত জুড়ে,
তপ্তদিনের ক্লান্ত হাওয়ায়
কোন্‌খানে যায় উড়ে।
'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুক্‌রে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা,
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়
দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ওই,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ওই।

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই ১৯৩৮

জবাবদিহি

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কী মনের ভুলে
পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
শেষ প্রহরের রঙহরণের পালা।

ওরে কবি ভয় কিছু নেই তোর
কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা ফাল্গুনী,
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা সন্ধানে
অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ বয়সের কালো
করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবনদীপ, জাগাবে তার আলো
ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে।

উদয়ন
২৮ মার্চ ১৯৪০

সাড়ে নটা

সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে;
সকালের মৃদু শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
পাহাড়ের উপত্যকা-নীচে
বনের মাথায়
সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।
বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
সমুদ্রপারের দেশ হতে
আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে,
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে
বহু যোজনের অন্তরালে।
সব তার লুপ্ত হয়ে মিলেছে কেবল সুরে তালে।
দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।
যে বেলাটি বেয়ে
এল তার সাড়া
সে আমার দেশের সময়-সূত্র ছাড়া।
একাকিনী, বহি রাগিণীর দীপশিখা
আসিছে অভিসারিকা

সর্বভারহীনা,
অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীনা।
গিরিনদী সমুদ্রের মানে নি নিষেধ,
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব,
পদে পদে জন্ম মৃত্যু বিলাপ উৎসব।
রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।
যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্বের মুখরতা
উহার শ্লোকের পথে স্তব্ধ করে দিল সব কথা।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৯

প্রবাসী

হে প্রবাসী,
আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী
অন্তরতমের ভাষা
সে করে বহন। ভালোবাসা
তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দূর।
রক্তের নিঃশব্দ সুর
সদা চলে নাড়ীতন্তু বেয়ে
সেই সুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে
বাণীর অতীতগামী তাহারি বাণীতে
ভালোবাসা আপনার গূঢ় রূপ পারে যে জানিতে।

হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্যদান চিরসুন্দরের,
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ,
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক—এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।

সুদূরের মিতা
মোর কাছে চেয়েছিলে নূতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নূতনের স্পর্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে।

[পুরী]
৯ বৈশাখ ১৩৪৬

জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসার-খেলার কক্ষে তাঁর
যে খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেকতরে অমরের ভান,
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি
মুঠি-কয় ধূলি রয় বাকি,
আর থাকে কালরাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে-মুছে-ফেলা।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে।
এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে
সে কথাই ভাবি আজ মনে।

পুরী
২৫ বৈশাখ ১৩৪৬

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

আপনার পানে চাই
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া,
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষকথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ওই নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮

রোম্যান্টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে।
দুয়ার বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তবনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে

নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে
ছন্দ তাহে থাকে
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে, 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'
যেথা ওই বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরী বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।

ক্যান্ডীয় নাচ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যান্ডিদলের নাচ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এল মুক্তি-মাতাল খ্যাপা
হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা।

ডালপালা সব দুড়্দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেশ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন,
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুন্দরের ঢেউ,
'আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ।'
ঝঞ্ঝা ওদের বলেছিল, 'মঞ্জীর তোর আছে
ঝংকারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয়নাচে?'
ওই যে পাগল দেহখানা, শূন্যে ওঠে বাহু,
যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু,
লুব্ধ তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে,
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জ্বলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নির্দয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহ-মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়,
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

অব্যক্ত

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি,
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,
কোন্ সৎকারে করি তার সদ্গতি।

কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়,
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।
লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'
ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা,
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হলে
চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,
অঘ্রান তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে।
পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুঁটি চেপে।
জোড়হাত করে আমি বলি, 'শোনো কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরই ব্যগ্রতা,
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে,
জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,
ভূতত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।'
বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা,
প্রুফশিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।
দাগী যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি,
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা

জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি,
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক;
কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূরে চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাথায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

চন্দননগর
৫ জুন ১৯৩৫

শেষ হিসাব

চেনাশোনার সাঝবেলাতে
শুনতে আমি চাই
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন ভাই।
দুর্গম পথ ছিল ঘরেই,
বাইরে বিরাট পথ,
তেপান্তরের মাঠ কোথা বা
কোথা বা পর্বত।
কোথা বা সে চড়াই উঁচু,
কোথা বা উৎরাই,
কোথা বা পথ নাই।
মাঝে মাঝে জুটল অনেক ভালো,
অনেক ছিল বিকট মন্দ,
অনেক কুশ্রী কালো।
ফিরেছিলে আপন মনের
গোপন অলিগলি,
পরের মনের বাহির দ্বারে
পেতেছ অঞ্জলি।
আশাপথের রেখা বেয়ে
কতই এলে গেলে,
পাওনা ব'লে যা পেয়েছ
অর্থ কি তার পেলে।

অনেক কেঁদে কেটে
ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে
অনেক রাস্তা হেঁটে।
পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,
উজাড় করে নিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা।
অতি কঠিন আঘাত তারা
লাগিয়েছিল বুকে,
ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে
সে-সব গেছে চুকে।
হাটে বাটে মধুর যাহা
পেয়েছিলুম খুঁজি,
মনে ছিল যত্নের ধন
তাই রয়েছে পুঁজি।
হায় রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি,
তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি।
নিষ্ঠুর যে, ব্যর্থকে সে
করে যে বর্জিত,
দৃঢ় কঠোর মুষ্টিতলে
রাখে সে অর্জিত
নিত্যকালের রতন কণ্ঠহার;
চিরমূল্য দেয় সে তারে
দারুণ বেদনার।
আর যা-কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে চলার মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে।

শান্তিনিকেতন
ডিসেম্বর ১৯৩৮
পুনর্লিখন : শ্রীনিকেতন
৭ জুলাই ১৯৩৯

সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গণিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার

চির নববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।
অবগুণ্ঠনের অলক্ষিতে
তার দূরে পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী,
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

[২০-২২ মে ১৯৩৭]

জয়ধ্বনি

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বারবার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি বারবার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে;
বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ;
বারবার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটি নি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,

গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে,
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর ১৯৩৯

প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে,
শেলফের 'পরে
মেলেছে নিঃস্পন্দ দুটি ডানা—
রেশমি সবুজ রঙ তার 'পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা,
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত বৃথাই।

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্বমাঝে।
প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা, তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।

পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ,
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়,
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।
আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে।
কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে,
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ ১৯৩৯

প্রবীণ

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায় শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা।

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে,
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।

দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন কণ্ঠে লাগায় সুর
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।
রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে, বয়স হবে বোঝা।

ওগো তুমি কী করছ ভাই স্তব্ধ সারাক্ষণ,
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে,
মরচে-পরা লাগল তালা বন্ধ একেবারে।
ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির,
বাইরে এসো বাইরে এসো পরমগম্ভীর।
কেবলি কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও।
আশি বছর বয়স হবে ওই-যে পিপুল গাছ,
এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?
পাতায় পাতায় আবোল তাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
পান্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
ওগো প্রবীণ চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে।

রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভ সৃষ্টিশালে অসমাপ্ত পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো,
আঁধার তাহারে টেনে আনে,
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে
ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।

ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোশ-পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লাল রঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিদ্রূপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে।
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে ব'সে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।
নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
'নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা।'

পুনশ্চ। শান্তিনিকেতন
২৬ জুলাই ১৯৩৯

শেষ বেলা

এল বেলা পাতা ঝরাবারে
শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে।
একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা রঙ-করা।
কুঁড়ি-ধরা ফলে
কার যেন কী কৌতূহলে
উঁকি মেরে আসা
খুঁজে নিতে আপনার বাসা।

ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসব দূতে
এনে দিত পল্লব-পল্লীতে তার
কখনো পা-টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তর বিধাতার সৃষ্টি-নিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকাল,
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তারা
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।
সম্মুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

[শান্তিনিকেতন]
১১ জানুয়ারি ১৯৪০

রূপ-বিরূপ

এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে,
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশা,
কোথাও বা যৌবনের কুসুমপ্রগল্‌ভ বনপথ,
কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।

সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ যা নিষ্ঠুর উৎকট যা করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে,
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গি যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী তোমার করি স্তব,
তব মন্দ্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী-বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

শেষ কথা

এ ঘরে ফুরাল খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
বিলয়বিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনে অন্তরতর।
ক্ষণিক মুহূর্ত-তরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে,
চিনে নিই এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে।
কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই,
মনে মনে ভাবি তাই
বিচ্ছেদের দূর দিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবি রশ্মির রেখায়।

জানি না বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পীকবি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল ১৯৪০

সানাই

দূরের গান

সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
ফেনোচ্ছল সে-নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতি দূর পারে।

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

ওগো দূরবাসী
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।
এ বাঁশি দিবে সে মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।

যেই বাণী অনাদির সুচিরবাঞ্ছিত
তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফাল্গুন ১৩৪৬

কর্ণধার

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে,
অমার আঁধার ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণিমার।
ওগো কর্ণধার
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।

ওগো আমার লীলার কর্ণধার
জীবনতরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় কর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

তাকায় যখন নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দ মৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
স্বপ্নস্রোতে লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
হৃদয়-মাঝে লীলার কর্ণধার
একতারাতে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
গম্ভীর রব উঠে কেঁপে।
সঙ্গবিহীন চিরন্তনের
বিরহ-গান বিরাট মনের
শূন্যে করে নিঃশবদের
বিষাদ বিস্তার।
তুমি আমার লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশগঙ্গার।

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরী
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
ঊর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর, হে মোর কর্ণধার
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।

তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

বিপ্লব

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সিঁথি তব প্রবালে খচিত কণ্ঠহার
অন্ধকারে মগ্ন হল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধহস্তে গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন,
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।
যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি
কম্পিত প্রদীপশিখা-'পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,

বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরই সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে,
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

[শান্তিনিকেতন]
২১ জানুয়ারি ১৯৪০

জ্যোতির্বাষ্প

হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই
এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই।
চিনি আমি সংসারের শত সহস্রেরে,
কাজের বা অকাজের ঘেরে
নির্দিষ্ট সীমায় যারা স্পষ্ট হয়ে জাগে
প্রত্যহের ব্যবহারে লাগে,
প্রাপ্য যাহা হাতে দেয় তাই,
দান যাহা তাহা নাহি পাই।

অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারি দিকে টানি।

নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূর বিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা-মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।
সৌন্দর্যের যে পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

জানালায়

বেলা হয়ে গেল তোমার জানালা-'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকী ডালে ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।
মন্থর পায়ে চলেছে মহিষগুলি,
রাঙা পথ হতে রহি রহি ওড়ে ধূলি,
নানা পাখিদের মিশ্রিত কাকলিতে,
আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে।
পসারী হোথায় হাঁক দিয়ে যায়
গলি বেয়ে কোন্ দূরে,
ভুলে গেছি যাহা তারি ধ্বনি বাজে
বক্ষে করুণ সুরে।
চোখে পড়ে খনে খনে
তব জানালায় কম্পিত ছায়া
খেলিছে রৌদ্র-সনে।

কেন মনে হয়, যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষার ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।
ঘরের ভিতরে যে প্রাণের ধারা চলে
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।
ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জন সুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।
যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রা-অলস
মধ্যদিনের তাপে।

ঘাসের উপরে একা বসে থাকি
দেখি চেয়ে দূর থেকে
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

ক্ষণিক

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশির রাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান।
ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান।
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে,
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলি তারে
পারে না চিহ্ন দিতে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

অনাবৃষ্টি

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।
রসের বাদল নামিল না কেন
তাপের দিনে।
ঝরে গেল ফুল, মালা পরাই নি
তোমার গলে।
মনে হয়েছিল দেখেছি করুণা
আঁখির পাতে
উড়ে গেল কোথা শুকানো যূথীর সাথে।
যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

নতুন রঙ

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জন গীতি।

ফাগুনের চম্পক পরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,

বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

গানের খেয়া

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে
অকারণে
চপল হাওয়া
সুর যায় ভেসে
কার উদ্দেশে।
ওই মুখে চেয়ে দেখি
জানি নে তুমিই সে কি
অতীত কালের মুরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে
যে আসে নি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

অধরা

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দোবন্ধনে।
বলাকাপাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।
গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাস
ওর কাকলিতে মাখা।

শুনে যাও বিদেশিনী
তোমার ভাষায় ওরে
ডাকো দেখি নাম ধ'রে।

ও জানে তোমারি দেশের আকাশ
তোমারি রাতের তারা,
তব যৌবন-উৎসবে ও যে
গানে গানে দেয় সাড়া,
ওর দুটি পাখা চঞ্চলি উঠে তব হৃৎকম্পনে।
ওর বাসাখানি তব কুঞ্জের
নিভৃত প্রাঙ্গণে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

ব্যথিতা

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।
দুঃসহ দুরাশার
গুরুভার যাক দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মসীর তূলিকায়
অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক
স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

বিদায়

বসন্ত সে যায় তো হেসে যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি
ঝলক দেবে হাসিখানি,
অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।

ভাসান-খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে,
একলা ঘাটে রইব চেয়ে।
অস্তরবি তোমার পালে
রঙিন রশ্মি যখন ঢালে
কালিমা রয় আমার রাতের
অন্তরালে।

[১৩৪৬]

যাবার আগে

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই
লহো করুণ করে।

যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমায় স্মরণ করে।

ও হাতখানি হাতে নিয়ে,
বসব তোমার পাশে
ফুল-বিছানো ঘাসে,
কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা।
বউ-কথা-কও ডাকবে তন্দ্রাহারা।

স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে
শিরীষ পাতায় কাঁপবে আলো
নীরব দ্বিপ্রহরে।

[১০৪৬]

সানাই

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে।
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি।
এপাড়া ওপাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে;
বসে পড়ে যে পারে যেখানে,
নিষেধ না মানে।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ,
এ কই ও কই।
রঙিন উষ্ণীষধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।

ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।
সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।
কতবার মনে ভাবি কী যে সে কে জানে।

মনে হয় বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি,
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে

ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
৪ জানুয়ারি ১৯৪০

পূর্ণা

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসারপথে
চরম তিথির শশী।
স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে
বিহ্বল তব রাতে।
ক্কচিৎ চকিত বিহগকাকলি
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি
নব আষাঢ়ের কেতকীগন্ধ-
শিথিলিত নিদ্রাতে।

যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থরথর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছলছল জল
কজ্জল আঁখিপাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

কৃপণা

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।
কালো ছায়াখানি মনে পড়ে গেল আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি অন্তরে ঢাকা,
কলঙ্করেখা যেন
চিরদিন চাঁদ বহি চলে সাথে সাথে।

কেন বাধা হল দিতে মাধুরীর কণা
হায় হায়, হে কৃপণা।
তব যৌবন-মাঝে
লাবণ্য বিরাজে,
লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

ছায়াছবি

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে।

[১৩৪৫]

স্মৃতির ভূমিকা

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি।
সারাবেলা ধরি
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি।
হঠাৎ কী হল মতি
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রুপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়
পাছে ওর জাগাই সংশয়,
ধরা প'ড়ে যায় পাছে, আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।
চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড়;
সম্মুখে পাহাড়

আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা,
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্।
এখনি এ আমার দেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ।
এ চারি দিকের এই-সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক-দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৯

মানসী

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া-'পরে।
হেথা-হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নীচের তলে
ছোলা-খেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সঙ্গে কথা কহি।

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্ণবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।
সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।
শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথীহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে;
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

[মংপু]
৯ জুন ১৯৩৯

দেওয়া-নেওয়া

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান।
সজল ছায়ার অন্ধকারে
ঢাকিয়া তারে
এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান।

আজ এনে দিলে যাহা
হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

সার্থকতা

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে।
ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া,
বেড়াল যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল-সাথে।
অবশেষে রজনীপ্রভাতে
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।
উদ্‌বারিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্‌বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ আশ্বিন ১৩৪৫

মায়া

আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।

স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ-দিয়ে-চলা ধানী রঙ-করা
শাড়ির পরশখানি।

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।
বিরহস্বর্গলোকে
সে জাগরণের রূঢ় আলোয়
চিনিব কি চোখে চোখে।
সন্ধ্যাবেলায় যে দ্বারে দিয়েছ
বিরহকরুণ নাড়া
মিলনের ঘায়ে সে দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া।

কালিম্পঙ
২২ জুন ১৯৩৮

অদেয়

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলই বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা,
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,
যৌবন-ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান।
সে লাঞ্ছনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।

ধেয়ানমগ্ন ক্ষণে

নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায়
অবসন্ন পল্লীচেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে-বলা মৃদু ভাষার ধারা,
প্রথম রাতের তারা
অবাক চেয়ে থাকে;
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কাকে,
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে,
কে দেয় দুয়ার রুধে,
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে।
সময় হলে রাজার মতো এসে
জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবি।
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি
ধুলার 'পরে মাথা আমার দিতেম লুটায়ে
গর্ব আমার অর্ঘ্য হত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে,
তোমার পানে উদ্দেশেতে ঊর্ধ্বে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান।
তোমার অভিমান
আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ।

কালিম্পঙ
১৮ জুন ১৯৩৮

রূপকথায়

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা,
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার,
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।

সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

আহ্বান

জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।
বিস্ময় আনো ব্যগ্র হিয়ার পরশ-প্রতীক্ষায়
সজল পবনে নীল বসনের চঞ্চল কিনারায়,
দুয়ার-বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবীমালার বারতা আসুক মনে।
বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীরধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি।
কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুলবনের মুখরিত সমীরণে।

[শান্তিনিকেতন]
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

অধীরা

চির অধীরার বিরহ-আবেগ
দূরাদগন্তপথে
ঝঞ্ঝার ধ্বজা উড়ায়ে ছুটিল
মত্ত মেঘের রথে।
দ্বার ভাঙিবার অভিযান তার,
বারবার কর হানে,
বারবার হাঁকে, চাই আমি চাই,
ছোটে অলক্ষ্য-পানে।

হুহু হুংকার, ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ।
দুর্দাম প্রেম কি এ,
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।

মানে না শাস্ত্র, জানে না শঙ্কা,
নাই দুর্বল মোহ,
প্রভুশাপ-'পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ।

করুণ ধৈর্যে গণে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ,
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্যে,
নহে মন্দাক্রান্তা,
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে
বিঘ্ন পড়িছে খসে,
বিধাতারে হানে ভর্ৎসনাবাণী
বজ্রের নির্ঘোষে।
নিলাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে
নিঃসংকোচ আঁখি,
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি।

মুক্ত বেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদি কালের বেদনার উদ্‌বোধন,
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন,
যে নবসৃষ্টি অসীম কালের
সিংহদুয়ারে থামি
হেঁকেছিল তার প্রথম মন্ত্রে
'এই আসিয়াছি আমি'।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৮

বাসা বদল

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যান্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে থাকা,

টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।
আকাশেতে পায়রাগুলো ওড়ে
ঘুরে ঘুরে চক্র বেঁধে।
চেয়ে দেখি দেয়ালে সেই লেখনখানি
গেল বছরের,
লালরঙা পেন্‌সিলে লেখা,
'এসেছিলুম; পাই নি দেখা; যাই তাহলে।
দোসরা ডিসেম্বর।'
এ লেখাটি ধুলো ঝেড়ে রেখেছিলেম তাজা,
যাবার সময় মুছে দিয়ে যাব।
পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ
চায়ের ভোজে অলস ক্ষণের হিজিবিজি-কাটা,
ভাঁজ ক'রে তাই নিলেম জামার নীচে।
প্যাক করতে গা লাগে না,
মেজের 'পরে বসে আছি পা ছড়িয়ে।
হাতপাখাটা ক্লান্ত হাতে
অন্যমনে দোলাই ধীরে ধীরে।
ডেস্কে ছিল মেডেন্‌-হেয়ার পাতায় বাঁধা
শুকনো গোলাপ,
কোলে নিয়ে ভাবছি বসে,
কী ভাবছি কে জানে।

অবিনাশের ফরিদপুরে বাড়ি;
আনুকূল্য তার
বিশেষ কাজে লাগে
আমার এই দশাতেই।
কোথা থেকে আপনি এসে জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য ব'লেই মানে,
খাটে মুটের মতো।
জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে।
ময়লা মোজায় জড়িয়ে নিল এমোনিয়া।
ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে
হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুশ,
নখ চাঁচবার উখো,
সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।
ছেড়ে-ফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।

সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে সময়টা গেল
নেহাত সেটা বেশি।
বারে বারে ঘুরিয়ে আমার চটিজোড়া
কোঁচা দিয়ে যত্নে দিল মুছে,
ফুঁ দিয়ে সে উড়িয়ে দিল ধুলোটা কাল্পনিক
মুখের কাছে ধ'রে।
দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে।
একটা চিঠির খাম
হঠাৎ দেখি লুকিয়ে নিল
বুকের পকেটেতে।
দেখে যেমন হাসি পেল, পড়ল দীর্ঘশ্বাস।
কার্পেটটা গুটিয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে,
জন্মদিনের পাওয়া,
হল বছর-সাতেক।

অবসাদের ভারে অলস মন,
চুল বাঁধতে গা লাগে নাই সারা সকালবেলা,
আলগা আঁচল অন্যমনে বাঁধি নি ব্রোচ দিয়ে।
কুটিকুটি ছিঁড়তেছিলেম একে একে
পুরোনো সব চিঠি—
ছড়িয়ে রইল মেঝের 'পরে, ঝাঁট দেবে না কেউ
বোশেখমাসের শুকনো হাওয়া ছাড়া।
ডাক আনল পাড়ার পিয়ন বুড়ো,
দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড ক'রে।
রাস্তা দিয়ে চলে গেল তপসি মাছের হাঁক,
চমকে উঠে হঠাৎ পড়ল মনে
নাই কোনো দরকার।
মোটর গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে-দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।

উজাড় হল ঘর,
দেয়ালগুলো অবুঝ-পারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।
সিঁড়ি বেয়ে পেঁছে দিল অবিনাশ
ট্যাক্সিগাড়ি-'পরে।
এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ওই ভক্তের মুখে—

বললে, আমায় চিঠি লিখো।
রাগ হল তাই শুনে
কেন জানি বিনা কারণেই।

শেষ কথা

রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।
শিল্প তার মূল্যবান, দেয় না সে আলো,
চোখেতে জড়ায় লোভ, মনেতে ঘনায় ছায়া কালো
অবসাদে। তবু তারে প্রাণপণে রাখি যতনেই,
ছেড়ে যাব তার পথ নেই।
অন্ধকারে অন্ধদৃষ্টি নানাবিধ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরে
আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তবেরে।
অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে, আজো যে রয়েছে দূরে।
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।
তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।
রক্তে মোর যে দুর্বল আছে
শঙ্কিত বক্ষের কাছে,
তারেই সে করেছে সহায়,
পশুবাহনের মতো মোহভার তাহারে বহায়।
সে যে একান্তই দীন,
মূল্যহীন
নিগড়ে বাঁধিয়া তারে
আপনারে
বিড়ম্বিত করিতেছ পূর্ণ দান হতে
এ প্রমাদ কখনো কি দেখিবে আলোতে।
প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে,
সে দীন কি পার্শ্বে তব শোভে।
কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২২ মার্চ ১৯৩৯

মুক্তপথে

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ওই আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা।
আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে—
আমি ওকে বসাব হয়তো
ময়লা কাঁথার 'পরে।
সাবধানে রয় বাজার-দরের খোঁজে
সাধু গাঁয়ের লোক,
ধুলার বরন ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ।
বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে;
আমার পাশে ও মোর মনোচোরা
একলা এসো চলে।
হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথায় থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।
ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে,
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা
হাতের পরশগুণে।
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা
নাচেতে কাজ নাই,
যে চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইকো ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধুলোর 'পরে চ'লে।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়'।
ভিজে শাড়ি হাঁটুর 'পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।

হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।
মান নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায় মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চলে দূরে গাঁয়ে।
পাই তোমারে যেমন খুশি তাই
যেথায় খুশি সেথা।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা।
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে
মুক্ত পথের 'পরে।

[শ্রীনিকেতন]
৬ নভেম্বর ১৯৩৬

দ্বিধা

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা পদপতন ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।
সে কি ছল-করা অবহেলা, জানি না সে,
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে।
পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।
তুমি কোথা দূরে কুঞ্জছায়াতে
মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে,
পিছে পিছে তব ছায়ারৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

আধোজাগা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।

অচেতন মনোমাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

জাগি নাই আমি জাগি নাই গো,
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদুমন্থরধারে।

গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই, যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ
তন্দ্রার চারি ধারে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

যক্ষ

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা,
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে।
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।
এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গণি গণি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ-লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্যভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পঙ
২০ জুন ১৯৩৮

পরিচয়

বয়স ছিল কাঁচা,
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই. এ.-র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

অচিন জগৎ বুকের মধ্যে পাঠিয়ে দিত ডাক
কখন থেকে থেকে,
দুপুরবেলায় অকাল ধারায় ভিজে মাটির আতপ্ত নিশ্বাসে,
চৈত্ররাতের মদির ঘন নিবিড় শূন্যতায়,
ভোরবেলাকার তন্দ্রাবিবশ দেহে
ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁয়া আলস-জড়িমাতে।
যে বিশ্ব মোর স্পষ্ট জানার শেষের সীমায় থাকে
তারি মধ্যে গুণী, তুমি অচিন সবার চেয়ে
তোমার আপন রচন-অন্তরালে।

কখনো বা মাসিকপত্রে চমক দিত প্রাণে
অপূর্ব এক বাণীর ইন্দ্রজাল,
কখনো বা আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়
হাজারোবার পড়া লেখায় পুরোনো কোন্ লাইন
হানত বেদন বিদ্যুতেরই মতো,
কখনো বা বিকেলবেলায় ট্রামে চ'ড়ে
হঠাৎ মনে উঠত গুনগুনিয়ে
অকারণে একটি তোমার শ্লোক।

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি,
স্বপ্ন-ঘোড়ায়-চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।

আয়নাখানার সামনে সেদিন চুল বাঁধবার বেলায়
মনে যদি ক'রে থাকি সে রাজকন্যা আমিই,
হেসো না তাই ব'লে।
তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেভাগেই
ছুঁইয়েছিলে রূপোর কাঠি,
জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত এই প্রাণ।
সেই বয়সে আমার মতো অনেক মেয়ে
ওই কথাটাই ভেবেছিল মনে;
তোমায় তারা বারে বারে পত্র লিখেছিল
কেবল তোমায় দেয় নি ঠিকানাটা।

হায় রে খেয়াল! খেয়াল এ কোন্ পাগলা বসন্তের;
ওই খেয়ালের কুয়াশাতে আবছা হয়ে যেত
কত দুপুরবেলায়
কত ক্লাসের পড়া,
উছল হয়ে উঠত হঠাৎ
যৌবনেরই খাপছাড়া এক ঢেউ।

রোমান্স বলে একেই
নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার।
আর-কিছুদিন পরেই
কখন ভাবের নীহারিকায় রশ্মি হত ফিকে,
বয়স যখন পেরিয়ে যেত বিশ-পঁচিশের কোঠা,

হাল-আমলের নভেল প'ড়ে
মনের যখন আব্রু যেত ভেঙে
তখন হাসি পেত
আজকে দিনের কাঁচমেয়েপনায়।

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়ত বসে 'ওড্‌স টু নাইটিঙ্গেল',
না-দেখা কোন্‌ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত,
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়,
উজাড় পরীস্থানে।

বরষ-কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায় পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা সেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান-সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।
কিন্তু আমার স্বভাববশে
ঘোর ভাঙে নি যখন ভোলা মনে
এলুম তোমার কাছকাছি।

চেনাশোনার প্রথম পালাতেই
পড়ল ধরা, একেবারে দুর্লভ নও তুমি,
আমার লক্ষ্য সন্ধানেরই আগেই
তোমার দেখি আপনি বাঁধন মানা।
হায় গো রাজার পুত্র
একটু পরশ দেবামাত্র পড়ল মুকুট খ'সে
আমার পায়ের কাছে,
কটাক্ষেতে চেয়ে তোমার মুখে
হেসেছিলুম আবিল চোখের বিহ্বলতায়।
তাহার পরে হঠাৎ কবে মনে হল
দিগন্ত মোর পাংশু হয়ে গেল
মুখে আমার নামল ধূসর ছায়া;
পাখির কণ্ঠে মিইয়ে গেল গান
পাখায় লাগল উড়ুক্ষু পাগলামি।
পাখির পায়ে এঁটে দিলেম ফাঁস

অভিমানের ব্যঙ্গস্বরে,
বিচ্ছেদেরই ক্ষণিক বঞ্চনায়,
কটুরসের তীব্র মাধুরীতে।

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী;
রঞ্জিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জান
মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজি-রাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হল তারি জিত।
জিত? কে জানে তাও সত্য কি না।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।
সেদিন আমি মনের ক্ষোভে
বলেছিলুম কপালে কর হানি,
চিনব ব'লে এলেম কাছে
হল বটে নিংড়ে নিয়ে চেনা
চরম বিকৃতিতে।
কিন্তু তবু ধিক্ আমারে, যতই দুঃখ পাই
পাপ যে মিথ্যে কথা।
আপনাকে তো ভুলিয়েছিলুম যেই তোমারে এলেম ভোলাবারে,
ঘুলিয়ে-দেওয়া ঘূর্ণিপাকে সেই কি চেনার পথ।
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্ন-ঘোড়ায়-চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

দেখতে পেলেম ছবি,
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া,
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
এ-সব কথা শোনাচ্ছে কি সাজিয়ে-বলার মতো,
না বন্ধু, এ হঠাৎ মুখে আসে,
ঢেউয়ের মুখে মোতি ঝিনুক যেন
মরুবালুর তীরে।
এ-সব কথা প্রতিদিনের নয়;
যে তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে অঞ্জলি
তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।

আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী,
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে।

তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো,
আমার মধ্যে আজো আছে চেনার অতীত কিছু।

[মংপু]
১৩ জুন ১৯৩৯

নারী

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।
পলাতকা লাবণ্য তাহার
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলি ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শুচি
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্ররুচি।
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্ত্যের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।

কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি,
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্‌ভাসিত ছিলে তুমি অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

আলমোড়া
১৮ মে ১৯৩৭

গানের স্মৃতি

কেন মনে হয়
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।
বিশেষ লগ্নের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই এর সুরে;
শুধু এই মনে পড়ে এই গানে দিগন্তের দূরে
আলোর কাঁপনখানি লেগেছিল সন্ধ্যাতারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজও এই অন্ধকারে জ্বাল'
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্রসভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়,
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।
সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে।
দেখা হয়েছিল না কি কোনো এক সংগীতের পথে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে।

শান্তিনিকেতন
দেয়ালি ১৩৪৫

অবশেষে

যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে
কে ছিল কাহার খোঁজে,
ভালো করে মনে ছিল না তা।
ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে আসন পাতা,
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে।

মালা কেহ গিয়েছে পরায়ে
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে।
মাঝখানে বারে বারে
কত কি যে এলোমেলো,
কভু গেল, কভু এল।
সার্থকতা ছিল যেইখানে
ক্ষণিক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে।

সে যৌবনমধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ হল জ্বালা।
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে হয় নাই দেখা
একেলার ঘরে তারে একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে,
পাই তারে না-পাওয়ার রূপে।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

সম্পূর্ণ

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখি নি,
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিনী
ছবির মতো—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতর দিকের
সন্ধানটুকু পাই নে।
নিজের মনে রঙ মেলাবার বাটিতে
চাঁপালি খড়ির মাটিতে
গোলাপি খড়ির রঙ হয় নি যে গোলা,
সোনালি রঙের মোড়ক হয় নি খোলা।
দিনে দিনে শেষে সময় এসেছে আগিয়ে,
তোমার ছবিতে আমারি মনের
রঙ যে দিয়েছি লাগিয়ে।
বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করতে এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে, ভুলে ফেলে গিয়েছেন
শুরু করেন নি কায়া।
যদি শেষ করে দিতেন, হয়তো

হত সে তিলোত্তমা,
একেবারে নিরুপমা।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে করত
কাব্যের পোষা টিয়ে।
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে
যেমনি দিয়েছি দেহ
অমনি তখন নাগাল পায় না
সাহিত্যিকেরা কেহ।
আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।
মাঝখান থেকে বিশ্বপতির ঘুচে গেল অধিকার।
তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণ বাণী
লাগে না কোনোই কাজে।
কেবল তোমার নাম ধ'রে মাঝে মাঝে
অসময়ে দিই ডাক,
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাই বা থাক্।
অমনি তখনি কাঠিতে-জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুন্‌তিতে যাও ভুলে।
কোনো কথা আর নাই কোনো অভিধানে
যার এত বড়ো মানে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
কর নি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলো ছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

[মংপু]
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ভাঙন

কোন্ ভাঙনের পথে এলে
আমার সুপ্ত রাতে।
ভাঙল যা তাই ধন্য হল
নিঠুর চরণ পাতে।
রাখব গেঁথে তারে
কমলমণির হারে
দুলবে বুকে গোপন বেদনাতে।

সেতারখানি নিয়েছিলে
অনেক যতনভরে
তার যবে তার ছিন্ন হল
ফেললে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহার গান
রইল তোমার দান
ফাগুন হাওয়ার মর্মে বাজে
গোপন মত্ততাতে।

শ্রীনিকেতন
১২ জুলাই ১৯৩৯

অত্যুক্তি

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।
কল্পনা-ভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই;
শুনে তাই

কেন তুমি হেসে ওঠ আধুনিকা প্রিয়ে
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত।
তোমার আরতি-অর্ঘ্যে অত্যুক্তি-বঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
তার চেয়ে মৌন ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আস।
তখন যে হাসি হাস
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো,
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরও অধিক,
সোহাগ-বাণীরে মোর হেসে কেন বল কাল্পনিক।

পুরী
৭ মে ১৯৩৯

হঠাৎ মিলন

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে;
তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে
সুদূর পারের হতে
কোন্ অবেলায় এল উজান স্রোতে।
দ্বিধায় ছোঁয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি।
দুঃসহ বিস্ময়ে
ছিলাম স্তব্ধ হয়ে,

বলার মতো বলা পাই নি খুঁজে;
মনের সঙ্গে যুঝে
মুখের কথার হল পরাজয়।
তোমার তখন লাগল বুঝি ভয়,
বাঁধন-ছেঁড়া অধীরতার এমন দুঃসাহসে
গোপনে মন পাছে তোমায় দোষে।
মিনতি উপেক্ষা করি ত্বরায় গেলে চলে
'তবে আসি' এইটি শুধু ব'লে।
তখন আমি আপন মনে যে গান সারাদিন
গেয়েছিলেম, তাহারি সুর রইল অন্তহীন।
পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে, তারি কলস্বর
দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর।

আলমোড়া
২৭ মে ১৯৩৭

গানের জাল

দৈবে তুমি
কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে
যাও চলে গান গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখ
বুঝি না তা কেবল রহি চেয়ে।
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে,
প্রতিদিনের ঠিকঠিকানা ভোলে,
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন
গন্ধের পথ বেয়ে।

গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা বাঁধন হতে
টানে অসীম কালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন
স্বর্গলোকের আনে বেদন
পরান ফেলে ছেয়ে।

[১৯৩৯]

মরিয়া

মেঘ কেটে গেল
আজি এ সকাল বেলায়।
হাসিমুখে এসো
অলস দিনেরই খেলায়।

আশানিরাশার সঞ্চয় যত
সুখদুঃখেরে ঘেরে
ভ'রে ছিল যাহা সার্থক আর
নিষ্ফল প্রণয়েরে,
অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে
ভাঁটার গাঙের ভেলায়।
যত বাঁধনের
গ্রন্থন দিব খুলে
ক্ষণিকের তরে
রহিব সকল ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া
যে দান হয় নি পাওয়া
পূবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার
উড়াইব অবহেলায়।

[১৯৩৯]

দূরবর্তিনী

সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম,
তাই ছিলে সেই আসন-'পরে যা অন্তরতম।
অগোচরে সেদিন তোমার লীলা
বইত অন্তঃশীলা।
থমকে যেতে যখন কাছে আসি,
তখন তোমার ত্রস্ত চোখে বাজত দূরের বাঁশি।
ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে,
কান্না নিত অপরূপের রূপে।
আশার অতীত বিরল অবকাশে
আসতে তখন পাশে;
একটি ফুলের দানে
চিরফাগুন-দিনের হাওয়া আনতে আমার প্রাণে।
অবশেষে যখন তোমার অভিসারের রথ
পেল আপন সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার আর নাহি পায় নতুন-জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।
তোমার পালে লাগে না আর হঠাৎ দখিন হাওয়া;
শিথিল হল সকল চাওয়া পাওয়া।
মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ বহে যায়
নিশ্বাস তার মেলে না আর তোমার বেদনায়।
উদ্‌বেগ নাই প্রত্যাশা নাই ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।

অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই,
ঝরনাতলার উছল পাত্র নাই।

১৯৩৭

গান

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে,
তোমারে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনার মাঝে
আমার মূল্য আছে
এ নিরন্তর সংশয়ে আর
পারি না কেবলি যুঝিতে,
তোমারেই শুধু সত্য পেরেছি বুঝিতে।

[শ্যামলী। শান্তিনিকেতন]
৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮

বাণীহারা

ওগো মোর নাহি যে বাণী
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে,
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে অতি ধীরে ধীরে।

[১৩৪৬]

অনসূয়া

কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।
কুকুরটা সর্ব অঙ্গে ক্ষত
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।
নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী
রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।
মোটা সিঁদুরের রেখা আঁকা,
হাতে মোটা শাঁখা,
শাড়ি লালপেড়ে,
খাটো খোঁপা-পিণ্ডটুকু ছেড়ে
ঘোমটার প্রান্ত ওঠে টাকের সীমায়,
অস্থির সমস্ত পাড়া এ মেয়ের সতী-মহিমায়।
এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোম্যান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়ালো ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে।

সেই মেয়ে
নহে বিংশ-শতকিয়া

ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্‌-পরীক্ষাবাহিনী
আতপ্ত বসন্তে আজি নিশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃতভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে 'পিয়'
বাণী লোভনীয়,
এনে দেয় রোমাঞ্চ-হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে,
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।

যখন নৃপতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্তের মতো
দয়াহীন ছলনায় রত
আমি কবি অনাবিল সরল মাধুরী
করিতেছিলাম চুরি
এলা-বনচ্ছায়ে এক কোণে,
মধুকর যেমন গোপনে
ফুলমধু লয় হরি
নিভৃত ভাণ্ডার ভরি ভরি
মালতীর স্মিত সম্মতিতে।
ছিল সে গাঁথিতে
নর্তশিরে পুষ্পহার
সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকার।
বলেছিনু, আমি দেব ছন্দের গাঁথুনি
কথা চুনি চুনি।

অয়ি মালবিকা
অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহ নি দীপশিখা।
অর্ধাবগুণ্ঠিত ছিলে কাব্যে শুধু ইঙ্গিত-আড়ালে,
নিঃশবদে চরণ বাড়ালে
হৃদয়প্রাঙ্গণে আজি অস্পষ্ট আলোকে—
বিস্মিত চাহনিখানি বিস্ফারিত কালো দুটি চোখে,

বহু মৌনী শতাব্দীর মাঝে দেখিলাম—
প্রিয় নাম
প্রথম শুনিলে বুঝি কবিকণ্ঠস্বরে
দূর যুগান্তরে।
বোধ হল তুলে ধ'রে ডালা
মোর হাতে দিলে তব আধফোটা মল্লিকার মালা।
সুকুমার অঙ্গুলির ভঙ্গিটুকু মনে ধ্যান ক'রে
ছবি আঁকিলাম বসে চৈত্রের প্রহরে।
স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ মার্চ ১৯৪০

শেষ অভিসার

আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।
নিষ্কম্প পল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার-প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে,
রন্ধ্রহীন আঁধারেতে।
ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্‌বিগ্ন ডানার 'পরে।
যেন কোন্‌ ভেঙে-পড়া লোকান্তরে
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতার শূন্যতল জুড়ে।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।

মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে হে অভিসারিকা,
আজ আসিয়াছ তুমি, ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

আসিছ যে পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কি।
এ যে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু বা অপরিচিত।
হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

মংপু
২৩ এপ্রিল ১৯৪০

নামকরণ

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,
তাই সে আমার শোনামণি।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে
প্রাণের ভাষাই এর খনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি,
ডাক শুনে কাজ যায় থামি
কঙ্কণ ওঠে কনকনি।

সে হাসে আমিও তাই হাসি
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা,
অভিধান-বর্জিত ব'লে
মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্ খনে
পশমের শিল্পের সাথে
সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী।

গৌরীপুর ভবন। কালিম্পং
২৪ মে ১৯৪০

বিমুখতা

মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়,
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
ভাঙিবে তোমার ভুল।
নয় সে খেলার পুতুল, নয় সে
আদরের পোষা প্রাণী,
মনে রেখো তাহা জানি।
মত্তপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
কখন উঠিবে জেগে।
তোমার প্রাণের পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস,
হেলায় খেলায় ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলি মান,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জান,
তা হলে রবে না খেদ।
ঝরনার পথে উজানের খেয়া
সে যে মরণের জেদ।

স্বাধীন বল যে ওরে
নিতান্ত ভুল ক'রে।
দিক্‌সীমানার বাঁধন টুটিয়া
ঘুমের ঘোরেতে চমকি উঠিয়া
যে উল্কা পড়ে খ'সে
কোন্‌ ভাগ্যের দোষে
সেই কি স্বাধীন, তেমনি স্বাধীন এও,
এরে ক্ষমা করে যেয়ো।
বন্যারে নিয়ে খেলা যদি সাধ
লাভের হিসাব দিয়ো তবে বাদ,
গিরিনদী সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান করি ঘরে তারে থুয়ো,
খাটাতে যেয়ো না মাতাল চলার
চলতি এ কারবারে।
কাটিয়ো সাঁতার যদি জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
ভরসা ডাঙার পারে;
যতই নীরস হোক-না সে তবু
নিরাপদ জেনো তারে।
'সে আমারি' ব'লে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা।
আলগা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া
মানবমনের রহস্য কিছু শিখা।

[কালিম্পং
জুন ১৯৪০]

আত্মছলনা

দোষী করিব না তোমারে,
ব্যথিত মনের বিকারে,
নিজেরেই আমি নিজে নিজে করি ছলনা।
মনেরে বুঝাই বুঝি ভালোবাস,
আড়ালে আড়ালে তাই তুমি হাস,
স্থির জান এ যে অবুঝের খেলা
এ শুধু মোহের রচনা।
সন্ধ্যামেঘের রাগে
অকারণে যত ভেসে-চলে-যাওয়া
অপরূপ ছবি জাগে।

সেইমতো ভাসে মায়ার আভাসে
রঙিন বাষ্প মনের আকাশে,
উড়াইয়া দেয় ছিন্ন লিপিতে
বিরহমিলন-ভাবনা।

[কালিম্পং]
২৯ মে ১৯৪০

অসময়

বেকালবেলা ফসল-ফুরানো
শূন্য খেতে
বৈশাখে যবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে,
ছেড়ে তার বন জানি নে কখন
কী ভুল ভুলি
শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে
এসেছিল বুলবুলি।

সকালবেলার স্মৃতিখানি মনে
বহিয়া বুঝি
তরুণ দিনের ভরা আতিথ্য
বেড়াল' খুঁজি।
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে সে কি
রাতের অন্ধকারে।

তবুও তো গান করে গেল দান
কিছু না পেয়ে।
সংশয়-মাঝে কী শুনায়ে গেল
কাহারে চেয়ে।
যাহা গেছে সরে কোনো রূপ ধ'রে
রয়েছে বাকি
এই সংবাদ বুঝি মনে মনে
জানিতে পেরেছে পাখি।

প্রভাতবেলার যে ঐশ্বর্য
রাখে নি কণা
এসেছিল সে যে, হারায় না কভু
সে সান্ত্বনা।

সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে
ক্ষণিক নহে।
সকালের পাখি বিকালের গানে
এ আনন্দই বহে।

১৯৪০

অপঘাত

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশীপাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজ্‌লা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি-সন্ধানে।
কেটে-নেওয়া ইক্ষুখেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টিধোয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে—
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ দুটিতে।
নববিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

[কালিম্পং]
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

মানসী

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মনখানা উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষি।
যাহা-খুশি বলি স্বগত কাকলি,
লিখিবারে চাহি পত্র,
গোপন মনের শিল্পসূত্রে
বুনানো দু-চারি ছত্র।
সঙ্গীবিহীন নিরালায় করি
জানা-অজানার সন্ধি,
গরঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ
করিব বাণীর বন্দী।
না জানি তোমার নামধাম আমি
না জানি তোমার তথ্য।
কিবা আসে যায় যে হও সে হও
মিথ্যা অথবা সত্য।
নিভৃতে তোমারি সাথে আনাগোনা
হে মোর অচিন মিত্র,
প্রলাপী মনেতে আঁকা পড়ে তব
কত অদ্ভুত চিত্র।
যে নেয় নি মেনে মর্ত্য শরীরে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে
তার সাথে মন করেছি বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।
ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ।
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার
দ্বার খোলা দ্বার বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
রিমিঝিমি বারি বর্ষে
মনে মনে ভাবি কোন্ পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর
কবি-কাব্যের রঙ্গে,
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিত চীর অঙ্গে।

বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোজ্জ্বল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।
ওগো মায়াময়ী আজি বরষায়
জাগালে আমার ছন্দ
যাহা-খুশি সুরে বাজিছে সেতার
নাহি মানে কোনো বন্ধ।

[কালিম্পং]
২২ মে ১৯৪০

অসম্ভব ছবি

আলোকের আভা তার অলকের চুলে,
বুকের কাছেতে হাঁটু তুলে
বসে আছে ঠেস দিয়ে পিপুল গুঁড়িতে,
পাশেই. পাহাড়ে নদী নুড়িতে নুড়িতে
ফুলে উঠে চলে যায় বেগে।
দেবদারু-ছায়াতলে উঠে জেগে
কলস্বর,
কান পেতে শোনে তাই প্রাচীন পাথর—
অরণ্যের কোল
যেন মুখরিয়া তোলে শিশুর কল্লোল।
ইংরেজ কবির লেখা একমনে পড়িছে তরুণী
গুন গুন রব তার পিছনে দাঁড়ায়ে আমি. শুনি;
মৃদু বেদনায় ভাবি যে কবির বাণী
পড়িছে বিরাম নাহি মানি
আমি কেন সে কবি না হই।
এতদিন নানাভাবে কাব্যে যাহা কই
আজি এ গিরির মতো কেন সে নির্বাক।
অদূরে মাদার-শাখে ঘুঘু দেয় ডাক।
আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়
অফুরান নৈরাশায়
উচ্ছলিতে থাকে একতানে
আন-মননীর কানে কানে।
আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে,
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে দুলিছে বাতাসে।

ঢালু তটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে।
চূর্ণ কেশে নিত্য চঞ্চলতা,
দুর্বোধ্য পড়িছে চোখে, অধ্যয়নরতা
সরায়ে দিতেছে বারংবার
বাহুক্ষেপে। ধৈর্য মোর রহিল না আর
চকিতে সম্মুখে আসি শুধালাম,
'তুমি কি শোন নি মোর নাম।'
মুখে তার সে কি অসন্তোষ,
সে কি লজ্জা, সে কি রোষ,
সে কি সমুদ্ধত অহংকার।
উত্তর শোনার
অপেক্ষা না করি আমি দ্রুত গেনু চলি।
ঘুঘুর কাকলি
ঘন পল্লবের মাঝে আশ্বিনের রৌদ্র ও ছায়ারে
ব্যথিত করিছে চির নিরুত্তর ব্যর্থতার ভারে।

মিথ্যা, মিথ্যা এ স্বপন, ঘরে ফিরে বসিয়া নির্জনে
শৈল-অরণ্যের সেই ছবিখানি আনি মনে মনে,
অসম্ভব রচনায়
পূরণ করিনু তারে ঘটে নি যা সেই কল্পনায়।

যদি সত্য হত, যদি বলিতাম কিছু,
শুনিত সে মাথা করি নিচু,
কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি
বিদ্যুৎবাহনী
কটাক্ষে হানিত মুখে
রক্ত মোর আলোড়িয়া বুকে,
কিংবা যদি চলে যেত অঞ্চল সংবরি
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনপথ সচকিত করি,
আমি রহিতাম চেয়ে
হেসে উঠিতাম গেয়ে,
'চলে গেলে হে রূপসী মুখখানি ঢেকে
বঞ্চিত কর নি মোরে পিছনে গিয়েছ কিছু রেখে।'

হায় রে, হয় নি কিছু বলা
হয় নি ছায়ার পথে ছায়াসম চলা,
হয়তো সে শিলাতল-'পরে
এখনো পড়িছে কাব্য গুন গুন স্বরে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব,
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার মোর বাহুতে মাথা
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত,
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব,
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে;
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ।
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ,
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনায় ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব,
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

গানের মন্ত্র

মাঝে মাঝে আসি যে তোমারে
গান শিখাবারে
মনে তব কৌতুক লাগে,
অধরের আগে
দেখা দেয় একটুকু হাসির কাঁপন।
যে কথাটি আমার আপন
এই ছলে হয় সে তোমারি।

তারে তারে সুর বাঁধা হয়ে যায় তারি
অন্তরে অন্তরে
কখন তোমার অগোচরে।
চাবি করা চুরি,
প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী,
সুর দিয়ে পথ বাঁধা
যে দুর্গমে কথা পেত পদে পদে পাষাণের বাধা,
গানের মন্ত্রেতে দীক্ষা যার
এই তো তাহার অধিকার।
সেই জানে দেবতার অলক্ষিত পথ
শূন্যে শূন্যে যেথা চলে মহেন্দ্রের শব্দভেদী রথ।
ঘনবর্ষণের পিছে যেমন সে বিদ্যুতের খেলা
বিমুখ নিশীথবেলা,
অমোঘ বিজয়মন্ত্র হানে
দূর দিগন্তের পানে,
আঁধারের সংকোচ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
মেঘমল্লারের ঝড়ে।

শান্তিনিকেতন
১৮ জুলাই ১৯৪০

স্বরূপ

জানি আমি ছোটো আমার ঠাঁই
তাহার বেশি কিছুই চাহি নাই।
দিয়ো আমায় সবার চেয়ে অল্প তোমার দান,
নিজের হাতে দাও তুলে তো
রইবে অফুরান।

আমি তো নই কাঙাল পরদেশী,
পথে পথে খোঁজ করে যে
যা পায় তারো বেশি।
সকলটুকুই চায় সে পেতে হাতে,
পুরিয়ে নিতে পারে না সে
আপন দানের সাথে।

তুমি শুনে বললে আমায় হেসে,
বললে ভালোবেসে,
'আশ মিটিবে এইটুকুতেই তবে?'
আমি বলি, 'তার বেশি কী হবে।
যে দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।

যে দান কেবল বাহুর পরশ তব
তারে আমি বীণার মতো বক্ষে তুলে লব।
সুরে সুরে উঠবে বেজে,
যেটুকু সে তাহার চেয়ে
অনেক বেশি সে যে।
লোভীর মতো তোমার দ্বারে
যাহার আসা-যাওয়া
তাহার চাওয়া-পাওয়া
তোমায় নিত্য খর্ব করে আনে
আপন ক্ষুধার পানে।
ভালোবাসার বর্বরতা
মলিন করে তোমারি সম্মান
পৃথুল তার বিপুল পরিমাণ।
তাই তো বলি প্রিয়ে,
হাসিমুখে বিদায় কোরো স্বল্প কিছু দিয়ে;
সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে
আনিয়া দেয় ধীরে
সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।'

শান্তিনিকেতন
১৭ জুলাই ১৯৪০

অবসান

জানি দিন অবসান হবে,
জানি তবু কিছু বাকি রবে।
রজনীতে ঘুমহারা পাখি
এক সুরে গাহিবে একাকী,
যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি,
সে জানিবে তারি নীড়হারা
স্বপন খুঁজিছে সেই তারা
যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগি।
কিছু পরে করে যাবে চুপ
ছায়াঘন স্বপনের রূপ।
ঝরে যাবে আকাশকুসুম
তখন কূজনহীন ঘুম
এক হবে রাত্রির সাথে।
যে গান স্বপনে নিল বাসা
তার ক্ষীণ গুঞ্জন ভাষা
শেষ হবে সব-শেষ রাতে।

শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই ১৯৪০

রোগশয্যায়

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
প্রাতে
১ ডিসেম্বর ১৯৪০

১

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার
অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।
খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে,
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

উদয়ন
প্রাতে
২৭ নভেম্বর ১৯৪০

২

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।

মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি,
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি,
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া।
অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা,
অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা,
অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,
শক্তি তাহে পায়।
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

[পূর্বপাঠ : কালিম্পং
২৪।২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০]

৩

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান-বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে,
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর-পরে প্রহর যে যায়
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ অক্টোবর ১৯৪০

৪

অজস্র দিনের আলো
জানি একদিন
দু-চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।

শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।
হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হল পুরা
সেটুকু টুকুরা—
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে,
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।
অল্প কিছু আলো থাক্,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু।
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর ১৯৪০

৫

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্-বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয়-সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে,
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন

এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপেরে অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।
প্রতি ক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহ-দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি
সাথে সাথে পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।

জোড়াসাঁকো
৪ নভেম্বর ১৯৪০

৬

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শাসির 'পরে ঠোকর মার এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।
তাহার পরে কেবল মিছিমিছি
যেমন খুশি নাচের সঙ্গে
যেমন খুশি কেবল কিচিমিচি;
নির্ভীক ওই পুচ্ছ
সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ।
যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বকশিশ,
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম সুর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি,
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর' না তার কিছু,
মান নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচু নিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি

বাধাও কী কৌতুকে।
নবরত্নসভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কী কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা দুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি।
বসন্তেরই বায়না-করা
নয় তো তোমার নাট্য,
যেমন-তেমন নাচন তোমার,
নাইকো পারিপাট্য।
অরণ্যেরই গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি,
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে,
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।
ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী কর মস্করা,
অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা।
মাটির 'পরে টান,
ধুলায় কর স্নান,
এমনি তোমার অযত্নেরই সজ্জা
মলিনতা লাগে না তায় দেয় না তারে লজ্জা।
বাসা বাঁধ' রাজার ঘরের ছাদের কোণে
লুকোচুরি নাইকো তোমার মনে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি,
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি।

জোড়াসাঁকো
প্রাতে
১১ নভেম্বর ১৯৪০

৭

গহন রজনী-মাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা

অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
রাত্রি দুটা
১২ নভেম্বর ১৯৪০

৮

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর ১৯৪০

৯

হে প্রাচীন তমস্বিনী,
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়
মনে মনে হেরিতেছি—
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে
কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।
পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।
অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে,
আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ,

অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

জোড়াসাঁকো
প্রাতে
১৩ নভেম্বর ১৯৪০

১০

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে,
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভুলে যাবে তার মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন
বসিবে পথের ধারে,
এই রাগিণীর করুণ আভাস
পরশ করিবে তারে;
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু,
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে
বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি।

জোড়াসাঁকো
প্রাতে
১৩ নভেম্বর ১৯৪০

১১

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।

কেহ নাহি জানে
এ বিশ্বের কোন্‌খানে
প্রতি ক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।
দৃষ্টির অতীত ত্রুটি করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র করিছে ছেদন,
ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে দুর্গম।
দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরই আদেশে
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে,
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা,
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর ১৯৪০

১২

সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে
যাহা তাহা রয়েছে ঘর ছেয়ে,
খাতাপত্র কোথায় রাখি কী যে,
হাতড়ে বেড়াই, খুঁজে না পাই নিজে।
দামী যত কোথায় কী হয় জমা,
ছড়াছড়ি, নাই কোনো তার সেমিকোলন কমা।
পড়ে আছে পত্রবিহীন লেফাফা সব ছিন্ন,
এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।
পরক্ষণেই নামে কাজে মেয়ের হস্ত দুটি,
মুহূর্তেকেই বিলুপ্ত হয় যেথায় যত ত্রুটি।
দ্রুত হস্তে নির্লজ্জ সব বিশৃঙ্খলার প্রতি
নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্‌গতি।
ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে,
অদরকারীর গোপন বাসা কোথাও নাহি থাকে।
অগোছালোর মধ্যে থাকি ভাবি অবাক-পারা
সৃষ্টিতে এই পুরুষ মেয়ের চলেছে দুই ধারা,
পুরুষ আপন চারি দিকে জমায় আবর্জনা
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।

জোড়াসাঁকো
দুপুর
১৪ নভেম্বর ১৯৪০

১৩

দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি
এক অতীতের প্রান্ততটে
খেয়া তার শেষ করে থাকে
তবে নব বিস্ময়ের মাঝে
বিশ্বজগতের শিশুলোকে
জেগে ওঠে যেন সেই নূতন প্রভাতে
জীবনের নূতন জিজ্ঞাসা।
পুরাতন প্রশ্নগুলি উত্তর না পেয়ে
অবাক বুদ্ধিরে যারা সদা ব্যঙ্গ করে
বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে
সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে,
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে।

জোড়াসাঁকো
প্রাতে
১৫ নভেম্বর ১৯৪০

১৪

নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল
স্রোতের ব্যাঘাত যদি করে
সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে
সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী,
ছোটো দ্বীপ গড়ে তোলে টেনে আনে শৈবালের দল
তীরের যা পরিত্যক্ত নেয় সে কুড়ায়ে
দ্বীপসৃষ্টি-উপাদানে যাহা-তাহা জোটায় সম্বল।
আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আকাশে
তেমনি চলেছে সৃষ্টি
চৌদিকের সব হতে স্বতন্ত্র স্বরূপে।
তাহার কর্মের আবর্তন
ছোটো সীমাটিতে।
কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কিনা,
উদ্‌বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন।
চুপিচুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।
পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে
বার বার উপরোধে
রুচির বিরোধ জয় জিনি।
এলোমেলো যত-কিছু সযত্নে গুছায়ে রাখে

আঁচলে ধুলার রেশ ঝাড়ি।
দু হাতে সমান করি শয্যার কুঞ্চন
আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে
বিনিদ্র সেবার লাগি।
কথা হেথা ধীর স্বরে,
দৃষ্টি হেথা বাষ্প দিয়ে ছোঁয়া,
স্পর্শ হেথা কম্পিত করুণ,
জীবনের এই রুদ্ধ স্রোত
আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত
বাহিরের সংবাদের
ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর।

একদিন বন্যা নামে শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন।

উদয়ন
১৯ নভেম্বর ১৯৪০

১৫

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।
নির্ঝর যখন ছোটে পরিপূর্ণ বেগে
বহুদূর দুর্গমেরে করিবারে জয়
গর্জন তাহার
অস্বীকার করি চলে গুহার সংকীর্ণ আত্মীয়তা,
ঘোষণা করিতে থাকে নিখিল বিশ্বের অধিকার।
বলহারা ধারা তার মৃদু হয় যবে
বৈশাখের শীর্ণ শুষ্কতায়
হারায় আপন মন্দ্রধ্বনি,
কৃশতম হয়ে আসে আপনার কাছে
আপনার পরিচয়।
খণ্ড খণ্ড কুণ্ড-মাঝে
ক্লান্ত তার গতিস্রোত লীন হয়ে থাকে।
তেমনি আমার রুগ্ণ বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত গ্লানিরে
ধিক্কার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমানসহ।

উদয়ন
২১ নভেম্বর ১৯৪০

১৬

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহ্ন প্রতিমা,
সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতি ক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।
আঁধারের গুহা দিয়ে
আসে তার জাগরণ-পথে
হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলি
প্রভাতের শুকতারা-পানে
পূজাগন্ধী বাতাসের
হিমস্পর্শ লয়ে।
সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি
সে করুণচ্ছবি
ধরিল কল্যাণরূপ
আজি প্রাতে অরুণকিরণে,
দেখিলাম ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালি-কুসুমরুচি আলোর থালায়।

১৭

কখন ঘুমিয়েছিনু,
জেগে উঠে দেখিলাম
কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।
কল্পনার ডানা মেলে
অনুমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি নাই জানি
এক অজানারে লয়ে

নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।

উদয়ন
২১ নভেম্বর ১৯৪০

১৮

সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা
মানুষকে দেখি সেথা বিচিত্রের মাঝে
পরিব্যাপ্ত রূপে;
কিছু তার অসমাপ্ত, অপূর্ণ কিছু বা।
রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারি দিকে,
নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে
তার করস্পর্শে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁখিপাতে।

উদয়ন
প্রাতে
২৩ নভেম্বর ১৯৪০

১৯

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।
হেথা খ্যাতি মোর পরাহত,
উপেক্ষিত গাম্ভীর্য আমার,
নিষেধে অনুশাসনে
শোয়া বসা চলে।
'চুপ করে থাকো',
'বেশি কথা কওয়া ভালো নয়',
'আরো কিছু খেতে হবে',
এ-সকল আদেশ নির্দেশ
কভু ভর্ৎসনায় কভু অনুনয়ে
যাহাদের কণ্ঠ হতে আসে
তাহাদের পরিত্যক্ত খেলাঘরে
ভাঙা পুতুলের ট্রাজেডিতে

এই তো সেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।
কিছুক্ষণ
বিরোধের স্পর্ধা করি,
তার পরে ভালো ছেলে হয়ে
যেমন চালায় তাই চলি।
মনে ভাবি
বৃদ্ধ ভাগ্য তার শাসনের ভার
কিছুদিন নূতন ভাগ্যের হাতে
সঁপি দিয়া কটাক্ষে হাসিছে দূরে থেকে,
হেসেছিল যেমন বাদশা
আবুহোসেনের পালা
রচিয়া আড়ালে।
অমোঘ বিধির রাজ্যে বার বার হয়েছি বিদ্রোহী,
এ রাজ্যে নিয়েছি মেনে
সেই দণ্ড
যাহা মৃণালের চেয়ে সুকোমল,
বিদ্যুতের চেয়ে স্পষ্ট
তর্জনী যাহার।

উদয়ন
প্রাতে
২৩ নভেম্বর ১৯৪০

২০

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেইমতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

উদয়ন
প্রাতে
২৪ নভেম্বর ১৯৪০

২১

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ,
প্রশ্ন এল মনে
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে
সে কি অন্ধ সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে,
শুধু জ্ঞানক্রিয়া শুধু বলক্রিয়া তার
বোধের নাইকো কোনো কাজ?
কারা তর্ক ক'রে বলে, সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে,
প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে,
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন,
ওই তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন
প্রাতে
২৪ নভেম্বর ১৯৪০

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম মোর খ্যাতি
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত,
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়
তারে আর পারি না ফিরাতে,
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা-কিছু হারালো মোর

সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
বিকাল
২৪ নভেম্বর ১৯৪০

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সদ্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ওই নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে;
বুঝিলাম এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

উদয়ন
প্রাতে
২৫ নভেম্বর ১৯৪০

২৪

প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।

বিক্ষুব্ধ এ মর্তভূমে
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।
তারি পত্র পেয়েছ তো কবি মাঙ্গলিক।
সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্‌রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে
তবে তার কোন্‌ আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটাগাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।
রুগ্‌ণ যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোশের নির্লজ্জ নকলে।

উদয়ন
প্রাতে
২৬ নভেম্বর ১৯৪০

২৫

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল-
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

উদয়ন
প্রাতে
২৮ নভেম্বর ১৯৪০

২৬

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গাঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।

আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি
এ বিশ্বের নিত্যসুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।
আমি জানি যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

উদয়ন
প্রাতে
২৮ নভেম্বর ১৯৪০

২৭

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে।

উদয়ন
প্রাতে
২৮ নভেম্বর ১৯৪০

২৮

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা-কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ-অমৃতরূপে
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।

উদয়ন
প্রাতে
২৯ নভেম্বর ১৯৪০

২৯

দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়
ভাবিয়া না পাই মনে
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।
আপনারি মূঢ়তায় আপনারি রিপুর প্রশ্রয়ে
এ দুঃখের মূল জানি,
সে জানায় আশ্বাস না পাই।
এ কথা যখন জানি
মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,
তখন বুঝিতে পারি
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির;
একমাত্র তারা আছে আর কেহ নাই;
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন,
দুঃখ তাহাদের সত্য নহে
সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,

তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধ'রে
প্রতি ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়
ইতিহাসে চিহ্ন নাহি রাখে।

উদয়ন
প্রাতে
২৯ নভেম্বর ১৯৪০

৩০

সৃষ্টির চলেছে খেলা
চারি দিক হতে শতধারে
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে
সম্মুখে যা-কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে,
নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি
তাহাতেই দেয় তারে গতি।
কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকাআঁকি।
কাল যায় শূন্য থাকে বাকি।
এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিকা
ছেড়ে দেয় স্থান,
পারবতমান
জীবনযাত্রার করে চলমান টীকা।
মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়
সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়,
ভুলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ
ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

উদয়ন
প্রাতে
৩০ নভেম্বর ১৯৪০

৩১

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে;
বল যবে দৃঢ় কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরল রসে শুষ্কতার গান,
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান।
এ কথা সবাই জানে
যে সংগীতরসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোকসভা মাতে
সে যে হেয়
সে যে অশ্রদ্ধেয়

প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই এক ভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয়বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে।

উদয়ন
প্রাতে
৩০ নভেম্বর ১৯৪০

৩২

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান,
জ্যোতিস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।
রহি আমি দু-চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভ্যর্থনা,
অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে
রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
মনে হয় বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই,
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।

উদয়ন
প্রাতে
১ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৩

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে একগুচ্ছ ধূপ,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ,
যেন কোন্ পুরাণী আখ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপশিখা
মহাকালমন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্ পারে।
সদ্যস্নান-পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসে
অঙ্গের বাতাসে।

মনে হয় এই পূজারিনী
এরে আমি বার বার চিনি,
আসে মৃদুমন্দ পদে
চিরদিবসের বেদীতলে
তুলি' ফুল শুচিশুভ্র বসন-অঞ্চলে।
শান্ত স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে
সেই বাণী নিয়ে আসে এ যুগের ভাষার সৃষ্টিতে।
সুললিত বাহুর কঙ্কণে
প্রিয়জন-কল্যাণের কামনা বহিছে সযতনে,
প্রীতি আত্মহারা
আদি সূর্যোদয় হতে
বহি আনে আলোকের ধারা।
দূর কাল হতে তারি
হস্ত দুটি লয়ে সেবা-রস
আতপ্ত ললাট মোর আজো ধীরে করিছে পরশ।

উদয়ন
প্রাতে
২ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৪

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে
দাও নাই দেখা;
কেমনে জানিব সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম কাছে তুমি আসিলে যেমনি
তোমারি গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি;
মনে হল সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে।
বর্ষে বর্ষে পুষ্পবনে পুষ্পগুলি ফুটে আর ঝরে
এ মিলের তরে।
কবির সংগীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।
চলে লুকোচুরি খেলা বিশ্বে অনিবার
অজানার সাথে অজানার।

উদয়ন
প্রাতে
২ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৫

যেমন ঝড়ের পরে
আকাশের বক্ষতল করে অবারিত
উদয়াচলের জ্যোতিঃপথ
গভীর নিস্তব্ধ নীলিমায়,
তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
অতীতের বাষ্পজাল হতে,
সদ্য নব জাগরণ দিক শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।
প্রতীক্ষা করিয়া আছি
আলো হতে মুছে যাক রঙের প্রলেপ,
ঘুচে যাক ব্যর্থ খেলা আপনারে খেলেনা করিয়া,
নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে
শেষ মূল্য পায় যেন তার।
আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই;
সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,
নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে,
এই শেষ কথা মোর
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা।

উদয়ন
প্রাতে
৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৬

যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে
তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

উদয়ন
প্রাতে
৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৭

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ,
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

উদয়ন
প্রাতে
৪ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৮

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার।

উদয়ন
প্রাতে
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০

৩৯

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপিচুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে

দুই বাহু তুলি'।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে
দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

উদয়ন
প্রাতে
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০

সংযোজন

১

পাখি, তোর সুর ভুলিস নে—
আমার প্রভাত হবে বৃথা
জানিস কি তা।
অরুণ আলোর করুণ পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর
জাগে—
তুই ভোরের আলোর মিতা
জানিস কি তা।
আমার জাগরণের মাঝে
রাগিণী তোর মধুর বাজে
জানিস কি তা।
আমার রাতের স্বপন-তলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা
জানিস কি তা।

শান্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০

২

ওরা কাজ করে
নিরন্তর দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন গুন গুন স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের নিরুদ্দেশ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া
কোন্ সে অলক্ষ্য দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে— পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
যারা বাকি থাকে শেষে তারাও তো বাকি নাহি থাকে।
মৃত্যুর কবলে নামা যারে মনে হয় মহা ফাঁকি
তবুও যে ফাঁকি নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি,
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া—
চলমান রূপহীন বিরাট যে সেই
মহাক্ষণে যে রয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে তবুও যে নেই,
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা
খোলা আর ঢাকা
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্ব প্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলাইবে যাহে।

[গৌরীপুর-ভবন
কালিম্পং
২৪।২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০]

আরোগ্য

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে
কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিকবন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
ব'লে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

২

পরম সুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক
চিরপুরাতন বেদীতলে।
মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।

সব-কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
১২ জানুয়ারি ১৯৪১

৩

নির্জন রোগীর ঘর।
খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়ি-তলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলাপে
গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আম্রবনচ্ছায়ে
কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়,
ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার
রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।
পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেখেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা,
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতীরূপে প্রথম মানুষ
মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।

মনে মনে ভাবিয়াছি প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই ভাষা নাই;
চেয়ে দূরে দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
[পূর্বপাঠ : ৭ পৌষ। ২২ ডিসেম্বর ১৯৪০]

৪

ঘণ্টা বাজে দূরে।
শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার
মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,
আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক ব'সে
পাশে রাখি হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি,
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।

আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত-রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্ব-জয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দু'পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য-তীরে-তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা।
দূরে প্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা এক সারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলক-চাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে;
তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে

ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
[মূলপাঠ : ৩১ জানুয়ারি ১৯৪১। বিকাল]

মুক্ত বাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি,
বলে, ধন্য আমি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২৮ জানুয়ারি ১৯৪১

৬

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা
অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
২৪ জানুয়ারি ১৯৪১

৭

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,
হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ।
কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।
এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা;
আকাশের যেন কোন্‌ দূর কেন্দ্র হতে
উঠে ধ্বনি মিথ্যা মিথ্যা বলি।
প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ-দুর্গের শিখরে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
২৭ জানুয়ারি ১৯৪১

৮

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

৯

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা ল'য়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।

অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১০

অলস সময়ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল,
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লোহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১১

পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুনদিনের,
আজ এই সম্মানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা
যেথা আমি সাথীহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
শস্যহীন মরুময় তীরে।

যেখানে এ ধরণীর প্রফুল্ল প্রাণের কুঞ্জ হতে
অনাদৃত দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে
ছিন্নবৃন্ত চলিয়াছে ভেসে
বসন্তের শেষে।
তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,
যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে।
অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার,
ঘুচাইলে অবসাদ তার,
জানাইলে চিত্তে মোর লভি অনুক্ষণ
সুন্দরের অভ্যর্থনা, নবীনের আসে নিমন্ত্রণ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১২

দ্বার খোলা ছিল মনে, অসতর্কে সেথা অকস্মাৎ
লেগেছিল কী লাগিয়া কোথা হতে দুঃখের আঘাত,
সে লজ্জায় খুলে গেল মর্মতলে প্রচ্ছন্ন যে বল
জীবনের নিহিত সম্বল।
ঊর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি
অন্তরে দিগন্তপথে নামিল তখনি,
আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো
মুহূর্তে আঁধার-মেঘ দীর্ণ করি হৃদয়ে ছড়ালো।
ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান
লুপ্ত হল, নিখিলের আসনে দেখিনু নিজ স্থান,
আনন্দে আনন্দময়
চিত্ত মোর করি নিল জয়,
উৎসবের পথ
চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।
দুঃখ-হানা গ্লানি যত আছে,
ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১৩

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি,
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,

বাতাসেরে করি ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
৩০ জানুয়ারি ১৯৪১

১৪

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।
বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে;
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়
যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয়— সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৭ পৌষ ১৩৪৭
[২২ ডিসেম্বর ১৯৪০]

১৫

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।
আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেরে সে করে পরিহাস,
সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়,
আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয়;
সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,
পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম না-ই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।
তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়,
ভুলায়ে রাখিছে তারা দুর্বল প্রাণের পরাজয়;
এ কথা স্বীকার তারা করে
খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সুযোগ্য সক্ষমদের তরে;
তাহারাই করিছে প্রমাণ
অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই দান।
সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়
কিছু সে সহে না অপচয়,
সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৯ জানুয়ারি ১৯৪১

১৬

দিন পরে যায় দিন, স্তব্ধ বসে থাকি,
ভাবি মনে জীবনের দান যত কত তার বাকি
চুকায়ে সঞ্চয় অপচয়।
অযত্নে কী হয়ে গেছে ক্ষয়,
কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা ছিল দেয়,
কী রয়েছে শেষের পাথেয়।
যারা কাছে এসেছিল যারা চলে গিয়েছিল দূরে
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে।
অন্যমনে কারে চিনি নাই,
বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয় নি জানা ক্ষমা করে কে গিয়েছে চলে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।
কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আস্তরণময়
জোড়া লাগাবারে আর রবে না সময়।

জীবনের শেষপ্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি
আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে
এ কথাই ভাবি বারে বারে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১৭

যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়
দিনে দিনে সামর্থ্য ঝরায়,
যৌবন এ জীর্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি
কেবল শৈশব থাকে বাকি।
বন্ধ ঘরে কর্মক্ষুব্ধ সংসার-বাহিরে
অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।
বিত্তহারা প্রাণ লুব্ধ হয়
বিনামূল্যে স্নেহের প্রশ্রয়
কারো কাছে করিবারে লাভ
যার আবির্ভাব
ক্ষীণজীবিতেরে করে দান
জীবনের প্রথম সম্মান।
'থাকো তুমি' মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
শুধু বেঁচে থাকিবার।
এ বিস্ময় বারবার
আজি আসে প্রাণে,
প্রাণলক্ষ্মী-ধরিত্রীর গভীর আহ্বানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২১ জানুয়ারি ১৯৪১

১৮

ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক
অনাদরের শস্য গজায় তুচ্ছ দামের শাক।
আঁচল ভ'রে তুলতে আসে গরিব-ঘরের মেয়ে,
খুশি হয়ে বাড়িতে যায়, যা জোটে তাই পেয়ে।
আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই
পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্থর দিন চালাই।
জমিতে রস কিছু আছে শক্ত যায় নি আঁটি,
ফলায় না সে ফল তবুও সবুজ রাখে মাটি।

শ্রাবণ আমার গেছে চলে নাই বাদলের ধারা,
অঘ্রান সে সোনার ধানের দিন করেছে সারা।
চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১০ জানুয়ারি ১৯৪১

১৯

দিদিমণি,
অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।
এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারি দিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে;
আশ্বাসের বাণী সুমধুর
অবসাদ করি দেয় দূর।
এ স্নেহমাধুর্যধারা
অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা;
অবিরাম পরশ চিন্তার
বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইয়া তারে দেখি,
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২ জানুয়ারি ১৯৪১

২০

বিশুদাদা—
দীর্ঘবপু দৃঢ়বাহু দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার
সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার।
তন্দ্রার আড়ালে
রোগক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে
মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে

বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে,
নির্নিমেষ নক্ষত্রের মাঝে
যেমন জাগ্রত শক্তি নিঃশব্দ বিরাজে
অমোঘ আশ্বাসে
সুপ্ত রাত্রে বিশ্বের আকাশে।
যখন শুধায় মোরে দুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে
মনে হয় নাই তার মানে,
দুঃখ মিছে ভ্রম
আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।
সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান
বলের সম্মান।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৯ জানুয়ারি ১৯৪১

২১

চিরদিন আছি আমি অকেজোর দলে;
বাজে লেখা বাজে পড়া দিন কাটে মিথ্যা বাজে ছলে।
যে গুণী কাটাতে পারে বেলা তার বিনা আবশ্যকে
তারে 'এসো এসো' ব'লে যত্ন ক'রে বসাই বৈঠকে।
কেজো লোকদের করি ভয়,
কব্‌জিতে ঘড়ি বেঁধে শক্ত করে বেঁধেছে সময়—
বাজে খরচের তরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নেই হাতে,
আমাদের মতো কুঁড়ে লজ্জা পায় তাদের সাক্ষাতে।
সময় করিতে নষ্ট আমরা ওস্তাদ,
কাজের করিতে ক্ষতি নানামতো পেতে রাখি ফাঁদ।
আমার শরীরটা যে ব্যস্তদের তফাতে ভাগায়,
আপনার শক্তি নেই পরদেহে মাশুল লাগায়।
সরোজদাদার দিকে চাই
সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই,
সময়ের ভাণ্ডারেতে দেওয়া নেই চাবি,
আমার মতন এই অক্ষমের দাবি
মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবসর,
দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর।
দ্বিপ্রহর রাত্রিবেলা স্তিমিত আলোকে
সহসা তাহার মূর্তি পড়ে যবে চোখে
মনে ভাবি আশ্বাসের তরী বেয়ে দূত কে পাঠালে,
দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন কাটালে।
দায়হীন মানুষের অভাবিত এই আবির্ভাব
দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৯ জানুয়ারি ১৯৪১

২২

নগাধিরাজের দূরে নেবু-নিকুঞ্জের
রসপাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা,
অজানা নির্ঝরিণীর
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার
হিরণ্ময় লিপি,
সুনিবিড় অরণ্যবীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।
রোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

[শান্তিনিকেতন
২৫ নভেম্বর ১৯৪০]

২৩

নারী তুমি ধন্যা,
আছে ঘর আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এস শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি-বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী
তাঁহারি আপন সহকারী।
উন্মুক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ,
নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে জগৎ,
শ্রীহারা যে তার 'পরে তোমার ধৈর্যের সীমা নাই,
আপন অসাধ্য দিয়ে দয়া তব টানিছে তারাই।
বুদ্ধিভ্রষ্ট অসহিষ্ণু অপমান করে বারে বারে
চক্ষু মুছে ক্ষমা কর তারে।
অকৃতজ্ঞতার দ্বারে আঘাত সহিছ দিনরাতি,
লও শির পাতি।
যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনা-মাঝে
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।

দেবতারে যে পূজা দেবার
দুর্ভাগারে কর দান সেই মূল্য তোমার সেবার।
বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।
ভ্রষ্ট যেই ভগ্ন যেই বিরূপ বিকৃত
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১৩ জানুয়ারি ১৯৪১

২৪

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।
মর্যাদা নাইকো তার তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
২৩ জানুয়ারি ১৯৪১

২৫

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা-সম।
সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা-কক্ষপথে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০

২৬

এ কথা সে কথা মনে আসে
বর্ষাশেষে শরতের মেঘ যেন ফিরিছে বাতাসে।
কাজের বাঁধনহারা শূন্যে করে মিছে আনাগোনা,
কখনো রূপালি আঁকে কখনো ফুটায়ে তোলে সোনা।
অদ্ভুত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে
রেখার বদল করে পুনঃ পুনঃ যেন অন্যমনে।
বাষ্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেলা,
কোনোখানে দায় নেই তাই তার অর্থহীন খেলা।

জাগার দায়িত্ব আছে কাজ নিয়ে তাই ওঠাপড়া।
ঘুমের তো দায় নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া।
মনের স্বপ্নের ধাত চাপা থাকে কাজের শাসনে,
বসিতে পায় না ছুটি স্বরাজ-আসনে।
যেমনি সে পায় ছাড়া খেয়ালে খেয়ালে করে ভিড়।
স্বপ্ন দিয়ে রচে যেন উড়ুক্ষু পাখির কোন্‌ নীড়।
আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।
তাহারে দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উন্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
২৩ জানুয়ারি ১৯৪১

২৭

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।
মূল্য তার থাকে যদি
দিনে দিনে হয় তাহা জানা
হাতে হাতে ফিরে।
অকস্মাৎ পরিচয়ে বিস্ময় তাহার
ভুলায় যদি বা,
লোকালয়ে নাহি পায় স্থান
মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,
লালিত যা গোপনের
প্রকাশ্যের অপমানে
দিনে দিনে মিশায় বালুতে।
পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা
যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান
সাহিত্যের ভাষামহাদ্বীপে
প্রাণহীন প্রবালের মতো।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

২৮

মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে
অকেজো অলস বেলা ভরে ওঠে শেলাইয়ের কাজে।
অর্থভরা কিছুই-না চোখে ক'রে ওঠে ঝিলমিল
ছড়াটার ফাঁকে ফাঁকে মিল।
গাছে গাছে জোনাকির দল
করে ঝলমল;
সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে
টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।
মেঠো গাছে ছোটো ছোটো ফুলগুলি জাগে,
বাগান হয় না তাহে রঙের ফুট্‌কি ঘাসে লাগে।
মনে থাকে কাজে লাগে সৃষ্টিতে সে আছে শত শত
মনে থাকবার নয় সেও ছড়াছড়ি যায় কত।
ঝরনায় জল ঝ'রে উর্বরা করিতে চলে মাটি,
ফেনাগুলো ফুটে ওঠে পরক্ষণে যায় ফাটি ফাটি।
কাজের সঙ্গেই খেলা গাঁথা—
ভার তাহে লঘু রয় খুশি হন সৃষ্টির বিধাতা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
২৩ জানুয়ারি ১৯৪১

২৯

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ।
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।
জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞমনে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২৮ জানুয়ারি ১৯৪১

৩০

ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যত যায় স্খলি
প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার

অন্ধকার-আলোকের সাগরসংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে।
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।
নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন
যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সত্তারে
সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

৩১

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল
বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত-আভার,
সময় যাবার
শান্ত হোক স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।

[৭ ও ১৮ পৌষ-মধ্যে। ১৩৪৭
২২।১২।৪০-২।১।৪১]

৩২

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি জ্যোতিউৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

[৭ পৌষ ১৩৪৭]

৩৩

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সন্ধ্যা
১১ মাঘ ১৩৪৭
[২৪ জানুয়ারি ১৯৪১]

জন্মদিনে

১

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সদ্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন-'পরে।
পরম গাম্ভীর্যে যুগে যুগে
ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য-মাঝে,
অভ্রভেদী সুদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া
দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে
উদয়-অস্তের চক্রপথে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ওই নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। সকাল

২

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর

সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

৪

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

৫

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখান্বিত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;

নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

মংপু
[২২] বৈশাখ ১৩৪৭
[রবিবার। ৫।৫।১৯৪০]

৬

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

মংপু
২৩ বৈশাখ ১৩৪৭
৬।৫।৪০

৭

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরী
নমস্কারসহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু
২৩ বৈশাখ ১৩৪৭
৬।৫।৪০

৮

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

মংপু
[২৩] বৈশাখ ১৩৪৭
[৬।৫।৪০]

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল,
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল,
শুধু এ সাঁতার
কখনো এ পারে চলা কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গি জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।

মংপু
২।৫।৪০

১০

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহা জনশূন্যতায় দীর্ঘ রাত্রি করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে,
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।
এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক্‌ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূর যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১৮ জানুয়ারি ১৯৪১

১১

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার জানি না সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।

সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।

[মংপু
২ মে ১৯৪০]

১২

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে,
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।
আজ সব কথা
মনে হয় শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে

ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন।
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ জানি না তো শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে
মর্ত্যজীবনের কাজে।
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।

মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
প্রাতঃকাল
৬ মাঘ ১৩৪৭
[১৯।১।৪১]

১৩

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
এ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে,
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।
খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১১ মাঘ ১৩৪৭
[২৪.১.৪১]

১৪

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ-যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০
[৯ আশ্বিন ১৩৪৭]

১৫

মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটীর;
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য বেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে;
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ-অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয় ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্রহিমরেখাঙ্কিত মহা নিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।
গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে।
পার্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে;
রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,

কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগ-যুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১৬

দামামা ওই বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।
কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা,
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।
জমে-ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।
দুর্বলা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।
অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত,
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে,
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে
জীর্ণ যুগে সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি
দামামা তাই ওই উঠেছে বাজি।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
৩১ মে ১৯৪০

১৭

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমতো প্রাণযাত্রা-কল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষা-নিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে,
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০

১৮

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।

তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

[সেপ্টেম্বর ১৯৩৩]

১৯

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি দোতলার 'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথীহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সমুখে নীচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে,
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আল্‌পনায় রঙ দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর।
বৃদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন
বয়স-অতীত সেই বালকের মন
নিখিল প্রাণের পেত নাড়া,
আকাশের অনিমেষ নয়নের ডাকে দিত সাড়া
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
নাড়ীতে উঠিত নেচে।
জাগ্রত ছিল না বুদ্ধি, বুদ্ধির বাহিরে যাহা তাই
মনের দেউড়ি-পারে দ্বারী-কাছে বাধা পায় নাই।
স্বপ্নজনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা রূপে
পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চুপে চুপে
পাতার ভেলায়
নিরর্থ খেলায়।
টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি,
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
নিজেরে ভাবিত সেনাপতি,

পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।
যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে
এমনি সকাল তার কাটে।
জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ
আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন,
বাহিরের করতালিহীন।
সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘশিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর
মনে হত সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর।
দম্ ক'রে মনে মনে ছুটিত বন্দুক
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
চারি দিকে শাখায়িত সুনিবিড় প্রয়োজন যত
তারি মাঝে এ বালক অর্কিড-তরুকার মতো
ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে
দোলে শুধু খেলার বাতাসে।
যেন সে রচয়িতার হাতে
পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।
আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাবনিকাশ
দিগ্‌দিগন্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশনবিকাশ,
বিধাতার ছেলেমানুষির
খেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হল চৌচির।
আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত,
প্রশস্ত সে ছাত,
সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্য দ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।
এ সংসারে কী হতেছে কেন,
ভাগ্যের চক্রান্ত কোথা কী যে,
প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাসা করে নি কভু নিজে।
এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমানুষির
বয়স্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুক হাসির,
বালকের জানা ছিল না তা।
সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা।
সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা,
বুদ্ধির ভর্ৎসনা নাই, নাই সেথা প্রশ্নের পাহারা,
যুক্তির সংকেত নাই পথে,
ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে।

২০

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে,
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি,
বিচিত্র তাদের ভঙ্গি, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিঃশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।
গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।

মর্মরমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকান্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবন্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্যলোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতি ক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে
ঘুমের ভাঁটার জলে
নাহি পায় বাধা,
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা,
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল;
যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা,
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গি তার।

মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি,
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

২১

রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর-গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।
অসন্তুষ্ট বিধাতার

ওরা দূত বুঝি,
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি
ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হতে সীমান্তরে,
রাষ্ট্রমদমত্তদের মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে
আবর্জনাকুণ্ডতলে।
মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা-অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দয়
আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে
ধূলিসাৎ করে
ভূরিভোজী বিলাসীর
ভাণ্ডারপ্রাচীর।

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২২ মে ১৯৪০

২২

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ
রাজমুকুটেরে নিত্য করিছে কুৎসিত অপমান,

অসহ্য তাহার দুঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ।
মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত,
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকট দিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২৪ জানুয়ারি ১৯৪১

২৩

জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত্য এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্যলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৪৭
[২২। ১২। ১৯৪০]

২৪

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুরবেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।
হঠাৎ হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুন দিনের যাবার পথে।

সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায়
শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
সাথীহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তুলির টানে;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ওই ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
সংকেতঝংকার,
আঙুলের ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে।
গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

বাধা পায় বাধা কাটায় চিত্রকরের তুলি।
সেই বাধা তার কখনো বা হিংস্র অশ্লীলতায়
কখনো বা মদির অসংযমে।
মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।
রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

২৫

জটিল সংসার,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বারংবার।
গম্য নহে সোজা,
দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা।

পথে পথে যথাতথা
শত শত কৃত্রিম বক্তৃতা।
অনুক্ষণ
হতাশ্বাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যাধারা।
বিরাট আকাশে
বনে বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে
অন্তহীন শান্তি-উৎসস্রোতে।
অন্তঃশীল যে রহস্য আঁধারে আলোতে
তারে সদ্য করুক আহ্বান
আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান।
আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।

[গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৭ মে ১৯৪০]

২৬

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে।
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে
নাইকো ভর্ৎসনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
বিকাল
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

২৭

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা—তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।
চৌদিকে ধূসরবর্ণ আবরণ নামে
মন বলে, ঘরে যাব।
কোথা ঘর নাহি জানে।
দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী
সম্মুখে নীরন্ধ্র অন্ধকার।
সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্ত্যের ঋণ-করা সাজসজ্জা যত
প্রক্ষিপ্ত যা-কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস
আঁধারে অবগাহন-স্নানে
নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।
জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে।

২৮

নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে
সে আমার রচেছিল জন্মদিন,
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা

ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের নানা অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
দুপুর
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

২৯

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
তোমাদের আবেষ্টন, চলাফেরা, চারি দিকে ঢেউ ওঠা-পড়া
সবই চেনা জগতের তবু তার আমন্ত্রণে দ্বিধা,
সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আনে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।
আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,
ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান, তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা-মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
সকাল
৯ মার্চ ১৯৪১.

সংযোজন

[১]

অবিচার

নারীর দুখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো।
জানো কি এ অন্যায় সমাজের হিসাবে
নিমেষে নিমেষে কত হলাহল মিশাবে?
পুরুষ জেনেছে এটা বিধি নির্দিষ্ট
তাদের জীবন-ভোজে নারী উচ্ছিষ্ট।
রোগ-তাপে সেবা পায়, লয় তাহা অলসে—
সুধা কেন ঢালে বিধি ছিদ্র এ কলসে!
সমসম্মান হেথা নাহি মানে পুরুষে,
নিজ প্রভুপদমদে তুলে রয় ভুরু সে।
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমণী
তাতেই তো নাড়ীছাড়া এ দেশের ধমণী।
বুঝিতে পারে না ওরা—এ বিধানে ক্ষতি কার।
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার।
একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে
দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে
অর্ধেক-কালি-মাখা সমাজের বুকটা
খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।
এত কথা বৃথা বলা—যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা,
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ ১৩৪৭
[১৯ ডিসেম্বর '৪০]

[২]

প্রচ্ছন্ন পশু

সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা!
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ বলে গণ্য হয়ে আছে!
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে

ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার—
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা! হায় রে মানুষ!
ইতিহাসবিধাতারে ডেকে ডেকে বলি—
প্রচ্ছন্ন পশুর শান্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে!

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০
[৯ পৌষ '৪৭]

[৩]

ফসল গিয়েছে পেকে,
দিনান্ত আপন চিহ্ন দিল তারে পাণ্ডুর আভায়।
আলোকের ঊর্ধ্বসভা হতে
আসন পড়িছে নুয়ে ভূতলের পানে।
যে মাটির উদ্বোধন বাণী
জাগায়েছে তারে একদিন,
শোনে আজি তাহারই আহ্বান
আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে।
সে মাটির কোল হতে যে দান নিয়েছে এতকাল
তার চেয়ে বেশি প্রাণ কোথাও কি হবে ফিরে দেওয়া
কোনো নব জন্মদিনে নব সূর্যোদয়ে!

ছড়া

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়্‌ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্‌ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

স্পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কী।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়ম-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে,

ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

উদয়ন
৫ জানুয়ারি ১৯৪১

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি।
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।
রামছাগলের ভারী গলায় ভ্যা ভ্যা রবের ডাকে
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া,
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মণ্ড-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।
লোকে বলে কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট উপর-নামন নীচে,
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া,
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া;
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,

বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চ'ড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

কালিম্পং
১৫ মে ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে
চড়ায় প'ড়ে নৌকোডুবি
হল যখন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে,
পাঁচ মোহনার কংলু ঘাটে
ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে।
আসামেতে সদ্‌কি জেলায়
হাংলু-ফিড়াঙ পর্বতের
তলায় তলায় ক'দিন ধরে
বইল ধারা শর্বতের।
মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি
ডিগবাজি খায় কাৎলা,
চাঁদামাছের সরু জঠর
রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশমাছের
জলপানে আর রুচি নাই,
চিতলমাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই—
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
মিঠাই-গজার ছোটোভাই।
মেছোনিকে গিন্নি বলেন,
ঝুড়ির ঢাকা খুলো না,
মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
এ মৌরলার তুলনা।

বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল;
বিধাতা কি শেষ বয়সে
ময়রা-দোকান খুলল।
যতীন ভায়ার মনে জাগে
ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
গল্‌ব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে
চিনি জমছে কি ওরই।
খগেন বলে, মাছের মধ্যে
মাধুর্য নয় পথ্যাচার,
চচ্চড়িতে মোরব্বাতে
একাত্মবাদ অত্যাচার।
বেদান্তী কয়, রসনাতে
রসের অভেদ গলতি,
এমন হলে রাজ্যে হবে
নিরামিষের চলতি।
ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
জামাইষষ্ঠী পার্বণে,
খাওয়ায় তাকে যত্ন করে
শাশুড়ি আর চার বোনে।
মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
উঠল জেগে বকুনি,
হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
করলে শুরু তখুনি,
কলিযুগের নিমক খেয়ে
আমরা মানুষ সকলেই,
হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
সত্যযুগের নকলেই
সব জাতেরই নিমকি থেকে
নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,
চিনির বলদ জোড়ে এসে
সকল মিটিং কমিটি,
চোখের জলেই নোন্‌তা হবে
বাংলাদেশের জমিটি।
নোনার স্থানে থাকবে নোনা
মিঠের স্থানে মিষ্টি,
সাহিত্যে বা পাকশালাতে
এরেই বলে কৃষ্টি।
চিনি সে তো বার-মহলের
রক্তে বসত নোন্‌তার,

দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
নুন যে আপন ধন তার।
সাগরবাসের আদিম উৎস
চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
নির্বাসনের দুঃখটা তার
আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়।
অতএব এই—কী পাগলামি,
কলম উঠল খেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।
কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
বৈশাখের এই রোদে,
চোখের সামনে দেখছে কেবল
মাছের ডিমের বোঁদে।
ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
রসের অনাবৃষ্টি,
উলটো-পালটা না হয় যেন
নোন্‌তা এবং মিষ্টি।

[মংপু
২৮ এপ্রিল—২ মে ১৯৪০]

৩

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধ'রে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ,
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
'রানাঘাট সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
আঠারোই অঘ্রানে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বৈ কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।

ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি;
পুলিস বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি।
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ-সব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসি শস্যে।
সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।
ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো,
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো;
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।
আর-এক সাক্ষীর আর-এক জবানি,
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেব্‌ড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেব্‌ড়ে।
শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য,
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।
জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল;
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল।
মাঝে মাঝে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব!
কোন্‌ বংশে যে মোর জন্ম তা জান তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত।
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী, জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।
ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।
জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে

তার কথা বলি যদি—এই ব'লে বলাটা
শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা।
তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই, অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চারজন করেছিল গোলমাল,
লালপাগড়ি সে এসে বলেছিল, তোল্ মাল।
গুড়ের কলসিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের খোঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল;
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার,
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে-যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাব্‌লিশ না ক'রে
সব শেষ পাতে দিল বর্জাই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।
ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী,
সহ্য না হল সেটা শুনেছে বা ক'জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।
আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।
হিতসাধিনী সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দু-ভাগ হল মাগুরার কলেজে,
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু-দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।
ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস করে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই।

একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable—
এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ,
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ,
গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ডকে সেলাম করি, বলি, ভাই বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেল-ছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলে দুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

উদয়ন
৯ মার্চ ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে।
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির,
জজ সা'ব কী ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।
সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে, পিছে ঝাড়ুবরদার।
উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—

বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাটটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখরোট খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণা-বিভাগে
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়িতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জার গুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী,
নাইল-তটিনীতট-বিহারিণী কিশোরী।
রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্‌ডনেতে।
বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়,
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে,
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বার্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাতপাকা, জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।
বিড়ালের দেখা নাই—ঘরেও না, বনে না,
মি-আঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো।
পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।
জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান;
পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান।
মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ;
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী।
হুজুর—পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি।
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়

বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায়।
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এ'টে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।

উদয়ন
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউল-চূড়ার ত্রিশূলে;
কলুবুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাঁচমিশুলে।
চাষী খেতের সীমানা দেয়
উঁচু ক'রে আল তুলে,
নদীতে জল কানায় কানায়
ডিঙি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা,
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে
চলে নাপিত-বউটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,
পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা সুপুরি।
বর্ষাজলের ঢল নেমেছে,
ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
যাচ্ছে দেখা আধখানা।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী কনের বর,
ড্যাংড্যাঙাড্যাং বাদ্যি বাজে,
চড়কডাঙায় ঘর।

ভাগুমালী লাউডাঁটাতে
ভরেছে তার ঝাঁকাটা,
কামার পিটোয় দুম্‌দুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকাটা।
মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে
চলতি গাড়ির ধোঁয়াতে
আকাশ যেন ছেয়ে চলে
কালো বাঘের রোঁয়াতে।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগিয়ে দিল গলিটা,

গিন্নিরা দেয় ছেঁড়া কাপড়
ভর্তি ক'রে থলিটা।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন সেজো বউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
সবার চেয়ে কেজো বউ।
গামলা চেটে পরখ করে
দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,
উঠোনের এক কোণে জমা
রান্নাঘরের গাদা ছাই।
ভালুকনাচের ডুগ্‌ডুগি ওই
বাজছে পাইকপাড়াতে,
বেদের মেয়ে বাঁদরছানার
লাগল উকুন ছাড়াতে।
অশথতলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোজে তার,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে তার।
ছকুমালী খেতের থেকে
তুলছে মুলো ভাদুরে,
পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে
ছেলেটা তার আদুরে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই
মাঠ হয়ে যায় জলে জল।
কচুর পাতায় ঢেকে মাথা
সাঁওতালী সব মেয়েরা
ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে
কাঁচা কাঁচা পেয়ারা।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট থেকে যায় হাটুরে;
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।
নিমের ডালে পাখির ছানা
পাড়তে গেল ওরা কি;
পকেট ভরে নিয়ে গেল
কাঠবিড়ালির খোরাকি।
হালদারদের মেয়েটা ওই
দেখি তারে যখুনি
মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়,
মা এসে দেয় বকুনি।

গোলাকৃতি গড়নটা ওর,
সবাই ডাকে বাতাবি,
খুদু বলে, আমার সঙ্গে
সাঙাৎনি কি পাতাবি।
পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে
তেলের শিশির কাঁচ-ভাঙা,
জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায়
বসে আছে মাছরাঙা।
দক্ষিণে ওই উঠল হাওয়া,
বৃষ্টি এখন থামল কি।
গাছের তলায় পা ছড়িয়ে
চিবোয় ভুলু আমলকী।
ময়লা কাপড় হিস্‌হিসিয়ে
আছাড় মারে ধোবাতে;
পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে
আঁচল মেলে ডোবাতে।
পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে
ঘোষপুকুরের কিনারায়
মাসিক-পত্র পড়ছে বসে
থার্ড ইয়ারের বীণা রায়।
বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে
লক্‌লকি।
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে
ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই
ড্যাড্যাংড্যাঙ।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে
ডাকছে ব্যাঙ।

উদীচী
২১ অগস্ট ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশজনারই শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়া সরকার।
বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে।

দমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি—
সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশল তাতে গুড় কি।
সর্ষে যে চাই মন দু-তিনেক ঝোলে ঝালে ঘাটনায়,
কালুবাবু তারই খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।
ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপ্‌ড়ি।
নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙশালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড়খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়া-পড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কি-দেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে,
মেছনি তার সাত গুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও-পারেতে খড়াপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্‌শিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিয়োতে খবর জানায় বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায় সঙ্গে গেল চিন্তে,
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি পাল্কি চড়ে চলল,
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাং খটাং,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।

খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা,
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পর্দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা রেডিয়ো তাই জানায়
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্‌ বাজে ইস্টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে, গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে ল্যাজ দুলিয়ে নাচে,
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্‌ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে,
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়গ্‌পুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাংড্যাঙ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর,
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্‌ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাঁ গোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত,
মেশিন্‌গান-এ, গুঁড়িয়ে দিল সভ্যাবিধির ভিত।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে,
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া.
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।

তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাত পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানটা পেঁচোয় দানোয় পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির নয় সে পরিষ্কার,
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে ঘুনে ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
লোকে বলে, সত্যি নাকি ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার।

উদয়ন
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৭

গলদা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যপীরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরানহাটায় শজনেডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন,
চিৎপুরে ওই নাগা সন্ন্যাসী
কাৎ হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
সর্ষেখেতের চাষী;

কাঁচালঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োনচাঁদের মাসি।
পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা;
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠন্‌ঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা;
মুখ ভেংচিয়ে হেডমাস্টার
মন্তুরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা;
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ওই
চণ্ডীচরণ সেন জা।
শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র;
হাজি মোল্লার দাঁড়িমাল্লার
বাকি একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় সিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়;
কনেস্টেবল পেতেছে টেব্‌ল
খুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরেপোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পণ্ডু;
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
তুলো বের-করা বালিশ;
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা;
নেড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
শেষ হল রামযাত্রা।

পুনশ্চ
১৯ নভেম্বর ১৯৪০

৮

রাস্তিরে কেন হল মর্জি,
চুল কাটে চাঁদনির দর্জি।
চুমরিয়ে দিল তার জুল্‌ফি,
নাপিত আদায় করে full fee।

চাঁদনির রাঁধ্‌নি-সে আসে যায়,
বঁড়শি বেহালা থেকে বাস-এ যায়।
ভব্‌রাম ওর পাড়াপড়শী,
বেচে সে লাঠাই আর বঁড়শি।
আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
আর বেচে চা খাবার পেয়ালা।
চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখ্‌নি,
সইল না গিন্নির বকুনি।
কটকের নেত্ত মজুমদার,
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।
কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মণ ওজনের ধাক্কা।
হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা—
ঘড়িতে যে সবে সাড়ে-আটটা।
চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে।
তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান
বাজখাঁই সুরে বলে, আলো আন্‌।
নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ।
ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে।
তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
মোজা জোড়া খুড়দার বাইজির।
পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি,
ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী।
বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন।
শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন
শাশুড়ির মুখঢাকা বুরখায়,
পাছে তারে ঠেলা মারে গুর্খায়।
চুরি গেছে গুর্খার ভেঁপুটি,
এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি।
ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই;
কোনোখানে দাঁতনের কাঠি নেই।
দাঁতনের খোঁজে লাগে খটকা,
পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।
গাওয়া ঘি সে নয় সে যে ভয়ষা,
সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।
বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা;
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।
উমেদার এল আজ পয়লা
গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।

পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না,
পদ্মরে ছেড়ে খাঁদু নড়ে না।
পদ্ম সেদিন মহা বিব্রত,
বুধবারে ছিল তার কী ব্রত।
ভাশুর পড়ল এসে সুমুখে,
দুধ খেয়ে নিল এক চুমুকে।
চেপে এল লজ্জা শরমটা,
টেনে দিল দেড়-হাত ঘোমটা।
চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের,
গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের।
সঙ্গে নিয়েছে চার গুণ্ডা
বেছে বেছে পালোয়ান ষণ্ডা।
তাল ঠোকে রামধন মুন্সি,
কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি।
দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
ভালো করে ডাক্তার দেখা সে।
বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার,
আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার;
ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়,
একদম চলে গেল মগরায়।
মগরায় খুদি নিয়ে খুঙ্তে
খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে—
যেই হল তিন কুড়ি পাঁচটা,
দেখে নিল উনুনের আঁচটা।
ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
তখনি চড়িয়ে দিল খিচুড়ি।
হল না তো চালে ডালে মেলানো,
মুশকিল হবে ওটা গেলানো।
সাড়া পায় মাছওয়ালা মিন্সের,
বলে, পাকা রুই চাই তিন সের।
বনমালী মাছ আনে গামছায়,
বলে, ও যে এক্ষুনি দাম চায়।
আচ্ছা সে দেখা যাবে কালকে,
ব'লেই সে চলে গেল শালকে।
মুন্সি যখন লেখে তৌজি,
জলে নামে শালকের বউ ঝি।
শালকের ঘাটে ভাঙা পাল্কি:
কালু যাবে বানিচঙে কাল কি।
বানিচঙে ঢেঁকি পাকা গাঁথ্নি,
ধান কোটে কালুদার নাৎনি।
বানিচঙ কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়,
কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।

ফুটবলে বনগাঁর মোক্তার
যত হারে, তত বাড়ে রোখ তার।
তার ছেলে হরেরাম মিত্তির,
আঁক ক'ষে ব্যামো হল পিত্তির।
মুখ চোখ হয়ে গেল হোলদে,
ওরে ওকে পলতার ঝোল দে।
পলতা কিনতে গেল ধুবড়ি,
কিনল গুগলি এক চুবড়ি,
হুগলির গুগলি কী মাগ্গি,
ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগ্যি।
ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
ফাউ পেল কাগজ দু-বস্তা
দেখে বলে নীলমণি সরকার,
কাগজে হরুর খুব দরকার;
জ্যামিতি অতীত তার সাধ্যর,
যতই করুন তারে মারধোর।
কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
পেন্সিলে কাটে ব'সে সার্‌কেল্‌।
সার্‌কেল্‌ কাটতে সে কী বুঝে
খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে।
সইতে পারে না তার চাপুনি,
পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।
শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠান্ডা
হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পান্ডা।
অবেলায় খেতে বসে দারোগা,
সির সির ক'রে ওঠে তারো গা।
টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
ডাক্তার এল তার বাড়িতে।
সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নন্দর,
চিহ্ন রাখে না খেত খন্দর।
নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়,
সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়।
গোনে ব'সে তিন চার পাঁচ সাত,
আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত।
গুনে গুনে পারে না যে থামতে,
গল্‌গল্‌ ক'রে থাকে ঘামতে।
নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
মনে পড়ে পয়ারের পদ্য।
কাশীরাম দাসে আনে পুণ্য,
দশে আর বিশে লাগে শূন্য।
কাশীরাম কাশীরাম বোল দেয়,
সারাদিন মনে তার দোল দেয়।

আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে,
নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে।
হাটখোলা শ্বশুরের গদি তার,
সেইখানে বাসা মেলে যদি তার
এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ,
তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ।
আর নয়, আর নয়, আর নয়,
কখনোই দুই তিন চার নয়।

উদীচী
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

৯

আজ হল রবিবার—খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন; যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ
যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ।
'বার্তাকু' লিখে দিল, গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পঞ্জাবি গোয়ালায়।
বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ-কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড় ভুষি ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুলমাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।

'গদাধরে' রেগে লেখে, এ কেমন ঠাট্টা,
বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো,
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে
ঝরিয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।

গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায়।
বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।
এ-সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ-দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়।
গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, ভায়া এ জগতে ঠাট্টা-সে ঠাট্টাই,
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।

অবশেষে এ-দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

উদয়ন
১৭ মার্চ ১৯৪০

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাঁজি দেখে সতেরোই চৈত্তির।
বলে, আজ যেতে হবে মথুরায়,
সেথা তার মামা আছে সতু রায়।
বেস্পতিবারে গাড়ি চ'ড়ে তার,
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুরলে,
ফিরে এসে চলে গেল সুরুলে।
ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
সেথা আছে সেজো মাসি মেসো আর।
এসে দেখে একা আছে বউ সে,
মেসো গেছে পানিপথে পৌষে।
হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই
বাঙালি সে ধরা পড়ে সাজেতেই।
চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম মারো গা।
ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়্‌কি।
ঠোক্কর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়,
কুক্ষণে পা দুখানা মোচকায়।

শেষে গেল সুলতানপুরে সে,
গান ধরে মুলতান-সুরে সে।
বেলাশেষে এল যবে বাম্‌ড়ায়
কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়,
বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়,
গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়।
গোরুটা পড়ল মুখ থুবড়ি
ক্রোশ দুই থাকতেই ধুবড়ি।
কাটিহারে তুলে তাকে ধরল,
তখন সে পেট ফুলে মরল।
শুনেছে তিসির খুব নামো দর
তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর।
দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়।
শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয়
হাউ হাউ শব্দে গা মুচড়োয়।
নাড়াজোলে বড়োবাবু তখুনি
শুরু করে বংশুকে বকুনি।
বংশুর যত হোক খাটো আয়
তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়।
বাঁধা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার
ধার দিলে মতিরাম সর্দার।
শাঁখা চাই বলতেই শাঁখারি
বলে, শাঁখা আছে তিন টাকারই।
দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিস-থানায় হল সব শেষ।
সাসারামে চলে গেল লোক তার
খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।
সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
অনুকূল চলে গেছে জসিদি।
পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে।
মা ওদিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়।
ডাক্তার তিনকড়ি সান্ডেল
বদলি করেছে বাসা বান্ডেল।
তাই লোক পাঠায় কোদার্‌মায়,
চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়।
সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
তার পরে গেল পাঁচথুপি সে।

সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার,
ঝগড়া হোটেলবাবু-সাথে তার।
অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে।
রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি
সাত টাকা মাইনের আধ-রাজি।
লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
খিদেটা মেটায় শসা কাঁকুড়ে।
পোঁছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
হাঁসফাঁস করে তার মন যে।
বাসা খুঁজে সাথী তার কাঙলা
খুলনায় পেল এক বাঙলা।
শুধু একখানা ভাঙা চৌকি,
এখানেই থাকে মেজো বউ কি।
নেমে গেল যেথা কানু জংশন,
ভিমরুলে করে দিল দংশন।
ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে
জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে।
চুন কিনতে সে গেল কাটনি,
কিনে এল আমড়ার চাটনি।
বিকানীরে পড়ল সে নাকালে,
উটে তাকে কী বিষম ঝাঁকালে।
বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
তাই খুশি মনে গেল মশুরি।
শ্বশুর উধাও হল না ব'লে,
জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে।
জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে,
ঝাঁকা থেকে মুরগিটা নাকে তার
ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার।
নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়,
গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায়।
কানপুরে হতে এল পণ্ডিত,
বলে এরে করা চাই দণ্ডিত।
লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শত শতবার,
নাক তার শুচি হবে ততবার।
তার পরে হল মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।
শালা ছিল জমাদার থানাতে,
ভোজ দিল মোগলাই খানাতে।

জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হল মেয়ো হাঁসপাতালে।
তার পরে কী যে হল শেষটা
খবর না পাই ক'রে চেষ্টা।

উদয়ন
৭ মার্চ ১৯৪০

১১

মাঝরাতে ঘুম এল—লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুদু বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকো;
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চ'ড়ে, খুড়ো বলে, আহা
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে,
বলে, আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে।
তাড়া খেয়ে ন্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি;
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি।
কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মান্থলি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ কালটা,
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা;
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর
জানি নে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর।

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। বিকাল

শেষ লেখা

১

সম্মুখে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

পুনশ্চ। শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯
বেলা একটা

২

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সবচেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সব-কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে,
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

৭ মে ১৯৪০

৩

ওরে পাখি,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন ডাকি—
বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
জানিস নে তুই কি তা।
অরুণ-আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর
পাতায় পাতায় জাগে—
তুই যে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা।
জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা।
দুঃখরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

৪

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।

কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায় হায়,
কী হল যে কেন হল কিছু নাহি বোঝে,
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারি দিকে খোঁজে।
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৬ মার্চ ১৯৪১
বিকাল

৫

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো
আঁখি যার কয়েছিল কথা
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৬ এপ্রিল ১৯৪১
দুপুর

৬

ওই মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে,
সন্ধান মেলে না তার।
প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তাঁরে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা,
সে জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে।
চিত্ত তারে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা।
প্রত্যহের সব ভালোবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া,
প্রিয়ারে বেসেছি ভালো
বেসেছি ফুলের মঞ্জরীকে;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে।
জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে

আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৫ এপ্রিল ১৯৪১

৮

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্যভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরী হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
সুবর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে।
সংবৃত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে।
সংযত শোভায়
পথিকের নয়ন লোভায়।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি;
মধু সঞ্চয়ের পর
মধুপেরে করিল মুখর।
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে
আসন পাতিয়া দিল রবাহূত অনাহূত জনে।
বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
সাহানায় বেজেছিল বাঁশি
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি,
আজ স্মিতহাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে।
বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগম্ভীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখস্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি।

পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৫ এপ্রিল ১৯৪১
সকাল

৯

বাণীর মুরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি,
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা ক'রে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এক কালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে,
কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি,
তোমারে বাহনরূপে
ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে

আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৩ মে ১৯৪১। সকাল

১০

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা,
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার;
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা-কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৬ মে ১৯৪১। সকাল

১১

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ মে ১৯৪১
রাত্রি ৩-১৫ মিনিট

১২

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
বিচিত্র সজ্জিত আজি এই
প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ।
নবীনের দানসত্র কুসুমে পল্লবে
অজস্র প্রচুর।
প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে
ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ।
দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি
বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
আজি তা সার্থক হল,
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ—
তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন
বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের
নির্মল আকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৩

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৭ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৪

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৯ জুলাই ১৯৪১। বিকাল

১৫

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তা'রে চির[illegible]
বাহিরে কু[illegible]
এই নিয়ে [illegible]

লোকে তা'রে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তা'রে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ জুলাই ১৯৪১
সকাল সাড়ে-নয়টা

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষলেখা ৬। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহার

পরিশিষ্ট

১ 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্ববর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থ—'কবি-কাহিনী', 'বন-ফুল', 'শৈশব সঙ্গীত'—"রচনার আবর্জিত অংশ" বিচারে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। পরে, এদেরও "মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে" কবির এই উক্তির সূত্রে 'অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে (বিশ্বভারতী, ১৩৪৭) প্রকাশিত।

২ 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্বে রচিত, রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে অসংকলিত, পাণ্ডুলিপি বা সাময়িকপত্রে বিধৃত এবং অপর লেখকের কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, স্বাক্ষরযুক্ত ও স্বাক্ষরহীন কবিতাসমূহ।

৩ ক পাণ্ডুলিপি, সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন স্বাক্ষরসংগ্রহ খাতা থেকে সংকলিত বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'স্ফু লি ঙ্গ' (১৩৫২) নামে প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৭)-ভুক্ত কবিতিকাসমূহ।

খ বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'চি ত্র বি চি ত্র' (১৩৬১) নামে প্রকাশিত ছোটোদের উপযোগী সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত যে-সকল কবিতা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

গ নানা গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে সমাহৃত ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতা, বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'রূ পা ন্ত র' (১৩৭২) নামে সংকলিত।

৪ 'কাহিনী' (১৩০৬) 'নাট্য' গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা "পতিতা" ও "ভাষা ও ছন্দ"।

৫ ক নানা ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে এবং বিভিন্ন সংবর্ধনা, অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত গ্রন্থাকারে অসংকলিত কবিতাসমূহ।

খ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' ষষ্ঠ ভাগের 'মরণ' বিভাগ-ভুক্ত 'বরণ' কবিতা এবং অপর কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

৬ রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরেজি কবিতা *The Child* (১৯৩১)। পরবর্তী কালে এই কবিতার বাংলা রূপ 'বিচিত্রা' (ভাদ্র ১৩৩৮) পত্রিকায় "সনাতম্ এনম্ আহুরূ উতাদস্যাৎ পুনর্ণবঃ" এবং 'পুনশ্চ' গ্রন্থে 'শিশুতীর্থ' শিরোনামে প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট ১

কবি-কাহিনী

বন-ফুল

শৈশব সঙ্গীত

কবি-কাহিনী

কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে
সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৫।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

প্রথম সর্গ

শুন কল্পনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।
একাকী আপন মনে সরল শিশুটি
তোমারি কমল-বনে করিত গো খেলা,
মনের কত কি গান গাহিত হরষে,
বনের কত কি ফুলে গাঁথিত মালিকা।
একাকী আপন মনে কাননে কাননে
যেখানে সেখানে শিশু করিত ভ্রমণ;
একাকী আপন মনে হাসিত কাঁদিত।
জননীর কোল হোতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা,
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক,
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি,
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা!
প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণকিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু-জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,

স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখপানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখনিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালক-কাল হইল বিগত।

—

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে;
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরমবারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনী-মুখ উজলিত শশী,
সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে;
বসিয়া তটিনী-তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতস্বিনী;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে;
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে,
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের 'পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ

নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘ্রিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের 'পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন;
ওই স্তব্ধ নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশসলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সেই কবি ভাবিত কত কি।
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা-পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবীদেবী, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু-হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্বতগহ্বর,
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনককিরণময় উষার জলদে
একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীত
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম!
অনন্ত-তারা-খচিত নিশীথগগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর গান,
তাহাই শুনিয়া যেন বিহ্বলহৃদয়ে
নীরবে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশী,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।

নিশার আঁধার-কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে,
তখন সে কবি উঠি তুষারমণ্ডিত
সমুচ্চ পর্ব্বতশিরে, গাইত একাকী
প্রকৃতি-বন্দনা-গান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
এক দৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
কেবল, পর্ব্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার,
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান;
কেবল সুদূর বনে দিগন্তবালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি-সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সমুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথবায়ু কাঁপাত পল্লব।
গম্ভীরে গাইত কবি—"হে মহাপ্রকৃতি,
কি সুন্দর, কি মহান্ মুখশ্রী তোমার,
শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতিদেবি,
কি কবিতা লিখেছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে,
যত দিন রবে প্রাণ পড়িয়া পড়িয়া
তবু ফুরাবে না পড়া; মিটিবে না আশ!
শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন!
সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,
দুরন্ত শিশুর মত অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট করি তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্যগ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;

এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হোয়ে রহে অনন্ত আকাশে।
অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়,
যা ভাবিতে পৃথিবীর কীট মানুষের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হোয়ে পড়ে ভয়ে সঙ্কুচিত,
তাহাই তোমার দেবি সাধের আবাস।
তোমার মুখের পানে চাহিতে হে দেবি,
ক্ষুদ্র মানবের এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞানের
দুর্ব্বল নয়ন যায় নিমীলিত হোয়ে।
হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা!
প্রকৃতি জননি ওগো, তোমার স্বরূপ
যত দূর জানিবারে ক্ষুদ্র মানবেরে
দিয়াছ গো অধিকার সদয় হইয়া,
তত দূর জানিবারে জীবন আমার
করেছি ক্ষেপণ, আর করিব ক্ষেপণ।
ভ্রমিতেছি পৃথিবীর কাননে কাননে;
বিহঙ্গও যত দূর পারে না উড়িতে
সে পর্ব্বতশিখরেও গিয়াছি একাকী;
দিবাও পশে নি দেবি যে গিরিগহ্বরে.
সেখানে নির্ভয়ে আমি করেছি প্রবেশ।
যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব.
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা-দেশে,
তুষারসঙ্ঘাতরাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।
অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার-গর্ভে

এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।
এমন নীরবে বায়ু যেতেছে বহিয়া,
নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ করি গাইছে কি গান,
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।
কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষার,
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি!
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ-বালারে—
যে দিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস,
সে দিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সে দিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সে দিকে বসন্ত-লক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমাশর্ব্বরী-
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্ব্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর।
হে প্রকৃতিদেবি, তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন,
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য্য আদি সমুচ্চ মহান্,
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব,
নিরাশা মরুর মত দারুণ বিষণ্ণ—
তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হোতে
তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণতলে দিব উপহার!"
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ-গগনে
প্রকৃতি-বন্দনা-গান গাইত সে কবি।

দ্বিতীয় সর্গ

"এত কাল হে [illegible] করিনু তোমার সেবা,
  তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবি?
এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
  সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?

মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া,
কত দিন বল দেবি রহিবে এমন শূন্য,
তা হোলে ভাঙিয়ে যাবে এ মনোমন্দির!
কিছু দিন পরে আর, দেখিব সেখানে চেয়ে
পূর্ব্ব হৃদয়ের আছে ভগ্ন-অবশেষ,
সেই ভগ্ন-অবশেষে— সুখের সমাধি'পরে
বসিয়া দারুণ দুখে কাঁদিতে কি হবে?
মনের অন্তর-তলে কি যে কি করিছে হুহু,
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবি ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমে তৃষাতুর মৃগের মতন।
কত মরীচিকা দেবি করেছে ছলনা মোরে,
কত ঘুরিয়াছি তার পশ্চাতে পশ্চাতে,
অবশেষে শ্রান্ত হয়ে তোমারে শুধাই দেবি
এ শূন্য পূরিবে না কি কিছুতে আমার?
উঠিছে তপন শশী, অস্ত যাইতেছে পুনঃ,
বসন্ত শরত শীত চক্রে ফিরিতেছে;
প্রতি পদক্ষেপে আমি বাল্যকাল হোতে দেবি
ক্রমে ক্রমে কত দূর যেতেছি চলিয়া—
বাল্যকাল গেছে চলে, এসেছে যৌবন এবে,
যৌবন যাইবে চলি আসিবে বার্দ্ধক্য—
তবু এ মনের শূন্য কিছুতে কি পূরিবে না?
মন কি করিবে হুহু চিরকাল তরে?
শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে—
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন;
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল,
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা বিশাল মনুষ্য-হৃদি—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।'
শুনিয়া, প্রকৃতিদেবি, ভ্রমিনু পৃথিবীময়;
কত লোক দিয়েছিল হৃদি উপহার—
আমার মর্ম্মের গান যবে গাহিতাম দেবি
কত লোক কেঁদেছিল শুনিয়া সে গীত।
তেমন মনের মত মন পেলাম না দেবি,
আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ,
তাইতে নিরাশ হোয়ে আবার এসেছি ফিরে,
বুঝি গো এ শূন্য মন পূরিল না আর।"

এইরূপ কেঁদে কেঁদে কাননে কাননে কবি
একাকী আপন-মনে করিত ভ্রমণ।
সে শোক-সঙ্গীত শুনি কাঁদিত কাননবালা,
নিশীথিনী হাহা করি ফেলিত নিশ্বাস,
বনের হরিণগুলি আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
"হাহা দেবি একি হোলো, কেন পুরিল না প্রাণ"
প্রতিধ্বনি হোতো তার কাননে কাননে।
শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা ঝরিতেছে মৃদু মৃদু,
উঠিতেছে কুলু কুলু জলের কল্লোল,
সেখানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া—
তৃষিত হরিণশিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখপানে চলিয়া যাইত।
শীতরাত্রে পর্ব্বতের তুষারশয্যার 'পরে
বসিয়া রহিত স্তব্ধ প্রতিমার মত,
মাথার উপরে তার পড়িত তুষারকণা,
তীব্রতম শীতবায়ু যাইত বহিয়া।
দিনে দিনে ভাবনায় শীর্ণ হোয়ে গেল দেহ,
প্রফুল্ল হৃদয় হোলো বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে ঘুমালেও শান্তি নাই,
পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত
এক দিন অপরাহ্ণে বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথ-শ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে,
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময়?
কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ?"
গভীর নিশ্বাস ফেলি গম্ভীরে কহিল কবি,
"প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা?"
একে একে কত কথা কহিল বালিকা কাছে,
যত কথা রুদ্ধ ছিল হৃদয়ে কবির—
আগ্নেয় গিরির বুকে জ্বলন্ত অগ্নির মত
যত কথা ছিল কবি কহিলা গম্ভীরে।
"নদ নদী গিরি গুহা কত দেখিলাম, তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবি।"

বালার কপোল বাহি   নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির-সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রুবিন্দু   অমৃতধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন;
দেখি সে করুণবারি   নিরশ্রু কবির চোখে
কত দিন পরে হোলো অশ্রুর উদয়।
শ্রান্ত হৃদয়ের তরে   যে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে
পাগল ভ্রমিতেছিল হেথায় হোথায়—
আজ যেন একটুকু   আশ্রয় পাইল হৃদি,
আজ যেন একটুকু জুড়ালো যন্ত্রণা।
যে হৃদয় নিরাশায়   মরুভূমি হোয়েছিল
সেথা হোতে হোলো আজ অশ্রু উৎসারিত।
শ্রান্ত সে কবির মাথা   রাখিয়া কোলের 'পরে,
সরলা মুছায়ে দিল অশ্রুবারিধারা।
কবি সে ভাবিল মনে,   তুমি কোথাকার দেবী
কি অমৃত ঢালিলে গো প্রাণের ভিতর!
ললনা তখন ধীরে   চাহিয়া কবির মুখে
কহিল মমতাময় করুণ কথায়,—
"হোথায় বিজন বনে   দেখেছ কুটীর ওই,
চল পান্থ ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হোতে ফল মূল   আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা   দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে   গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।
হরিণশাবক এক   আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে   আছে এক চারু কুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন।
কত পাখী ডালে ডালে   সারাদিন গাইতেছে,
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই   অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোর   সে যে কত গায় গান—
নাম ধরে ডাকে মোরে 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু   সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান—
আসিবে কি পান্থ ওই   বনের কুটীরমাঝে?"
এতেক শুনিয়া কবি চলিল কুটীরে।
কি সুখে থাকিত কবি,   বিজন কুটীরে সেই
দিনগুলি কেটে যেত মুহূর্তের মত—

কি শান্ত সে বনভূমি, নাই লোক নাই জন,
শুধু সে কুটীরখানি আছে এক ধারে।
আঁধার তরুর ছায়ে— নীরব শান্তির কোলে
দিবস যেন রে সেথা রহিত ঘুমায়ে।
পাখীর অস্ফুট গান, নির্ঝরের ঝরঝর
স্তব্ধতারে আরো যেন দিত মিষ্ট করি।
আগে এক দিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ,
এখন দুজনে মিলি ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা,
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।
সুদূর কাননতলে কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যেন এক বনেরি দেবতা।
শ্রান্ত হোলে পথশ্রমে ঘুমাত কবির কোলে,
খেলিত বনের বায়ু কুন্তল লইয়া,
ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিত কবি—
মুখে যেন লিখা আছে আরণ্য কবিতা।
"একি দেবি কল্পনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের 'পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি দুইটি হৃদয়ে মিলি,
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা এক ইচ্ছা দুজনার,
এক ভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয় সে কি গো সুখের মিল—
এ জনমে ভাঙিবে না তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করি নাকো— বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া।
তাই হোক্—হোক্ দেবি আমাদের দুই জনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"
নিশীথে একেলা হোলে এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।

সুখ বা দুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত-প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া।
বিষাদ যতই হয় দারুণ অন্তরভেদী,
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!
মরমের ভার-সম হৃদয়ের কথাগুলি
কত দিন পারে বল চাপিয়া রাখিতে?
এক দিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক-মত কহিল কত কি!
অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!
এই কথাগুলি যেন পড়িল বালিকা ধীরে—
"কত ভাল বাসি বালা কহিব কেমনে!
তুমিও সদয় হোয়ে আমার সে প্রণয়ের
প্রতিদান দিও বালা এই ভিক্ষা চাই।"
গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—
স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে,
"আমিও তোমারে কবি বাসি না কি ভাল?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজলরাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।
এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।
অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন—
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ওকথা লয়ে কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।
কভু বা মুখের পানে সে যে কি রহিত চেয়ে,
ঘুমায়ে পড়িত যেন হৃদয় কবির।

কভু বা কি কথা লয়ে সে যে কি হাসিত হাসি
তেমন সরল হাসি দেখে নি কেহই।
আঁধার অমার রাত্রে একাকী পর্বতশিরে
সেও গো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর
পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ-সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব—
করিত সে ছুটাছুটি, কিছুতে সে ডরিত না,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখি নি ত আর!
কবি যা কহিত কথা শুনিত কেমন ধীরে,
কেমন মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
বনদেবতার মত এমন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত প্রভাতের বায়ু যথা
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত।
কিন্তু, কল্পনা, যদি কবির হৃদয় দেখ
দেখিবে এখনো তাহা পূর্ণ হয় নাই।
এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢালো ভালবাসা হৃদয়ে আমার।"
প্রেমের অমৃতধারা এত যে করেছে পান,
তবু মিটিল না কেন প্রণয়পিপাসা?
প্রেমের জোছনাধারা যত ছিল ঢালি বালা
কবির সমুদ্র-হৃদি পারে নি পূরিতে।
স্বাধীন বিহঙ্গ-সম, কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র-সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবি নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে।
কবির সমুদ্র বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি,
"আরো দাও ভালবাসা হৃদয়ে ঢালিয়া।
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।"
শুনিয়া কবির কথা কাতরে কহিল বালা,
"যা ছিল আমার কবি দিয়েছি সকলি—

এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।"
সে কথা শুনিয়া কবি কহিল কাতর স্বরে,
"প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন?
ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায় শুনাই মনের কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?
সাধ যায় এ জীবন প্রাণ ভোরে ভাল বাসি,
বেসেও প্রাণের শূন্য ঘুচিল না কেন?
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।
একি দেবি! একি তৃষ্ণা জবলিছে হৃদয়ে মোর,
ধরার অমৃত যত করিয়াছি পান,
প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্যরাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হোতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া—
শুধু দেবি পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করি নি পান মিটাতে পিপাসা!
শুধু দেবি ঐশ্বর্যের কনকশৃঙ্খল দিয়া
বাঁধি নাই আমার এ স্বাধীন হৃদয়!
শুধু দেবি মিটাইতে মনের বীরত্ব-গর্ব
লক্ষ মানবের রক্তে ধুই নি চরণ!
শুধু দেবি এ জীবনে নিশাচর বিলাসেরে
সুখ-স্বাস্থ্য অর্ঘ্য দিয়া করি নাই সেবা!
তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটিল না মোর,
তবু কেন ঘুচিল না প্রাণের শূন্যতা?
শুনেছি বিলাসসুরা বিহবল করিয়া হৃদি
ডুবাইয়া রাখে সদা বিস্মৃতির ঘুমে!
কিন্তু দেবি—কিন্তু দেবি— এত যে পেয়েছি কষ্ট,
বিস্মৃতি চাই নে তবু বিস্মৃতি চাই নে!—
সে কি ভয়ানক দশা, কল্পনাও শিহরে গো—
স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ!
আমার এ মন দেবি হোক্ মরুভূমি-সম
তৃণলতা-জল-শূন্য জবলন্ত প্রান্তর,
তবুও তবুও আমি সহিব তা প্রাণপণে,
বহিব তা যত দিন রহিব বাঁচিয়া,

মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্য্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।
প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাঁদের করিতে পূজা ক্ষমতা নাইক ব'লে
বিসর্জ্জন করিবারে পারিব না আমি।
কিন্তু ওগো কল্পনা আমার মনের কথা
বুঝিতে কে পারিবেক বল দেখি দেবি?
আমার ব্যথার মর্ম্ম কারে বুঝাইবে বল—
বুঝাইতে না পারিলে বুক যায় ফেটে।
যদি কেহ বলে দেবি 'তোমার কিসের দুখ,
হৃদয়ের বিনিময়ে পেয়েছ হৃদয়,
তবে কাল্পনিক দুখে এত কেন ম্রিয়মাণ?'
তবে কি বলিয়া আমি দিব গো উত্তর?
উপায় থাকিতে তবু যে সহে বিষাদজ্বালা
পৃথিবী তাহারি কষ্টে হয় গো ব্যথিত—
আমার এ বিষাদের উপায় নাইক কিছু,
কারণ কি তাও দেবি পাই না খুঁজিয়া।
পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝুক্ বা না বুঝুক্,
নলিনীরে কি বলিয়া বুঝাইব দেবি?
তাহারে সামান্য কথা গোপন করিলে পরে
হৃদয়ে কি কষ্ট হয় হৃদয় তা জানে।
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া!
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
বুকের যেখানে তারে রাখিতে চাই গো আমি
সেখানে পাই নে যেন রাখিতে তাহারে—
তাইতে অন্তর বুক এখনো পূরিতেছে না,
তাইতে এখনো শূন্য রয়েছে হৃদয়।"
কবির প্রণয়সিন্ধু ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে—
উপরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা কত কি বহিয়া যেত
নিম্নে তার কোলাহল পেত না শুনিতে,
প্রণয়ের অবিচিন্ন নিয়তনূতন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন!
বনের বালিকা আহা সে ঘুমে বিহ্বল হোয়ে
কবির হৃদয়ে রাখি অবশ মস্তক
স্বর্গের স্বপন শুধু দেখিত দিবস রাতি,
হৃদয়ের হৃদয়ের অনন্ত মিলন।

বালিকার সে হৃদয়ে সে প্রণয়মগ্নহৃদে,
অবশিষ্ট আছিল না এক তিল স্থান—
আর কিছু জানিত না, আর কিছু ভাবিত না,
শুধু সে বালিকা ভাল বাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।
শুধু সে কবির নেত্র কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকীরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল!
শুধু সে কবির কোলে ঘুমাতে বাসিত ভাল,
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি কত যে পাইত অর্থ
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়—
সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
একদিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া—
"নলিনী! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী!
আর একবার বালা কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ!
এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।"
এতেক কহিয়া কবি নীরবে চলিয়া গেল
গোপনে মুছিয়া ফেলি নয়নের জল।
বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।
অনিমিষ নেত্র ক্রমে করিয়া প্লাবিত
একবিন্দু দুইবিন্দু ঝরিল সলিল।
বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন।
হা-হা কবি কি করিলে, ফিরে দেখ, ফিরে এস,
দিও না বালার হৃদে অমন আঘাত—
নীরবে বালার আহা কি বজ্র বেজেছে বুকে,
গিয়াছে কোমল মন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া!
হা কবি অমন কোরে অনর্থক তার মনে
কি আঘাত করিলে যে বুঝিলে না তাহা?
এত কাল সুখস্বপ্ন ডুবায়ে রাখিয়া মন,
এত দিন পরে তাহা দিবে কি ভাঙ্গিয়া?

কবি ত চলিয়া যায়— সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে,
আঁধারে কাননভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে!
তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ন সঙ্গীত—
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।
একবার কবি শুধু চাহিল কুটীরপানে,
কাতরে বিদায় মাগি বনদেবী-কাছে
নয়নের জল মুছি— যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া।

সঙ্গীত

কেন ভালবাসিলে আমায়?
কিছুই নাইক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়!
যা আমার ছিল সাধ্য সকলি করেছি আমি
কিছুই করি নি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?
গেলে যদি, গেলে চলি, যাও যেথা ভাল লাগে—
একবার মনে কোরো দীন অধীনীরে।
ভ্রমিতে ধরার মাঝে কত ভালবাসা পাবে,
তাতে যদি ভাল থাক তাই হোক্ তবে—
তবু একবার যদি মনে কর নলিনীরে
যে দুখিনী, যে তোমারে এত ভালবাসে!
কি করিলে মন তব পারিতাম জুড়াইতে
যদি জানিতাম কবি করিতাম তাহা!
আমি অতি অভাগিনী জানি না বলিয়া যেন
বিরক্ত হোয়ো না কবি এই ভিক্ষা দাও!
না জানিয়া না শুনিয়া যদি দোষ করে থাকি,
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষমা তবে করিয়ো আমারে—
তুমি ভাল থেকো কবি, ক্ষুদ্র এক কাঁটা যেন
ফুটে না তোমার পায়ে ভ্রমিতে পৃথিবী।
জননি, কোথায় তুমি রেখে গেলে দুহিতারে?
কত দিন একা একা কাটালাম হেথা,
একেলা তুলিয়া ফুল কত মালা গাঁথিতাম,
একেলা কাননময় করিতাম খেলা!

তোমার বীণাটি ল'য়ে উঠিয়া পর্ব্বতশিরে
একেলা আপন মনে গাইতাম গান—
হরিণশিশুটি মোর বসিত পায়ের তলে,
পাখীটি কাঁধের 'পরে শুনিত নীরবে।
এইরূপ কত দিন কাটালেম বনে বনে,
কত দিন পরে তবে এলে তুমি কবি!
তখন তোমারে কবি কি যে ভালবাসিলাম
এত ভাল কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক জ্যোতির্ম্ময় দেব-সম
কত বার মনে মনে করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি দেখিতাম মুখখানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।
যে দিন আপনি আসি কহিলে আমার কাছে
ক্ষুদ্র এই বালিকারে ভালবাস তুমি,
সে দিন কি হর্ষে কবি কি আনন্দে কি উচ্ছ্বাসে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর ফেটে গেল যেন।
আমি কোথাকার কেবা! আমি ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র,
স্বর্গের দেবতা তুমি ভালবাস মোরে?
এত সৌভাগ্য, কবি, কখনো করি নি আশা—
কখনো মুহূর্ত্ত-তরে জানি নি স্বপনে।
যেথায় যাও-না কবি, যেথায় থাক-না তুমি,
আমরণ তোমারেই করিব অর্চ্চনা।
মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা।

তৃতীয় সর্গ

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি!
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণকণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি প্রকৃতির গীত—
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়
সে মনের তন্ত্রী যেন হোয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হোলো দশা—
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দিরমাঝারে।

বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া;
সে না হোলে অমাবস্যানিশির মতন
সমস্ত জগৎ হোত বিষণ্ন আঁধার।

...

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা, নীরব রজনী।
অরণ্যের অন্ধকারময় গাছগুলি
মাথার উপরে মাখি রজত জোছনা,
শাখায় শাখায় ঘন করি জড়াজড়ি,
কেমন গম্ভীর ভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসীবক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভপ্রতিবিম্বশোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন!
লীলাময়ী প্রবাহিনী চলেছে ছুটিয়া,
লীলাভঙ্গ বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মুরতি।
গাইছে রজনী কিবা নীরব সঙ্গীত!
কেমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর—
শুধু দূর-শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সর সর যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্তবায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কত বার আমি
গম্ভীর অরণ্যে একা কোরেছি ভ্রমণ।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো কেমন!
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি!
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠে নি উথলি!
কে আছে এমন যার জীবনের পথে

এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবা নিশি তার
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হোয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্ম্মভেদী একটি নিশ্বাস?
কত স্থানে আজ রাত্রে নিশীথপ্রদীপে
উঠিছে প্রমোদধ্বনি বিলাসীর গৃহে।
মুহূর্ত্ত ভাবে নি তারা আজ নিশীথেই
কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন অনলে।
কত শত হতভাগা আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলাই হা হা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া!

...

ঝোপে-ঝাপে ঢাকা ওই অরণ্যকুটীর।
বিষণ্ণ নলিনীবালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া!
জানি না কেমন কোরে বালার বুকের মাঝে
সহসা কেমন ধারা লেগেছে আঘাত—
আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে।
বিজন কুটীরে শুধু পরণশয্যার 'পরে
একেলা আপন মনে রয়েছে শুইয়া।
যে বালা মুহূর্ত্তকাল স্থির না থাকিত কভু,
শিখরে নির্ঝরে বনে করিত ভ্রমণ—
কখনো তুলিত ফুল, কখনো গাঁথিত মালা,
কখনো গাইত গান, বাজাইত বীণা—
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির!
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ!
এক দিন, দুই দিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে—
মরণের পদশব্দ গণিছে সে যেন!
আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ।
এ দিকে পৃথিবী ভ্রমি সহিয়া ঝটিকা কত
ফিরিয়া আসিছে কবি কুটীরের পানে,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখী
সন্ধ্যায় কুলায়ে তার আইসে ফিরিয়া।
বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা!
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখী,

তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি।
অধীরে চলিল কবি কুটীরের পানে—
দুয়ারের কাছে গিয়া দুয়ারে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীর স্বরে, নলিনী! নলিনী!
কিছু নাই সাড়া শব্দ, দিল না উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা রয়েছে পড়ি—
বেষ্টিত বিতন্ত্রী বীণা লূতাতন্তুজালে।
ভ্রমিল আকুল কবি কাননে কাননে,
ডাকিয়া সমুচ্চ স্বরে, নলিনী! নলিনী!
মিলিয়া কবির সাথে বনদেবী উচ্চস্বরে
ডাকিল কাতরে আহা, নলিনী! নলিনী!
কেহই দিল না সাড়া, শুধু সে শবদ শুনি
সুপ্ত হরিণেরা ত্রস্ত উঠিল জাগিয়া।
অবশেষে গিরিশৃঙ্গে উঠিল কাতর কবি,
নলিনীর সাথে যেথা থাকিত বসিয়া।
দেখিল সে গিরি-শৃঙ্গে, শীতল তুষার-'পরে,
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লানমুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্ধনিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।
একটি হরিণশিশু খেলা করিবার তরে
কভু বা অঞ্চল ধরি টানিতেছে তার,
কভু শৃঙ্গ দুটি দিয়া সুধীরে দিতেছে ঠেলি,
কভু বা অবাক্ নেত্রে রয়েছে চাহিয়া!
তবু নলিনীর ঘুম কিছুতেই ভাঙিছে না,
নীরবে নিস্পন্দ হোয়ে রয়েছে ভূতলে।
দূর হোতে কবি তারে দেখিয়া কহিল উচ্চে,
"নলিনি, এয়েছি আমি দেখ্‌সে বালিকা।"
তবুও নলিনী বালা না দিয়া উত্তর
শীতল তুষার-'পরে রহিল ঘুমায়ে।
কবি সে শিখর-'পরে করি আরোহণ
শীতল অধর তার করিল চুম্বন—
শিহরিয়া চমকিয়া দেখিল সে কবি
না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস।
দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু,
যেমন চাহিয়া ছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কি যেন কি দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।
কতক্ষণে কবি তবে পাইল চেতন,
দেখিল তুষারশুভ্র নলিনীর দেহ

হৃদয়জীবনহীন জড় দেহ তার
অনুপম সৌন্দর্য্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি!
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী",
হৃদয়ে রাখিয়া তারে পাগলের মত কবি
কহিল কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী"!
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

...

তার পর দিন হোতে সে বনে কবিরে আর
পেলে না দেখিতে কেহ, গেছে সে কোথায়!
ঢাকিল নলিনীদেহ তুষারসমাধি—
ক্রমে সে কুটীরখানি কোথা ভেঙ্গে চুরে গেল,
ক্রমে সে কানন হোলো গ্রাম লোকালয়,
সে কাননে—কবির সে সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর।

চতুর্থ সর্গ

"এ তবে স্বপন শুধু, বিম্বের মতন
আবার মিলায়ে গেল নিদ্রার সমুদ্রে!
সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা,
যদি বা আইল নিদ্রা এ শ্রান্ত নয়নে,
মরীচিকা দেখাইয়া গেল গো মিলায়ে!
হা স্বপ্ন, কি শক্তি তোর, এ হেন মুরতি
মুহূর্ত্তের মধ্যে তুই ভাঙ্গিলি, গড়িলি?
হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা—
সত্যের মতন গড়িলি প্রতিমা,
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙ্গিয়া?
কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে?
না না, তাহা নয় কভু, নলিনী, সে কি গো
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত!
যাহার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যত কাল রব বেঁচে যার ভালবাসা
চিরকাল এ হৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গপ্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয়!

দেহকারাগারমুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি,
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহকারাগারমুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয়সাথে মিশাব হৃদয়।
নলিনী, আছ কি তুমি, আছ কি হেথায়?
একবার দেখা দেও, মিটাও সন্দেহ!
চিরকাল তরে তোরে ভুলিতে কি হবে?
তাই বল্ নলিনী লো, বল্ একবার!
চিরকাল আর তোরে পাব না দেখিতে,
চিরকাল আর তোর হৃদয়ে হৃদয়
পাব না কি মিশাইতে, বল্ একবার!
মরিলে কি পৃথিবীর সব যায় দূরে?
তুই কি আমারে ভুলে গেছিস্ নলিনি?
তা হোলে নলিনি, আমি চাই না মরিতে।
তোর ভালবাসা যেন চিরকাল মোর
হৃদয়ে অক্ষয় হোয়ে থাকে গো মুদ্রিত
কষ্ট পাই পাব, তবু চাই না ভুলিতে!
তুমি নাহি থাক যদি তোমার স্মৃতিও
থাকে যেন এ হৃদয় করিয়া উজ্জ্বল!
এই ভালবাসা, যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?
যত কাল বেঁচে রব, রবে যা হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে না পালটিতে আঁখির পলক
ক্ষণস্থায়ী কুসুমের সুরভের মত
শূন্য এই বায়ুস্রোতে যাইবে মিশায়ে?
হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি.
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান.
বর্ত্তমান মিশিতেছে অতীতসমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে মানুষেরে অলক্ষিতভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া.
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে

তাহার চরণ-চিহ্ন পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দ্দান্ত সময়স্রোত অবিরামগতি,
নূতন গড়ে নি কিছু, ভাঙে নি পুরাণো।
বাহিরের কত কি যে ভাঙিল চুরিল,
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন,
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি—
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই!
বরষে বরষে দেহ যেতেছে ভাঙিয়া,
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর,
নলিনীরে ভালবাসি তবুও তেমনি।
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্ত্তি ছিল এ হৃদয়ে,
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকানো সে ধন!
ভেবেছিনু এক বার এই-যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙিবে চুরিবে—
পারে নি ভাঙিতে কিন্তু এক তিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে!
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।
গাও গো বিহগ তব প্রমোদের গান,
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি!
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতিদেবি
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।

তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতিদেবি,
সংশয় কখন আমি করি না স্বপনে!
বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান!
পাখীরা মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু,
উপত্যকাময় যবে ফুটিয়াছে ফুল,
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?
দেখি চিরহাস্যময় প্রকৃতির মুখ,
দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা!
সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,
সমস্ত জগৎ যবে গাহে গো সঙ্গীত,
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে
ক্ষুদ্রতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস না বসি!
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।
একেক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ
মনে হয় আমারি তা প্রাণের রাগিণী—
সেই রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ,
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী!
কখন বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট—
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে!"

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোলো উপনীত!
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে!
মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী
হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্!
নেত্র তাঁর বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।

যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্রলোকে রয়েছে স্থাপিত—
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন
কহিত কাতর স্বরে ঢাকিয়া নয়ন,
"এ কি রে অনন্ত কাণ্ড, পারি না সহিতে"
সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া,
কি গান গাইছে কবি, শুন কলপনা।
কি "সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীতবায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ন নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোলো
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব!
সাড়াশব্দ নাই মুখে, অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া!
কি মহান্! কি প্রশান্ত! কি গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব ওগো হিমালয়
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার!
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্যমনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ!
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে, হোয়ে হতজ্ঞানপ্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার

শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
অবনীর মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কত বার আইল ফিরিয়া!
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া
কত কাল আইল রে, গেল কত কাল
হিমাদ্রি তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয়গিরি
মানুষসৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে?
যা দেখিছ যা দেখেছ তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠে নি শিহরি?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতাশৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্কশৃঙ্খল তার অলঙ্কাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়!
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা!
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল—
দুর্ব্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জ্জিতে!
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙিয়া.

না, তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে—
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল
বল তার—হিমগিরি, দেখিছ কি তাহা?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার!
কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে!
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে,
উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পরঅশ্রুজলে ঢালে হাসিমাখা বিষ!
পৃথিবী জানে না গিরি হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়া পরের মর্ম্মদুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়নজলে মিশাতে নয়নজল—
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস!
প্রেম? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তিধামে
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম-অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভাল বাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই—
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে!
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্নসন্ধান!
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস!
সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়

একের দাসত্বে রত অযুত মানব!
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি—
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ।
এ অশান্তি কবে দেব হবে দূরীভূত!
অত্যাচার-গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন!
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়!
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
নাইক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা—
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল-অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস!
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!
হিমাদ্রি, মানুষসৃষ্টি-আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
তবে বল কবে, গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে—
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতিদেবি
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,

এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত, দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষচিতে ত্যজিতে জীবন।"

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্ব্বরা।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধশরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন!
কবির প্রাচীননেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনও কিছুমাত্র হয় নি পুরাণো?
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব!
জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির!
সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।
প্রতিরাত্রে গিরিশিরে জোছনায় বসি
আনন্দে গাইত কবি সুখের সঙ্গীত।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হোতে,
নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান।
প্রবাসী যেমন আহা দূর হোতে যদি
সহসা শুনিতে পায় স্বদেশ-সঙ্গীত,
ধায় হরষিত চিতে সেই দিক্ পানে,
একদিন দুইদিন যেতেছে যেমন
চলেছে হরষে কবি, যেই দেশ হোতে
স্বদেশসঙ্গীতধ্বনি পেতেছে শুনিতে।

এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস!
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত!
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হুহু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস!
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল!
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

বন-ফুল

বন-ফুল।

কাব্যোপন্যাস।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রী মতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
গুপ্তপ্রেশ;
২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট;—কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

প্রথম সর্গ

চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে!

—

দীপ নির্ব্বাণ

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজতসুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির, ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভুরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

...

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত-সমীরণে দুলায়ে পাদপগণে
বহিছে নির্ঝর-বারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রিশিখরশৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রহেছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে ধীরে ধীরে নদী চলে
উপলরাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গকুল সিক্ত করি বৃক্ষমূল
নাচিছে পাষাণতট করিয়া প্রহত!
চারি দিকে কত শত কলকলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা-মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

...

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র-ছায়ে-ছায়ে পাদপের গায়ে গায়ে

ডুবায়ে চরণদেশ স্রোতস্বিনীনীরে?
চৌদিকে মানববাস নাহিক কোথায়,
নাহি জনকোলাহল গভীর বিজনস্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুমভূষিত বেশে কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকামালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবকরাশি দুয়ার-উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীরভিতর!
কুটীরের এক পাশে শাখাদীপ[১] ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক, তায় আঁধার মিশিয়া যায়—
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর-দ্বার!
গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর!
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে বয়—
বিষাদের অন্ধকারে গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময়!
কে ওগো নবীনা বালা উজলি পরণশালা
বসিয়া মলিনভাবে তৃণের আসনে?
কোলে তার সঁপি শির কে শুয়ে হইয়া স্থির
থেক্যে থেক্যে দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সঘনে—
সুদীর্ঘ ধবল কেশ ব্যাপিয়া কপোলদেশ,
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে বক্ষের বসন—
অবশ জ্ঞেয়ানহারা, স্তিমিত লোচনতারা,
পলক নাহিক পড়ে নিস্পন্দ নয়ন!
বালিকা মলিনমুখে বিশীর্ণা বিষাদদুখে,
শোকে ভয়ে অবশ সে সুকোমল-হিয়া।
আনত করিয়া শির বালিকা হইয়া স্থির
পিতার-বদন-পানে রয়েছে চাহিয়া।
এলোথেলো বেশবাস, এলোথেলো কেশপাশ
অবিচল আঁখিপার্শ্ব করেছে আবৃত!
নয়নপলক স্থির, হৃদয় পরাণ ধীর,
শিরায় শিরায় রহে স্তবধ শোণিত।
হৃদয়ে নাহিক জ্ঞান, পরাণে নাহিক প্রাণ,
চিন্তার নাহিক রেখা হৃদয়ের পটে!
নয়নে কিছু না দেখে, শ্রবণে স্বর না ঠেকে,
শোকের উচ্ছ্বাস নাহি লাগে চিত্ততটে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, সুধীরে নয়ন মেলি
ক্রমে ক্রমে পিতা তাঁর পাইলেন জ্ঞান!
সহসা সভয়প্রাণে দেখি চারিদিক পানে
আবার ফেলিল শ্বাস ব্যাকুলপরাণ—

[১] হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে।

কি যেন হারায়ে গেছে, কি যেন আছে না আছে,
শোকে ভয়ে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন—
সভয়ে অস্ফুট স্বরে সরিল বচন,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী?"
চমকি উঠিল যেন নীরব রজনী!
চমকি উঠিল যেন নীরব অবনী!
ঊর্ম্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে—
সহসা করণক্ষেপে সহসা উঠে রে কেঁপে,
সহসা জাগিয়া উঠে চলঊর্ম্মি সবে!
কমলার চিত্তবাপী সহসা উঠিল কাঁপি
পরাণে পরাণ এলো হৃদয়ে হৃদয়!
স্তবধ শোণিতরাশি আস্ফালিল হৃদে আসি,
আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয়!
শোকের আঘাত লাগি পরাণ উঠিল জাগি,
আবার সকল কথা হইল স্মরণ!
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে নয়নযুগল মুদে
আছেন জনক তাঁর, হেরিল নয়ন।
স্থির নয়নের পাতে পড়িল পলক,
শুনিল কাতর স্বরে ডাকিছে জনক,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী!"
বিষাদে ষোড়শী বালা চমকি অমনি
(নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে) কহিল কাতর স্বরে
পিতার নয়ন-'পরে রাখিয়া নয়ন,
"কেন পিতা! কেন পিতা! এই-যে রয়েছি হেতা"—
বিষাদে নাহিক আর সরিল বচন!
বিষাদে মেলিয়া আঁখি বালার বদনে রাখি
এক দৃষ্টে স্থিরনেত্রে রহিল চাহিয়া!
নেত্রপ্রান্তে দরদরে, শোক-অশ্রুবারি ঝরে,
বিষাদে সন্তাপে শোকে আলোড়িত হিয়া!
গভীরনিশ্বাসক্ষেপে হৃদয় উঠিল কেঁপে,
ফাটিয়া বা যায় যেন শোণিত-আধার!
ওষ্ঠপ্রান্ত থরথরে কাঁপিছে বিষাদভরে
নয়নপলক-পত্র কাঁপে বার বার—
শোকের স্নেহের অশ্রু করিয়া মোচন
কমলার পানে চাহি কহিল তখন,
"আজি রজনীতে মা গো! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে, এই শেষ দেখা ভবে!
জানি না তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে—
পৃথিবীর ভালবাসা পৃথিবীর সুখ আশা,
পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভক্তি সমুদায়,
দিনকর নিশাকর গ্রহ তারা চরাচর,
সকলের কাছে আজি লইব বিদায়!

গিরিরাজ হিমালয়, ধবল তুষারচয়,
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ-আবরণ!
অয়ি নির্ঝরিণীমালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা,
অয়ি উপত্যকে! অয়ি হিমশৈলবন!
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।
কুটীর পরণশালা সহিয়া বিষাদজ্বালা
আশ্রয় লইয়াছিনু যাহার ছায়ায়—
স্তিমিত দীপের প্রায় এত দিন যেথা হায়
অন্তিম জীবনরশ্মি করেছি ক্ষেপণ,
আজিকে তোমার কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
তোমারি কোলের পরে সঁপিব জীবন!
নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে, নহে তোমাদের তরে,
তোমাদের তরে চিত্ত ফেলিছে না শ্বাস—
আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিব ত,
বাতাসে মিশাবে আজি অন্তিম নিশ্বাস!
কাঁদি না তাহার তরে, হৃদয় শোকের ভরে
হতেছে না উৎপীড়িত তাহারো কারণ।
আহা হা! দুখিনী বালা সহিবে বিষাদজ্বালা
আজিকার নিশিভোর হইবে যখন?
কালি প্রাতে একাকিনী অসহায়া অনাথিনী
সংসারসমুদ্র-মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে!
সংসারযাতনাজ্বালা কিছু না জানিস্, বালা,
আজিও!—আজিও তুই চিনিস নে ভবে!
ভাবিতে হৃদয় জ্বলে, মানুষ কারে যে বলে
জানিস্ নে কারে বলে মানুষের মন।
কার দ্বারে কাল প্রাতে দাঁড়াইবি শূন্যহাতে,
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন!
অভাগা পিতার তোর— জীবনের নিশা ভোর
বিষাদ নিশার শেষে উঠিবেক রবি
আজ রাত্রি ভোর হলে— কারে আর পিতা বলে
ডাকিবি, কাহার কোলে হাসিবি খেলিবি?
জীবধাত্রী বসুন্ধরে! তোমার কোলের 'পরে
অনাথা বালিকা মোর করিনু অর্পণ!
দিনকর! নিশাকর! আহা এ বালার 'পর
তোমাদের স্নেহদৃষ্টি করিও বর্ষণ!
শুন সব দিক্‌বালা! বালিকা না পায় জ্বালা
তোমরা জননীস্নেহে করিও পালন!
শৈলবালা! বিশ্বমাতা! জগতের স্রষ্টা পাতা!
শত শত নেত্রবারি সঁপি পদতলে—
বালিকা অনাথা বোলে স্থান দিও তব কোলে,
আবৃত করিও এরে স্নেহের আঁচলে!

মুছ মা গো অশ্রুজল! আর কি কহিব বলো!
অভাগা পিতারে ভোলো জন্মের মতন!
আটকি আসিছে স্বর!— অবসন্ন কলেবর।
ক্রমশঃ মুদিয়া মা গো, আসিছে নয়ন!
মুষ্টিবন্ধ করতল, শোণিত হইছে জল,
শরীর হইয়া আসে শীতল পাষাণ!
এই—এই শেষবার— কুটীরের চারি ধার
দেখে লই! দেখে লই মেলিয়া নয়ান!
শেষবার নেত্র ভোরে এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত!
সুখে থেকো চিরকাল!— সুখে থেকো চিরকাল!
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত!”
স্তব্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস! স্তব্ধ হইল শ্বাস!
স্তব্ধ লোচনতারা! স্তব্ধ শরীর!
বিষম শোকের জ্বালা— মূর্চ্ছিয়া পড়িল বালা,
কোলের উপরে আছে জনকের শির!
গাইল নির্ঝরবারি বিষাদের গান,
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ!

দ্বিতীয় সর্গ

যেও না! যেও না!

দুয়ারে আঘাত করে কে ও পান্থবর?
“কে ওগো কুটীরবাসি! দ্বার খুলে দাও আসি!”
তবুও কেন রে কেউ দেয় না উত্তর?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে!
“বিপন্ন পথিক আমি, কে আছে কুটীরে?”
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে!
পাদপ আপন মনে প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সরসর স্বনে!
সমীরে কুটীরশিরে লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারি দিকে পুষ্পপরিমল!
আবার পথিকবর আঘাতে দুয়ার-’পর—
ধীরে ধীরে খুলে গেল শিথিল অর্গল।
বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয় পথিক অবাক্ রয়,
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে আছে ছবির মতন।
কেন পান্থ, কেন পান্থ, মৃগ যেন দিক্‌ভ্রান্ত
অথবা দরিদ্র যেন হেরিয়া রতন!
কেন গো কাহার পানে দেখিছ বিস্মিত প্রাণে—

অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস?
দারুণ শীতের কালে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরে ভালে,
তুষারে করিয়া দৃঢ় বহিছে বাতাস!
ক্রমে ক্রমে হয়ে শান্ত সুধীরে এগোয় পান্থ,
থর থর করি কাঁপে যুগল চরণ—
ধীরে ধীরে তার পরে সভয়ে সঙ্কোচভরে
পথিক অনুচ্চ স্বরে করে সম্বোধন—
"সুন্দরি! সুন্দরি!" হায়! উত্তর নাহিক পায়!
আবার ডাকিল ধীরে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
শব্দ চারি দিকে ছুটে, প্রতিধ্বনি জাগি উঠে,
কুটীর গম্ভীরে কহে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই,
এখনো পৃথিবী ধরা নীরবে ঘুমায়!
নীরব পরণশালা, নীরব ষোড়শী বালা,
নীরবে সুধীর বায়ু লতারে দুলায়!
পথিক চমকি প্রাণে দেখিল চৌদিক-পানে—
কুটীরে ডাকিছে কেও "কমলা! কমলা!"
অবাক্ হইয়া রহে, অস্ফুটে কে ওগো কহে?
সুমধুর স্বরে যেন বালকের গলা!
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়,
কুটীরের চারি ভাগে নাই কোনজন!
এখনো অস্ফুটস্বরে 'কমলা! কমলা!' ক'রে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ!
কে জানে কাহাকে ডাকে, কে জানে কেন বা ডাকে,
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায়?
সহসা পথিকবর দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা! কমলা!' বলি শুক গান গায়!
আবার পথিকবর হন ধীরে অগ্রসর,
'সুন্দরি! সুন্দরি!' বলি ডাকিয়া আবার!
আবার পথিক হায় উত্তর নাহিক পায়,
বসিল উরুর 'পরে সঁপি দেহভার!
সঙ্কোচ করিয়া কিছু পান্থবর আগুপিছু
একটু একটু ক'রে হন অগ্রসর!
আনমিত করি শিরে পথিকটি ধীরে ধীরে
বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর!
হস্ত কাঁপে থরথরে, বুক ধুক্ ধুক্ করে,
পড়িল অবশ বাহু কপোলের 'পর—
লোমাঞ্চিত কলেবরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরে,
কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর!
আবার কেন কি জানি বালিকার হস্তখানি
লইলেন আপনার করতল-'পরি—
তবুও বালিকা হায় চেতনা নাহিক পায়—

অচেতনে শোক জ্বালা রয়েছে পাশরি!
রুক্ষ রুক্ষ কেশরাশি   বুকের উপরে আসি
থেকে থেকে কাঁপি উঠে নিশ্বাসের ভরে!
বাঁহাত আঁচল-'পরে   অবশ রয়েছে পড়ে
এলো কেশরাশি মাঝে সঁপি ডান করে।
ছাড়ি বালিকার কর   ত্রস্ত উঠে পান্থবর
দ্রুতগতি চলিলেন তটিনীর ধারে,
নদীর শীতল নীরে   ভিজায়ে বসন ধীরে
ফিরি আইলেন পুনঃ কুটীরের দ্বারে।
বালিকার মুখে চোকে   শীতল সলিল-সেকে
সুধীরে বালিকা পুনঃ মেলিল নয়ন।
মুদিতা নলিনীকলি   মরমহুতাশে জ্বলি
মুরছি সলিলকোলে পড়িলে যেমন—
সদয়া নিশির মন   হিম সেঁচি সারাক্ষণ
প্রভাতে ফিরায়ে তারে দেয় গো চেতন।
মেলিয়া নয়নপুটে   বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ।
পিতা মাতা ছাড়া কারে   মানুষে দেখে নি হা রে,
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন!
আঁচল গিয়াছে খ'সে,   অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক-পানে যুগল নয়ন!
দেখেছে কভু কেহ কি   এহেন মধুর আঁখি?
স্বর্গের কোমল জ্যোতি খেলিছে নয়নে—
মধুর-স্বপনে-মাখা   সারল্য-প্রতিমা-আঁকা
'কে তুমি গো?' জিজ্ঞাসিছে যেন প্রতিক্ষণে।
পৃথিবী-ছাড়া এ আঁখি   স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে 'কে তুমি? কে তুমি'?
মধুর মোহের ভুল,   এ মুখের নাই তুল—
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি!
পথিকের হৃদে আসি   নাচিছে শোণিত রাশি,
অবাক্ হইয়া বসি রয়েছে সেথায়!
চমকি ক্ষণেক-পরে   কহিল সুধীর স্বরে
বিমোহিত পান্থবর কমলাবালায়,
"সুন্দরি, আমি গো পান্থ   দিক্‌ভ্রান্ত পথশ্রান্ত
উপস্থিত হইয়াছি বিজন কাননে!
কাল হতে ঘুরি ঘুরি   শেষে এ কুটীরপুরী
আজিকার নিশিশেষে পড়িল নয়নে!
বালিকা! কি কব আর,   আশ্রয় তোমার দ্বার
পান্থ পথহারা আমি করি গো প্রার্থনা।
জিজ্ঞাসা করি গো শেষে   মৃতে লয়ে ক্রোড়দেশে
কে তুমি কুটীরমাঝে বসি সুধাননা?"
পাগলিনীপ্রায় বালা   হৃদয়ে পাইয়া জ্বালা

চমকিয়া বসে যেন জাগিয়া স্বপনে।
পিতার বদন-'পরে নয়ন নিবিষ্ট ক'রে
স্থির হ'য়ে বসি রয় ব্যাকুলিত মনে।
নয়নে সলিল ঝরে, বালিকা সমুচ্চ স্বরে
বিষাদে ব্যাকুলহৃদে কহে "পিতা—পিতা"।
কে দিবে উত্তর তোর, প্রতিধ্বনি শোকে ভোর
রোদন করিছে সেও বিষাদে তাপিতা।
ধরিয়া পিতার গলে আবার বালিকা বলে
উচ্চৈস্বরে "পিতা—পিতা", উত্তর না পায়!
তরুণী পিতার বুকে বাহুতে ঢাকিয়া মুখে,
অবিরল নেত্রজলে বক্ষ ভাসি যায়।
শোকানলে জল ঢালা সাঙ্গ হ'লে উঠে বালা,
শূন্য মনে উঠি বসে আঁখি অশ্রুময়!
বসিয়া বালিকা পরে নিরখি পথিকবরে
সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,
"কে তুমি জিজ্ঞাসা করি, কুটীরে এলে কি করি-
আমি যে পিতারে ছাড়া জানি না কাহারে!
পিতার পৃথিবী এই, কোনদিন কাহাকেই
দেখি নি ত এখানে এ কুটীরের দ্বারে!
কোথা হ'তে তুমি আজ আইলে পৃথিবীমাঝ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন?
তুমি কি তাহাই হবে পিতা যাহাদের সবে
'মানুষ' বলিয়া আহা করিত রোদন?
কিম্বা জাগি প্রাতঃকালে যাদের দেবতা ব'লে
নমস্কার করিতেন জনক আমার?
বলিতেন যার দেশে মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার?—
নাম তার স্বর্গভূমি, আমারে সেথায় তুমি
ল'য়ে চল, দেখি গিয়া পিতায় মাতায়!
ল'য়ে চল দেব তুমি আমারে সেথায়।
যাইব মায়ের কোলে, জননীরে মাতা ব'লে
আবার সেখানে গিয়া ডাকিব তাঁহারে।
দাঁড়ায়ে পিতার কাছে জল দিব গাছে গাছে,
সঁপিব তাঁহার হাতে গাঁথি ফুলহারে!
হাতে ল'য়ে শুকপাখী বাবা মোর নাম ডাকি
'কমলা' বলিতে আহা শিখাবেন তারে!
লয়ে চল, দেব, তুমি সেথায় আমারে!
জননীর মৃত্যু হ'লে, ওই হোথা গাছতলে
রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন!
ধবলতুষার ভার ঢাকিয়াছে দেহ তাঁর,
স্বরগের কুটীরেতে আছেন এখন!
আমিও তাঁহার কাছে করিব গমন!"

বালিকা থামিল সিক্ত হয়ে আঁখিজলে
পথিকেরো আঁখিদ্বয় হ'ল আহা অশ্রুময়,
মুছিয়া পথিক তবে ধীরে ধীরে বলে,
"আইস আমার সাথে, স্বর্গরাজ্য পাবে হাতে,
দেখিতে পাইবে তথা পিতায় মাতায়।
নিশা হ'ল অবসান, পাখীরা করিছে গান,
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায়!
আঁধার ঘোমটা তুলি প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারি দিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশিল তারা, শিশিরের মুক্তাধারা
গাছ পালা পুষ্প লতা করিছে বর্ষণ!
হোথা বরফের রাশি, মৃত দেহ রেখে আসি
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করায়ে শয়ান,
এই লয়ে যাই চ'লে, মুছে ফেল অশ্রুজলে—
অশ্রুবারিধারে আহা পুরেছে নয়ান!"
পথিক এতেক কয়ে মৃত দেহ তুলে লয়ে
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করিল প্রোথিত।
কুটীরেতে ধীরি ধীরি আবার আইল ফিরি,
কত ভাবে পথিকের চিত্ত আলোড়িত।
ভবিষ্যৎ-কলপনে কত কি আপন মনে
দেখিছে, হৃদয়পটে আঁকিতেছে কত—
দেখে পূর্ণচন্দ্র হাসে নিশিরে রজতবাসে
ঢাকিয়া, হৃদয় প্রাণ করি অবারিত—
জাহ্নবী বহিছে ধীরে, বিমল শীতল নীরে
মাখিয়া রজতরশ্মি গাহি কলকলে—
হরষে কম্পিত কায়, মলয় বহিয়া যায়
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কুসুমের দলে—
ঘাসের শয্যার 'পরে ঈষৎ হেলিয়া পড়ে
শীতল করিছে প্রাণ শীত সমীরণ—
কবরীতে পুষ্পভার কে ও বাম পাশে তার,
বিধাতা এমন দিন হবে কি কখন?
অদৃষ্টে কি আছে আহা! বিধাতাই জানে তাহা
যুবক আবার ধীরে কহিল বালায়,
"কিসের বিলম্ব আর? ত্যজিয়া কুটীরদ্বার
আইস আমার সাথে, কাল বহে যায়!"
তুলিয়া নয়নদ্বয় বালিকা সুধীরে কয়,
বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
"কুটীর! তোদের সবে ছাড়িয়া যাইতে হবে,
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয়।
হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়—
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি

তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়?
যাইব স্বরগভূমে, আহা হা! ত্যজিয়া ঘুমে
এতক্ষণে উঠেছেন জননী আমার—
এতক্ষণে ফুল তুলি গাঁথিছেন মালাগুলি,
শিশিরে ভিজিয়া গেছে আঁচল তাঁহার—
সেথাও হরিণ আছে, ফুল ফুটে গাছে গাছে,
সেখানেও শুক পাখী ডাকে ধীরে ধীরে!
সেথাও কুটীর আছে, নদী বহে কাছে কাছে,
পূর্ণ হয় সরোবর নির্ঝরের নীরে।
আইস! আইস দেব! যাই ধীরে ধীরে!
আয় পাখি! আয় আয়! কার তরে রবি হায়,
উড়ে যা উড়ে যা পাখি! তরুর শাখায়!
প্রভাতে কাহারে পাখি! জাগাবি রে ডাকি ডাকি
'কমলা!' 'কমলা!' বলি মধুর ভাষায়?
ভুলে যা কমলা নামে, চলে যা সুখের ধামে.
'কমলা!' 'কমলা!' ব'লে ডাকিস নে আর।
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে—
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।
তবু উড়ে যাবি নে রে, বসিবি হাতের 'পরে?
আয় তবে, আয় পাখি, সাথে সাথে আয়,
পিতার হাঁতের 'পরে আমার নামটি ধ'রে—
আবার আবার তুই ডাকিস্ সেথায়।
আইস পথিক তবে কাল ব'হে যায়।"
সমীরণ ধীরে ধীরে চুম্বিয়া তটিনীনীরে
দুলাইতে ছিল আহা লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায়?
সহসা রে জলধর নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে?
পাপিয়া শাখার 'পরে ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি কর-না গান, থামিলি কেন রে?
ভুলিয়া শোকের জ্বালা ওই রে চলিছে বালা।
কুটীর ডাকিছে যেন 'যেও না—যেও না!'—
তটিনীতরঙ্গকুল ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেও না! যেও না'—
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙ্গুল তুলি
যেন বলিছেন আহা 'যেও না!—যেও না!'—
নেত্র তুলি স্বর্গ-পানে দেখে পিতা মেঘযানে
হাত নাড়ি বলিছেন 'যেও না!—যেও না!'—
বালিকা পাইয়া ভয় মুদিল নয়নদ্বয়,
এক পা এগোতে আর হয় না বাসনা—

আবার আবার শুন   কানের কাছেতে পুনঃ
কে কহে অস্ফুট স্বরে 'যেও না!—যেও না!'

তৃতীয় সর্গ

"যমুনার জল করে থল্ থল্
কলকলে গাহি প্রেমের গান।
নিশার আঁচোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে
সুধাকর খুলি হৃদয় প্রাণ!
বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি!
ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
মধুকরী প্রেম আলাপে আসি!
আয় আয় সখি! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা।
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা,
হেথায় আয় লো বিপিনবালা।
নতুন ফুটেছে মালতীর কলি,
ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে!
মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
অলি কত কি-যে কহিছে কানে!
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে
কুড়া-না হোথায় বকুলগুলি!
মাধবীর ভরে লতা নুয়ে পড়ে,
আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা,
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্‌সে হেথায় কামিনী পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
আয় আয় হেথা, ওই দেখ্ ভাই,
ভ্রমরা একটি ফুলের কোলে—
কমলা, ফুঁ দিয়ে দে-না লো উড়িয়ে,
ফুলটা আমি লো নেব যে তুলে।
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি
ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি!
আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই একটুকু ঘাসের 'পরে—
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুরু,
আঁখি মুদে আসে ঘুমের তরে!

বল্‌ বনবালা এত কি লো জ্বালা!
রাত দিন তুই কাঁদিবি বসে!
আজো ঘুমঘোর ভাঙিল না তোর,
আজো মজিলি না সুখের রসে!
তবে যা লো ভাই! আমি একেলাই
রাশ্‌ রাশ্‌ করি গাঁথিয়া মালা।
তুই নদীতীরে কাঁদ্‌গে লো ধীরে
যমুনারে কহি মরমজ্বালা!
আজো তুই বোন! ভুলিবি নে বন?
পরণকুটীর যাবি নে ভুলে?
তোর ভাই মন কে জানে কেমন।
আজো বলিলি নে সকল খুলে?"
"কি বলিব বোন! তবে সব শোন্‌!"
কহিল কমলা মধুর স্বরে,
"লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!
ভুলিব সে বন?—ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে—কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে!
ভুলিব তাদের থাকিতে পরাণ?
হৃদয়ে সে সব থাকিতে লেখা?
পারিব ভুলিতে যত দিন চিতে
ভাবনার আহা থাকিবে রেখা?
আজ কত বড় হয়েছে তাহারা,
হয়ত আমার না দেখা পেয়ে
কুটীরের মাঝে খুঁজে খুঁজে খুঁজে
বেড়াতেছে আহা ব্যাকুল হয়ে!
শুয়ে থাকিতাম দুপুরবেলায়
তাহাদের কোলে রাখিয়ে মাথা,
কাছে বসি নিজে গলপ কত যে
করিতেন আহা তখন মাতা!
গিরিশিরে উঠি করি ছুটাছুটি
হরিণের ছানাগুলির সাথে
তটিনীর পাশে দেখিতাম বসে
মুখছায়া যবে পড়িত তাতে।
সরসীভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে,

দেখি মুখ তুলে—কমলিনী দুলে
এপাশে ওপাশে পড়িতে ঢলে!
গাছের উপরে ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতেম লতা,
বসি একাকিনী আপনা-আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা!
ফুটিলে গো ফুল হরষে আকুল
হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে!
ধরি হাতখানি আনিতাম টানি,
দেখাতেম তাঁরে ফুলটি নিয়ে!
তুষার কুড়িয়ে আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে—
পড়িলে কিরণ, কত যে বরণ
ধরিত, আমোদে যেতাম গলে!
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়াছে চোলে!
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরও গিয়াছে সোরে!
শ্রান্ত হয়ে শেষে কুটীরেতে এসে
বসিতাম মুখ মলিন কোরে!
শশধরছায়া পড়িলে সলিলে
ফেলিতাম জলে পাথরকুচি—
সরসীর জল উঠিত উথলে,
শশধরছায়া উঠিত নাচি।
ছিল সরসীতে এক-হাঁটু জল,
ছুটিয়া ছুটিয়া যেতেম মাঝে,
চাঁদের ছায়ারে গিয়া ধরিবারে
আসিতাম পুনঃ ফিরিয়া লাজে।
তটদেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
অভিমানভরে ঈষৎ রাগি
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম—জল উঠিত জাগি।
যবে জলধর শিখরের 'পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে,
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি—
কাপড়-চোপড় ভিজিত জলে!
কিছুই—কিছুই—জানিতাম না রে,
কিছুই হায় রে বুঝিতাম না।
জানিতাম হা রে জগৎমাঝারে
আমরাই বুঝি আছি কজনা!

পিতার পৃথিবী পিতার সংসার
একটি কুটীর পৃথিবীতলে
জানি না কিছুই ইহা ছাড়া আর—
পিতার নিয়মে পৃথিবী চলে।
আমাদেরি তরে উঠে রে তপন,
আমাদেরি তরে চাঁদিমা উঠে,
আমাদেরি তরে বহে গো পবন,
আমাদেরি তরে কুসুম ফুটে!
চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে,
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে।
জানিব আমারি পৃথিবী ধরা,
খেলিব হরিণশাবক-সনে—
পুলকে হরষে হৃদয় ভরা,
বিষাদভাবনা নাহিক মনে।
তটিনী হইতে তুলিব জল,
ঢালি ঢালি দিব গাছের তলে।
পাখীরে বলিব 'কমলা বল্',
শরীরের ছায়া দেখিব জলে!
জেনেছি মানুষ কাহারে বলে।
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি রে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে!
এখন আবার বেঁধেছি চুলে,
বাহুতে পরেছি সোনার বালা।
উরসেতে হার দিয়েছি তুলে,
কবরীর মাঝে মণির মালা!
বাকলের বাস ফেলিয়াছি দূরে—
শত শ্বাস ফেলি তাহার তরে,
মুছেছি কুসুম রেণুর সিঁদুরে
আজো কাঁদে হৃদি বিষাদভরে!
ফুলের বলয় নাইক হাতে,
কুসুমের হার ফুলের সিঁথি—
কুসুমের মালা জড়ায়ে মাথে
স্মরণে কেবল রাখিনু গাঁথি!
এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে।
ফুল তুলি তুলি গহনে বনে
মালা গাঁথি গাঁথি পরিব গায়ে!
হায় রে সে দিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙিগয়া গেছে!

এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ-কাছে!
হাসিব কাঁদিব মানুষের তরে,
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—
মাখিব কাজল আঁখিপাত ভ'রে,
কবরীতে মণি দিব রে তুলে।
মুছিনু নীরজা! নয়নের ধার,
নিভালাম সখি হৃদয়জ্বালা!
তবে সখি আয় আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা!
এই যে মালতী তুলিয়াছ সতি!
এই যে বকুল ফুলের রাশি;
জুঁই আর বেলে ভরেছ আঁচলে,
মধুপ ঝাঁকিয়া পড়িছে আসি!
এই হল মালা, আর না লো বালা—
শুই লো নীরজা! ঘাসের 'পরে।
শুনছিস্ বোন! শোন্ শোন্ শোন্!
কে গায় কোথায় সুধার স্বরে!
জাগিয়া উঠিল হৃদয় প্রাণ!
স্মরণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে!
ঘা দিয়েছে আহা মধুর গান
হৃদয়ের অতি গভীর তলে!
সেই-যে কানন পড়িতেছে মনে
সেই-যে কুটীর নদীর ধারে!
থাক্ থাক্ থাক্ হৃদয়বেদন
নিভাইয়া ফেলি নয়নধারে!
সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত—
পায় দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘলা মেঘলা ছায়ার মত!
তেমনি তেমনি উঠিয়াছে জাগি—
অফুট অফুট হৃদয়-'পরে
কি দেশ কি জানি, কুটীর দুখানি,
মাঠের মাঝেতে মহিষ চরে!
বুঝি সে আমার জনমভূমি
সেখান হইতে গেছিনু চলে!
আজিকে তা মনে জাগিল কেমনে
এত দিন সব ছিলুম ভুলে।
হেথায় নীরজা, গাছের আড়ালে
লুকিয়ে লুকিয়ে শুনিব গান,
যমুনাতীরেতে জ্যোছনার রেতে
গাইছে যুবক খুলিয়া প্রাণ!

কেও কেও ভাই? নীরদ বুঝি?
বিজয়ের[১] আহা প্রাণের সখা!
গাইছে আপন ভাবেতে মজি
যমুনা পুলিনে বসিয়ে একা!
যেমন দেখিতে গুণও তেমন,
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো—
রূপে গুণে মাখা দেখি নি এমন,
নদীর ধারটি করেছে আলো!
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত দিন আহা রয়েছে ভোর!
সরল প্রকৃতি মোহনছবি
অবারিত সদা মনের দোর
মাথার উপরে জড়ান মালা—
নদীর উপরে রাখিয়া আঁখি
জাগিয়া উঠেছে নিশীথবালা
জাগিয়া উঠেছে পাপিয়া পাখী!
আয় না লো ভাই গাছের আড়ালে
আয় আর একটু কাছেতে সরে
এই খানে আয় শুনি দুজনায়
কি গায় নীরদ সুধার স্বরে!”

গান

“মোহিনী কল্পনে! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটি বাজাও না লো!
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে শ্রবণে জীবনে ঢালো!
ভুলিব সকল—ভুলেছি সকল—
কমলচরণে ঢেলেছি প্রাণ!
ভুলেছি—ভুলিব—শোক-অশ্রুজল,
ভুলিছি বিষয়, গরব, মান!

শ্রবণ জীবন হৃদয় ভরি
বাজাও সে বীণা বাজাও বালা!
নয়নে রাখিব নয়নবারি
মরমে নিবারি মরমজ্বালা!

অবোধ হৃদয় মানিবে শাসন
শোকবারিধারা মানিবে বারণ,

[১] কমলাকে যিনি সংসারে আনেন।

কি যে ও বীণার মধুর মোহন
    হৃদয় পরাণ সবাই জানে—
যখনি শুনি ও বীণার স্বরে
মধুর সুধায় হৃদয় ভরে,
কি জানি কিসের ঘুমের ঘোরে
    আকুল করে যে ব্যাকুল প্রাণে!

কি জানি লো বালা! কিসের তরে
    হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে।
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
    জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে!

অফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
    কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
    কি ভাব কে জানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে,
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে,
    ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি!

ভেবেছিনু হায় ভুলিব সকল
সুখ দুখ শোক হাসি অশ্রুজল
আশা প্রেম যত ভুলিব—ভুলিব—
    আপনা ভুলিয়া রহিব সুখে!
ভেবেছিনু হায় কল্পনাকুমারী
বীণাস্বরসুধা পিইয়া তোমারি
হৃদয়ের ক্ষুধা রাখিব নিবারি
    পাশরি সকল বিষাদ দুখে!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে
    বীণার সুধায় হৃদয় ভরি!
ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়,
ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায়
    ফেলে কি না ধরা নয়নবারি!
কই তা পারিনু শোভনা কল্পনে!
বিস্মৃতির জলে ডুবাইতে মনে!
আঁকা যে স্মৃতি হৃদয়ের তলে
    মুছিতে লো তাহা যতন করি!

দেখ লো এখন অবারি হৃদয়
মরম-আধার হুতাশনময়,
শিরায় শিরায় বহিছে অনল
জ্বলন্ত জ্বালায় হৃদয় ভরি!

প্রেমের মুরতি হৃদয়গুহায়
এখনো স্থাপিত রয়েছে রে হায়!
বিষাদ-অনলে আহুতি দিয়া
বলো তুমি তবে বলো কলপনে
যে মুরতি আঁকা হৃদয়ের সনে
কেমনে ভুলিব থাকিতে হিয়া।

কেমনে ভুলিব থাকিতে পরাণ
কেমনে ভুলিব থাকিতে জ্ঞেয়ান
পাষাণ না হলে হৃদয় দেহ!
তাই বলি বালা! আবার—আবার
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার—
ঢাল গো হৃদয়ে সুধার স্নেহ।

শুকায়ে যাউক সজল নয়ান,
হৃদয়ের জ্বালা নিবুক হৃদে,
রেখো না হৃদয়ে একটুকু খান
বিষাদ বেদনা যেখানে বিঁধে।

কেন লো—কেন লো—ভুলিব কেন লো—
এত দিন যারে বেসেছিনু ভাল
হৃদয় পরাণ দেছিনু যারে—
স্থাপিয়া যাহারে হৃদয়াসনে
পূজা করেছিনু দেবতা-সনে
কোন্ প্রাণে আজি ভুলিব তারে!—

দ্বিগুণ জ্বলুক হৃদয়-আগুন।
দ্বিগুণ বহুক বিষাদধারা।
স্মরণের আভা ফুটুক দ্বিগুণ।
হোক হৃদিপ্রাণ পাগলপারা।

প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে
মরমশোণিতে আছে যা গাঁথা—
শত শত শত অশ্রু বারিচয়ে
দিব উপহার দিব রে তথা।

এত দিন যার তরে অবিরল
কেঁদেছিনু হায় বিষাদভরে,
আজিও—আজিও—নয়নের জল
বরষিবে আঁখি তাহারি তরে।

এত দিন ভাল বেসেছিনু যারে
হৃদয় পরাণ দেছিনু খুলে—
আজিও রে ভাল বাসিব তাহারে,
পরাণ থাকিতে যাব না ভুলে।

হৃদয়ের এই ভগনকুটীরে
প্রেমের প্রদীপ করেছে আলা—
যেন রে নিবিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেন রে পাই-না জ্বালা।

কেবল দেখিব সেই মুখখানি,
দেখিব সেই সে গরব হাসি।
উপেক্ষার সেই কটাক্ষ দেখিব,
অধরের কোণে ঘৃণার রাশি।

তবু কল্পনা কিছু ভুলিব না!
সকলি হৃদয়ে থাকুক গাঁথা—
হৃদয়ে, মরমে, বিষাদবেদনা
যত পারে তারে দিক না ব্যথা।

ভুলিব না আমি সেই সন্ধ্যাবায়,
ভুলিব না ধীরে নদী ব'হে যায়,
ভুলিব না হায় সে মুখশশী।
হব না—হব না—হব না বিস্মৃত,
যত দিন দেহে রহিবে শোণিত,
জীবন তারকা না যাবে খসি।
প্রেমগান কর তুমি কল্পনা!
প্রেমগীতে মাতি বাজুক বীণা!
শুনিব, কাঁদিব হৃদয় ঢালি!
নিরাশ প্রণয়ী কাঁদিবে নীরবে।—
বাজাও বাজাও বীণাসুধারবে
নব অনুরাগ হৃদয়ে জ্বালি!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে,
প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ে রাখি।

গাও গো তটিনী প্রেমের গান,
ধরিয়া অফুট মধুর তান
প্রেমগান কর বনের পাখী।”

কহিল কমলা “শুনেছিস্ ভাই
বিষাদে দুখে যে ফাটিছে প্রাণ!
কিসের লাগিয়া, মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান?
কারে ভাল বাসে? কাঁদে কার তরে?
কার তরে গায় খেদের গান?
কার ভালবাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয় প্রাণ?

ভালবাসা আহা পায় নাই ফিরে!
অমন দেখিতে অমন আহা!
নবীন যুবক ভাল বাসে কি রে?
কারে ভাল বাসে জানিস তাহা?

বসেছিনু কাল ওই গাছতলে
কাঁদিতে ছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি।

কহিল ‘শোভনে! ডাকিছে বিজয়,
আমার সহিত আইস তথা।’
কেমন আলাপ! কেমন বিনয়!
কেমন সুধীর মধুর কথা!

চাইতে নারিনু মুখপানে তাঁর,
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
শরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হ’ল না কথা!

কাল হতে ভাই! ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা!
থাকি থাকি থাকি উঠি লো চমকি,
মনে হয় কার পাইনু সাড়া!

কাল হ’তে তাই মনের মতন
বাঁধিয়াছি চুল করিয়া যতন,
কবরীতে তুলে দিয়াছি রতন,
চুলে সঁপিয়াছি ফুলের মালা,

কাজল মেখেছি নয়নের পাতে,
সোনার বলয় পরিয়াছি হাতে,
রজতকুসুম সঁপিয়াছি মাথে,
কি কহিব সখি! এমন জ্বালা!”

চতুর্থ সর্গ

নিভৃত যমুনাতীরে বসিয়া রয়েছে কি রে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞানহত—নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে।

দেখিতে দেখিতে কেন অবশ পাষাণ হেন
চখের পলক নাহি পড়ে।
শোণিত না চলে বুকে, কথাটি না ফুটে মুখে
চুলটিও না নড়ে না চড়ে!

মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জ্যোছনামালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোলস্বর উঠিছে আকাশ-’পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী-গভীরে!

দেখিছে লুটায় ঢেউ আবার লুটায়,
দিগন্তে খেলায়ে পুনঃ দিগন্তে মিলায়।
দেখে শূন্য নেত্র তুলি—খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।

একখণ্ড উড়ে যায় আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি মলিন করিয়া রাতি
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।

পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
ফেনখণ্ড গেল ভেসে নীল নদীজলে,
দিবা ভাবি, অতিদূরে আকাশ সুধায় পূরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপিয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে উচ্চ হতে উচ্চে উঠে—
আকাশ সে সুক্ষ্ম স্বরে উঠিল কাঁপিয়া।

বসিয়া গণিল বালা কত ঢেউ করে খেলা,
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়,
কত ফেন করি খেলা লুটায়ে চুম্বিছে বেলা,
আবার তরঙ্গে চড়ি সুদূরে পলায়।

দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র অবশ পলকপত্র—
অপূর্ব্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা!

নীরদ ক্ষণেক পরে উঠে চমকিয়া,
অপূর্ব্ব স্বপন হতে জাগিল যেন রে।
দূরেতে সরিয়া গিয়া থাকিয়া থাকিয়া
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে।

"সে কি কথা শুধাইছ বিপিনরমণী!
ভালবাসি কিনা আমি তোমারে কমলে?
পৃথিবী হাসিয়া যে লো উঠিবে এখনি!
কলঙ্ক রমণী নামে রটিবে তা হ'লে?

ও কথা শুধাতে আছে? ও কথা ভাবিতে আছে?
ওসব কি স্থান দিতে আছে মনে মনে?
বিজয় তোমার স্বামী বিজয়ের পত্নী তুমি
সরলে! ও কথা তবে শুধাও কেমনে?

তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর!—
হৃদয়ে যা লিখা আছে দেখাবো না কারো কাছে,
হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল!
রুদ্ধ অগ্নিরাশিসম দহিবে হৃদয় মম
ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদিগ্রন্থিজাল।

যদি ইচ্ছা হয় তবে লীলা সমাপিয়া ভবে
শোণিতধারায় তাহা করিব নির্ব্বাণ।
নহে অগ্নিশৈলসম জ্বলিবে হৃদয় মম
যত দিন দেহমাঝে রহিবেক প্রাণ!

যে তোমারে বন হতে এনেছে উদ্ধারি
যাহারে করেছ তুমি পাণি সমর্পণ
প্রণয় প্রার্থনা তুমি করিও তাহারি—
তারে দিও যাহা তুমি বলিবে আপন!

চাই না বাসিতে ভাল, ভাল বাসিব না।
দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে সুখে থাক লয়ে তারে
বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা!"

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি"
কহিল কমলা তবে বিপিনকামিনী,
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখি নি।

এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভালবাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!

ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তায়?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভালবাসি যারে!
তাহারই ভালবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভাল, ভালবাসি যারে।"

নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে,
"সে কি কথা বল বালা, যে জন তোমারে
বিজন কানন হতে করিয়া উদ্ধার
আনিল, রাখিল যত্নে সুখের আগারে—
সে কেন গো ভালবাসা পাবে না তোমার?

হৃদয় সঁপেছে যে লো তোমারে নবীনা
সে কেন গো ভালবাসা পাবে না তোমার?"
কমলা কহিল ধীরে, "আমি তা জানি না।"
নীরদ সমুচ্চ স্বরে কহিল আবার—

"তবে যা লো দুশ্চারিণী! যেথা ইচ্ছা তোর
কর্ তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যত দিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়!

আর তুই পাইবি না দেখিতে আমারে
জ্বলিব যদিন আমি জীবন-অনলে—
স্বরগে বাসিব ভাল যা খুসী যাহারে
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে!

কেন বল্‌ পাগলিনী! ভালবাসি মোরে
অনলে জ্বালিতে চাস্‌ এ জীবন ভোরে!
বিধাতা যে কি আমার লিখেছে কপালে!
যে গাছে রোপিতে যাই শুকায় সমূলে।”

ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে—
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে
মুখপানে চাহি রয় পাগলের মত!

নীরদ উদ্গামী অশ্রু করি নিবারিত
সবেগে সেখান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উন্মত্ত চিত
অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।

পঞ্চম সর্গ

বিজয় নিভৃতে কি কহে নিশীথে?
কি কথা শুধায় নীরজা বালায়—
দেখেছ, দেখেছ হোথা?
ফুলপাত্র হতে ফুল তুলি হাতে
নীরজা শুনিছে, কুসুম গুণিছে,
মুখে নাই কিছু কথা।
বিজয় শুধায়—কমলা তাহারে
গোপনে, গোপনে ভালবাসে কি রে?
তার কথা কিছু বলে কি সখীরে?
যতন করে কি তাহার তরে।
আবার কহিল, “বলো কমলায়
বিজন কানন হইতে যে তায়
করিয়া উদ্ধার সুখের ছায়ায়
আনিল, হেলা কি করিবে তারে?
যদি সে ভাল না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভালবাসিব তাহায়
যত দিন দেহে শোণিত চলে।”
বিজয় যাইল আবাস ভবনে
নিদ্রায় সাধিতে কুসুমশয়নে।
বালিকা পড়িল ভূমির তলে।
বিবর্ণ হইল কপোল বালার,
অবশ হইয়ে এল দেহভার—
শোণিতের গতি থামিল যেন!

ও কথা শুনিয়া নীরজা সহসা
কেন ভূমিতলে পড়িল বিবশা?
দেহ থর থর কাঁপিছে কেন?
ক্ষণেকের পরে লভিয়া চেতন,
বিজয়-প্রাসাদে করিল গমন,
দ্বারে ভর দিয়া চিন্তায় মগন
দাঁড়ায়ে রহিল কেন কে জানে?
বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে!
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি!
ভয়ে, ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র-প্রাণমন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি!
ধীরে, ধীরে, ধীরে খুলিল দুয়ার,
পদাঙ্গুলি 'পরে সঁপি দেহভার
কেও বামা ডরে প্রবেশিছে ঘরে
ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিয়া ভয়ে!
একদৃষ্টে চাহি বিজয়ের মুখে
রহিল দাঁড়ায়ে শয্যার সমুখে,
নেত্রে বহে ধারা মরমের দুখে,
ছবিটির মত অবাক্ হয়ে!
ভিন্ন ওষ্ঠ হতে বহিছে নিশ্বাস—
দেখিছে নীরজা, ফেলিতেছে শ্বাস,
সুখের স্বপন দেখিয়ে তখন
ঘুমায় যুবক প্রফুল্লমুখে!
'ঘুমাও বিজয়! ঘুমাও গভীরে—
দেখো না দুখিনী নয়নের নীরে
করিছে রোদন তোমারি কারণ—
ঘুমাও বিজয় ঘুমাও সুখে!
দেখো না তোমারি তরে একজন
সারা নিশি দুখে করি জাগরণ
বিছানার পাশে করিছে রোদন—
তুমি ঘুমাইছ ঘুমাও ধীরে!
দেখো না বিজয়! জাগি সারা নিশি
প্রাতে অন্ধকার যাইলে গো মিশি
আবাসেতে ধীরে যাই গো ফিরে—

তিতিয়া বিষাদে নয়ননীরে
ঘুমাও বিজয়। ঘুমাও ধীরে!'

ষষ্ঠ সর্গ

"কমলা ভুলিবে সেই শিখর কানন,
কমলা ভুলিবে সেই বিজন কুটীর—
আজ হতে নেত্র! বারি কোরো না বর্ষণ,
আজ হ'তে মন প্রাণ হও গো সুস্থির।

অতীত ও ভবিষ্যত হইব বিস্মৃত।
জুড়িয়াছে কমলার ভগন হৃদয়!
সুখের তরঙ্গ হৃদে হয়েছে উত্থিত,
সংসার আজিকে হোতে দেখি সুখময়।

বিজয়েরে আর করিব না তিরস্কার
সংসারকাননে মোরে আনিয়াছে বলি।
খুলিয়া দিয়াছে সে যে হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি!

জমি জমি জলরাশি পর্ব্বতগুহায়
একদিন উথলিয়া উঠে রে উচ্ছ্বাসে,
একদিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিয়া যায়,
গাহিয়া সুখের গান যায় সিন্ধুপাশে।—

আজি হতে কমলার নূতন উচ্ছ্বাস,
বহিতেছে কমলার নূতন জীবন।
কমলা ফেলিবে আহা নূতন নিশ্বাস,
কমলা নূতন বায়ু করিবে সেবন।

কাঁদিতে ছিলাম কাল বকুলতলায়,
নিশার আঁধারে অশ্রু করিয়া গোপন!
ভাবিতে ছিলাম বসি পিতায় মাতায়—
জানি না নীরদ আহা এয়েছে কখন।

সেও কি কাঁদিতে ছিল পিছনে আমার?
সেও কি কাঁদিতে ছিল আমারি কারণ?
পিছনে ফিরিয়া দেখি মুখপানে তার,
মন যে কেমন হল জানে তাহা মন।

নীরদ কহিল হৃদি ভরিয়া সুধায়—
'শোভনে! কিসের তরে করিছ রোদন?'
আহা হা! নীরদ যদি আবার শুধায়,
'কমলে! কিসের তরে করিছ রোদন?'

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল—
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান।

ওই যে নীরজা আসে পরাণ-সজনী,
একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবীমাঝার!
হেন বন্ধু আছে কি রে নির্দ্দয় ধরণী!
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?

ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?
ওকি সখি আজ কেন বাঁধ নাই চুল?
শুকনো শুকনো মুখ কেন আজি বালা?

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল?
কোথা যাও, কোথা সই, যেও না, যেও না!
কি হয়েছে? বল্‌বি নে—বল্ সখি বল্!
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা?"

"কি হয়েছে, কে দিয়েছে, বলি গো সকল।
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা—
ফেলিব যে চিরকাল নয়নের জল
নিভায়ে ফেলিতে বালা মরমবেদনা!

কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল?
বলি তবে তুই সখি তুই! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল?
কমলারে ভালবাসে আমার বিজয়!

কেন হলুম না বালা আমি তোর মত,
বন হতে আসিতাম বিজয়ের সাথে—
তোর মত কমলা লো মুখ আঁখি যত
তা হলে বিজয়-মন পাইতাম হাতে!

পরাণ হইতে অগ্নি নিভিবে না আর
বনে ছিলি বনবালা সে ত বেশ ছিলি—
জ্বালালি!—জ্বলিলি বোন! খুলি মর্ম্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।"

কমলা চাহিয়া রয়, নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রুরাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস—
কমলা কহিল ধীরে "জ্বালালি জ্বলিলি!"

আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে
যমুনাতরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর—
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজম্ময় কর!

হেরিল আকাশ-পানে সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে!

"ওই খানে আছে পিতা, ওই খানে আছে মাতা,
ওই জ্যোৎস্নাময় চাঁদে করি বিচরণ
দেখিছেন হোথা হোতে দাঁড়ায়ে সংসারপথে
কমলা নয়নবারি করিছে মোচন।

একি রে পাপের অশ্রু? নীরদ আমার—
নীরদ আমার যথা আছে লুক্কায়িত,
সেই খান হোতে এই অশ্রুবারিধার
পূর্ণ উৎস-সম আজ হ'ল উৎসারিত।

এ ত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?
বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার
ভাল বাসিব না? হায় এ হৃদয় তবে
বজ্র দিয়া দিক বিধি ক'রে চুরমার!

এ বক্ষে হৃদয় নাই, নাইক পরাণ,
একখানি প্রতিমূর্ত্তি রেখেছি শরীরে—
রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান
রহিবে, যদিন রক্ত রবে শিরে শিরে!

সেই মূর্ত্তি নীরদের! সে মূর্ত্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?
তবুও সে পাপ—আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে!

তবু মুছিব না অশ্রু এ নয়ান হোতে,
কেন বা জানিতে চাব পাপ কারে বলি?
দেখুক জনক মোর ওই চন্দ্র হোতে
দেখুন জননী মোর আঁখি দুই মেলি!

নীরজা গাইত 'চল্‌ চন্দ্রলোকে র'বি।
সুধাময় চন্দ্রলোক, নাই সেথা দুখ শোক,
সকলি সেথায় নব ছবি!

ফুলবক্ষে কীট নাই, বিদ্যুতে অশনি নাই,
কাঁটা নাই গোলাপের পাশে!
হাসিতে উপেক্ষা নাই, অশ্রুতে বিষাদ নাই,
নিরাশার বিষ নাই শ্বাসে।

নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই,
কোলাহল নাইক দিবায়!
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত,
তৃপ্তি নাই মাধুর্য্যশোভায়।

লতিকা কুসুমময়, কুসুম সুরভিময়,
সুরভি মৃদুতাময় যেথা!
জীবন স্বপনময়, স্বপন প্রমোদময়,
প্রমোদ নূতনময় সেথা!

সঙ্গীত উচ্ছ্বাসময়, উচ্ছ্বাস মাধুর্য্যময়,
মাধুর্য্য মত্ততাময় অতি।
প্রেম অস্ফুটতামাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নে-মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি!

গভীর নিশীথে যেন, দূর হোতে স্বপ্ন-হেন
অস্ফুট বাঁশীর মৃদু রব—
সুধীরে পশিয়া কানে শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব।

এখানে সকলি যেন অস্ফুট মধুর-হেন,
উষার সুবর্ণ জ্যোতি-প্রায়।
আলোকে আঁধার মিশে মধু জ্যোছনায় দিশে
রাখিয়াছে ভরিয়া সুধায়!

দূর হোতে অপ্সরার মধুর গানের ধার,
নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি।
নদীর অস্ফুট তান মলয়ের মৃদুগান
একস্বরে মিশেছে এমনি!

সকলি অস্ফুট হেথা মধুর স্বপনে-গাঁথা
চেতনা মিশান' যেন ঘুমে।
অশ্রু শোক দুঃখ ব্যথা কিছুই নাহিক হেথা
জ্যোতির্ম্ময় নন্দনের ভূমে!'

আমি যাব সেই খানে পুলকপ্রমত্ত প্রাণে
সেই দিনকার মত বেড়াব খেলিয়া—
বেড়াব তটিনীতীরে, খেলাব তটিনীনীরে,
বেড়াইব জ্যোছনায় কুসুম তুলিয়া!

শুনিছি মৃত্যুর পিছু পৃথিবীর সব-কিছু
ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে!
ওমা! সে কি করে হবে? মরিতে চাই না তবে
নীরদে ভুলিতে আমি চাব কোন্ প্রাণে?"

কমলা এতেক পরে হেরিল সহসা
নীরদ কাননপথে যাইছে চলিয়া—
মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা,
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া।

নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল,
দেহ আবরিয়া রহে গৈরিক বসন,
গভীর ঔদাস্যে যেন পূর্ণ হৃদিতল—
চলিছে যে দিকে যেন চলিছে চরণ।

যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি,
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
যুবক চলিয়া যায় বালিকা তবুও হায়!
চাহি রয় একদৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি।

ঘুম হতে যেন জাগি সহসা কিসের লাগি
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়।
যুবক চমকি প্রাণে হেরি চারি দিক-পানে
পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।

"কোথা যাও—কোথা যাও—নীরদ! যেও না!
একটি কহিব কথা শুন একবার!
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত রও—পুরাও কামনা!
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার!

জিজ্ঞাসা করিবে নাকি আজি যুবাবর
'কমলা কিসের তরে করিছ রোদন?'
তা হলে কমলা আজি দিবেক উত্তর,
কমলা খুলিবে আজি হৃদয়বেদন।

দাঁড়াও—দাঁড়াও যুবা! দেখি একবার,
যেথা ইচ্ছা হয় তুমি যেও তার পর!
কেন গো রোদন করি শুধাও আবার,
কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর!

কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর,
কমলা হৃদয় খুলি দেখাবে তোমায়—
সেথায় রয়েছে লেখা দেখো তার পর
কমলা রোদন করে কিসের জ্বালায়!"

"কি কব কমলা আর কি কব তোমায়,
জনমের মত আজ লইব বিদায়!
ভেঙেগেছে পাষাণ প্রাণ, ভেঙেগেছে সুখের গান—
এ জন্মে সুখের আশা রাখি নাক আর!

এ জন্মে মুছিব নাক নয়নের ধার!
কত দিন ভেবেছিনু যোগীবেশ ধরে
ভ্রমিব যেথায় ইচ্ছা কানন-প্রান্তরে।

তবু বিজয়ের তরে এত দিন ছিনু ঘরে
হৃদয়ের জ্বালা সব করিয়া গোপন—
হাসি টানি আনি মুখে এত দিন দুখে দুখে
ছিলাম, হৃদয় করি অনলে অর্পণ!

কি আর কহিব তোরে— কালিকে বিজয় মোরে
কহিল জন্মের মত ছাড়িতে আলয়!
জানেন জগৎস্বামী— বিজয়ের তরে আমি
প্রেম বিসর্জ্জিয়াছিনু তুষিতে প্রণয়।”

এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর!
কাঁপিতে লাগিল কমলার কলেবর,
নিবিড় কুন্তল যেন উঠিল ফুলিয়া—
যুবারে সম্ভাষে বালা এতেক বলিয়া—

“কমলা তোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!
প্রেমেরে ডুবাব আজি বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!

তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?
নিষ্ঠুর! আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি মোর দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?

তুমিও চলিলে যদি হইয়া উদাস—
কেন গো বহিব তবে এ হৃদি হতাশ?
আমিও গো আভরণ ভূষণ ফেলিয়া
যোগিনী তোমার সাথে যাইব চলিয়া।

যোগিনী হইয়া আমি জন্মেছি যখন
যোগিনী হইয়া প্রাণ করিব বহন।
কাজ কি এ মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—
পরিব বাকলবাস ফুলের ভূষণ।

নীরদ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন!
নতুবা যমুনাজলে এখনই অবহেলে
ত্যজিব বিষাদদগ্ধ নারীর জীবন!”

পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা?
শোণিতে মৃত্তিকাতল হইল রঞ্জিত!
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে হয়েছে নিহিত!

কমলা সভয়ে শোকে করিল চিৎকার।
রক্তমাখা হাতে ওই চলিছে বিজয়!
নয়নে আঁচল চাপি কমলা আবার—
সভয়ে মুদিয়া আঁখি স্থির হ'য়ে রয়।

আবার মেলিয়া আঁখি মুদিল নয়নে,
ছুটিয়া চলিল বালা যমুনার জলে—
আবার আইল ফিরি যুবার সদনে,
যমুনা-শীতল জলে ভিজায়ে আঁচলে।

যুবকের ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়—
এক বিন্দু পড়িল না নয়নের জল,
এক বারো বহিল না দীর্ঘশ্বাস-বায়।

তুলি নিল যুবকের মাথা কোল-'পরে—
একদৃষ্টে মুখপানে রহিল চাহিয়া।
নিজ্জীব প্রতিমা-প্রায় না নড়ে না চড়ে,
কেবল নিশ্বাস মাত্র যেতেছ বহিয়া।

চেতন পাইয়া যুবা কহে কমলায়,
"যে ছুরীতে ছিঁড়িয়াছে জীবনবন্ধন
অধিক সুতীক্ষ্ন ছুরী তাহা অপেক্ষায়
আগে হোতে প্রেমরজ্জু করেছে ছেদন।

বন্ধুর ছুরিকা-মাখা দ্বেষহলাহলে
করেছে হৃদয়ে দেহে আঘাত ভীষণ,
নিবেছে দেহের জ্বালা হৃদয়-অনলে—
ইহার অধিক আর নাইক মরণ!

বকুলের তলা হোক্ রক্তে রক্তময়!
মৃত্তিকা রঞ্জিত হোক্ লোহিত বরণে!
বসিবে যখন কাল হেথায় বিজয়
আচ্ছন্ন বন্ধুতা পুনঃ উদিবে না মনে?

মৃত্তিকার রক্তরাগ হোয়ে যাবে ক্ষয়—
বিজয়ের হৃদয়ের শোণিতের দাগ
আর কি কখনো তার হবে অপচয়?
অনুতাপ-অশ্রুজলে মুছিবে সে রাগ?

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি প্রেমের কিরণে
　　(রবিকরে হীনভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কি রে বিজয়ের মনে?
　　উদিত হইবে না কি আবার কখন?

একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়!
　　একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে!
একদিন মুছিবারে হইতে হৃদয়
　　চাহিবে সে রক্তধারা অশ্রুবারিধারে!

কমলে! খুলিয়া ফেল আঁচল তোমার!
　　রক্তধারা যেথা ইচ্ছা হোক প্রবাহিত!
বিজয় শুধেছে আজি বন্ধুতার ধার
　　প্রেমেরে করায়ে পান বন্ধুর শোণিত!

চলিনু কমলা আজ ছাড়িয়া ধরায়—
　　পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িয়া বন্ধন,
জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মিত্রতায়,
　　প্রেমের দাসত্ব রজ্জু করিয়া ছেদন!"

অবসন্ন হোয়ে প'ল যুবক তখনি,
　　কমলার কোল হোতে পড়িল ধরায়!
উঠিয়া বিপিনবালা সবেগে অমনি
　　উর্দ্ধহস্তে কহে উচ্চ সুদৃঢ় ভাষায়—

"জ্বলন্ত জগৎ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা!
　　দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে!
পৃথিবীর পাপ পুণ্য, হিংসা, রক্তধারা
　　তোমরাই লিখে রাখ জ্বলদ্ অক্ষরে!

সাক্ষী হও তোমরা গো করিও বিচার!—
　　তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর!
ব'হে যাও!—ব'হে যাও যমুনার ধার,
　　নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর!

এখনই অস্তাচলে যেও না তপন!
　　ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি দিনকর!
এই, এই রক্তধারা করিয়া শোষণ
　　লয়ে যাও, লয়ে যাও স্বর্গের গোচর!

ধুস্ নে যমুনাজল! শোণিতের ধারে!
বকুল তোমার ছায়া লও গো সরিয়ে!
গোপন ক'রো না উহা নিশীথ! আঁধারে!
জগৎ! দেখিয়া লও নয়ন ভরিয়ে!

অবাক হউক্ পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে!
অবাক হইয়া যাক্ আঁধার নরক!
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে!
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়নপলক!

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন!
বিস্মৃতি! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে;
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে!

বিষাদ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সমুখে তার নরকের বিষ!
শান্তির কুটীরে তার জ্বালায়ো অনল!
বিষবৃক্ষবীজ তার হৃদয়ে রোপিস্!

দূর হ—দূর হ তোরা ভূষণ রতন!
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা!
আবার কবরি! তোরে করিনু মোচন!
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা!

কি বলিস্ যমুনা লো! কমলা বিধবা!
জাহ্নবীরে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!
পাখী! কি করিস্ গান 'কমলা বিধবা'!
দেশে দেশে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!

আয়! শুক ফিরে যা লো বিজন শিখরে,
মৃগদের বল্ গিয়া উঁচু করি গলা—
কুটীরকে বল্ গিয়ে, তটিনী, নির্ঝরে—
'বিধবা হয়েছে সেই বালিকা কমলা!'

উহুহু! উহুহু—আর সহিব কেমনে?
হৃদয়ে জ্বলিছে কত অগ্নিরাশি মিলি!
বেশ ছিনু বনবালা, বেশ ছিনু বনে!—
নীরজা বলিয়া গেছে 'জ্বালালি! জ্বলিলি'!"

সপ্তম সর্গ

শ্মশান

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন!
সর সর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়!

গাছপালা নাই কোথা প্রান্তর গম্ভীর!
শাখাপত্রহীন বৃক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ, উঁচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে—দূরে নিরখিয়া চারি দিক-পান
পৃথিবীর ধ্বংসরাশি, রহিয়াছে হোয়ে ম্রিয়মাণ?

শ্মশানের নাই প্রাণ যেন আপনার,
শুষ্ক তৃণরাজি তার ঢাকিয়াছে বিশাল বিস্তার!
তৃণের শিশির চুমি বহে নাকো প্রভাতের বায়
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া হেথায় হোথায়।

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক!
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্মমাঝে লুকাইয়া মুখ!
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গারশিখায়!

বিকট দশন মেলি মানবকপাল—
ধ্বংসের স্মরণস্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল!
গভীর আঁখিকোটর আঁধারেরে দিয়েছে আবাস,
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস!

মানবকঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়—
কাণের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায়!
তটিনী কহিছে কাণে 'উঠ! উঠ! উঠ নিদ্রা হোতে'
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ-আঘাতে!

উঠ গো কঙ্কাল! কত ঘুমাইবে আর!
পৃথিবীর বায়ু এই বহিতেছে উঠ আরবার!
উঠ গো কঙ্কাল! দেখ স্রোতস্বিনী ডাকিছে তোমায়
ঘুমাইবে কত আর বিসর্জ্জন দিয়া চেতনায়!

বল না, বল না তুমি ঘুমাও কি বোলে?
কাল যে প্রেমের মালা পরাইয়াছিল এই গলে
তরুণী ষোড়শী বালা! আজ তুমি ঘুমাও কি বলে!
অনাথারে একাকিনী সঁপিয়া এ পৃথিবীর কোলে!

উঠ গো—উঠ গো—পুনঃ করিনু আহ্বান!
শুন, রজনীর কাণে ওই সে করিছে খেদ গান!
সময় তোমার আজো ঘুমাবার হয় নাই ত রে!
কোল বাড়াইয়া আছে পৃথিবীর সুখ তোমা-তরে!

তুমি গো ঘুমাও, আমি বলি না তোমারে!
জীবনের রাত্রি তব ফুরায়েছে নেত্রধারে-ধারে!
এক বিন্দু অশ্রুজল বরষিতে কেহ নাই তোর,
জীবনের নিশা আহা এত দিনে হইয়াছে ভোর!

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধূমরাশি শ্বসে!
একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের 'পরে।

কার চিতা জ্বলিতেছে কাহার কে জানে?
কমলা! কেন গো তুমি তাকাইয়া চিতাগ্নির পানে?
একাকিনী অন্ধকারে ভীষণ এ শ্মশানপ্রদেশে
ভূষণবিহীনদেহে, শুষ্কমুখে, এলোথেলো কেশে?

কার চিতা জান কি গো কমলে জিজ্ঞাসি!
দেখিতেছ কার চিতা শ্মশানেতে একাকিনী আসি?
নীরদের চিতা? নীরদের দেহ অগ্নিমাঝে জ্বলে?
নিবায়ে ফেলিবে অগ্নি, কমলে, কি নয়নের জলে?

নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কমলা দাঁড়ায়ে!
    গভীর নিশ্বাসবায়ু উচ্ছ্বাসিয়া উঠে!
ধূমময় নিশীথের শ্মশানের বায়ে
    এলোথেলো কেশরাশি চারি দিকে ছুটে!

ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার
    চিতার অনলোত্থিত অস্ফুট আলোক
পড়িয়াছে ঘোর ম্লান মুখে কমলার,
    পরিস্ফুট করিতেছে সুগভীর শোক!

নিশীথে শ্মশানে আর নাই জন প্রাণী,
    মেঘান্ধ অমান্ধকারে মগ্ন চরাচর!
বিশাল শ্মশানক্ষেত্রে শুধু একাকিনী
    বিষাদপ্রতিমা বামা বিলীন-অন্তর!

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
নিশীথশ্মশানবায়ু শ্বসিছে উচ্ছ্বাসে!
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া!
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে!

শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া
নীরব শ্মশানময় তুলি প্রতিধ্বনি!
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি!

এ-হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা!
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ!
শূন্যনেত্রে শূন্যহৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ননিবেশ!

কমলা চিতায় নাকি করিবে প্রবেশ?
বালিকা কমলা নাকি পশিবে চিতায়?
অনলে সংসারলীলা করিবি কি শেষ?
অনলে পুড়াবি নাকি সুকুমার কায়?

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম হায়—
ছুটিতিস্ ফুল তুলে কাননে কাননে
ফুলে ফুল সাজাইয়া ফুলসম কায়—
দেখাতিস সাজসজ্জা পিতার সদনে!

দিতিস হরিণশৃঙ্গে মালা জড়াইয়া!
হরিণশিশুরে আহা বুকে লয়ে তুলি
সুদূর কাননভাগে যেতিস্ ছুটিয়া,
ভ্রমিতিস্ হেথা হোথা পথ গিয়া ভুলি!

সুধাময়ী বীণাখানি লোয়ে কোল-'পরে
সমুচ্চ হিমাদ্রিশিরে বসি শিলাসনে
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে!

হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর
শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি!
শুনিত, ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর
বড় বড় আঁখিদুটি মুখ-পানে তুলি!

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ?
সুখের যৌবন হায় পোড়াবি আগুনে?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষ!

না, না, না, সরলা বালা, ফিরে যাই চল্
এসেছিলি যেথা হোতে সেই সে কুটীরে!
আবার ফুলের গাছে ঢালিবি লো জল!
আবার ছুটিবি গিয়ে পর্ব্বতের শিরে!

পৃথিবীর যাহা কিছু ভুলে যা লো সব,
নিরাশযন্ত্রণাময় পৃথ্বীর প্রণয়!
নিদারুণ সংসারের ঘোর কলরব,
নিদারুণ সংসারের জ্বালা বিষময়।

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন!
সংসারকণ্টকবনে পারিজাত ফুল!
নন্দনের বনে গিয়া গাইবি খুলিয়া হিয়া,
নন্দনমলয়বায়ু করিবি আকুল।

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে—
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যথা কলকলস্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুলদল!

বন-ফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে!
দয়াময়ী বনদেবী শিশিরসেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে।

এখনো কমলা ওই রয়েছে
জ্বলন্ত চিতার 'পরে মেলিয়ে নয়ন!
ওই রে সহসা ওই মুর্চ্ছিয়ে পড়িয়ে
ভস্মের শয্যার পরে করিল শয়ন!

এলায়ে পড়িল ভস্মে সুনিবিড় কেশ!
অঞ্চলবসন ভস্মে পড়িল এলায়ে!
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলুথালু বেশ
কমলার বক্ষ হোতে, শ্মশানের বায়ে!

নিবে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল!
এখনো কমলা বালা মূর্চ্ছায় মগন!
শুকতারা উজলিল গগনের তল,
এখনো কমলা বালা স্তব্ধ অচেতন!

ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্ব্বাশার সুবর্ণ তোরণে
রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া।

এখনো কমলা বালা ঘোর অচেতন,
কমলা-কপোল চুমে অরুণকিরণ!
গণিছে কুন্তলগুলি প্রভাতের বায়,
চরণে তটিনী বালা তরঙ্গ দুলায়!

কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির!
নিস্তেজ সুবর্ণকরে পিতেছে মিহির!
শিথিল অঞ্চলখানি লোয়ে ঊর্ম্মিমালা
কত কি—কত কি কোরে করিতেছে খেলা!

ক্রমশঃ বালিকা ওই পাইছে চেতন!
ক্রমশঃ বালিকা ওই মেলিছে নয়ন!
বক্ষোদেশ আবরিয়া অঞ্চলবসনে
নেহারিল চারি দিক বিস্মিত নয়নে।

ভস্মরাশিসমাকুল শ্মশানপ্রদেশ!
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্য্যের লেশ,
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি!

সূর্য্যকর পড়িয়াছে শুষ্কম্লানপ্রায়,
ভস্মমাখা ছুটিতেছে প্রভাতের বায়!
কোথাও নাই রে যেন আঁখির বিশ্রাম,
তটিনী ঢালিছে কানে বিষাদের গান!

বালিকা কমলা ক্রমে করিল উত্থান
ফিরাইল চারি দিকে নিস্তেজ নয়ান।
শ্মশানের-ভস্ম-মাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া!

অষ্টম সর্গ

বিসর্জ্জন

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর!
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।

আজিও সে শৈলবালা বিস্তারিয়া উর্ম্মিমালা,
চলিছে কত কি কহি আপনার মনে!
তুষারশীতল বায় পুষ্প চুমি চুমি যায়,
খেলা করে মনোসুখে তটিনীর সনে।

কুটীর তটিনীতীরে লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিলদর্পণে!
হরিণেরা তরুছায়ে খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপকম্পনে।

বনের পাদপপত্র আজিও মানবনেত্র
হিংসার অনলময় করে নি লোকন!
কুসুম লইয়া লতা প্রণত করিয়া মাথা
মানবেরে উপহার দেয় নি কখন!

বনের হরিণগণে মানবের শরাসনে
ছুটে ছুটে ভ্রমে নাই তরাসে তরাসে!
কানন ঘুমায় সুখে নীরব শান্তির বুকে,
কলঙ্কিত নাহি হোয়ে মানবনিশ্বাসে।

কমলা বসিয়া আছে উদাসিনী বেশে
শৈলতটিনীর তীরে এলোথেলো কেশে
অধরে সঁপিয়া কর, অশ্রু বিন্দু ঝর ঝর
ঝরিছে কপোলদেশে—মুছিছে আঁচলে।
সম্বোধিয়া তটিনীরে ধীরে ধীরে বলে,
"তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে!
কিন্তু সেই ছেলেবেলা যেমন করিতে খেলা
তেমনি করিয়ে খেলো নির্ঝরের সনে!

তখন যেমন স্বরে কল কল গান করে
মৃদু বেগে তীরে আসি পড়িতে লো ঝাঁপি
বালিকা ক্রীড়ার ছলে পাথর ফেলিয়া জলে
মারিতাম—জলরাশি উঠিত লো কাঁপি

তেমনি খেলিয়ে চল্ তুই লো তটিনীজল!
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।
নির্ঝর তেমনি কোরে ঝাঁপিয়া সরসী-'পরে
পড়্ লো উগরি শুভ্র ফেনরাশিভার!

মুছিতে লো অশ্রুবারি এয়েছি হেথায়।
তাই বলি পাপিয়ারে! গান কর্ সুধাধারে
নিবাইয়া হৃদয়ের অনলশিখায়!

ছেলেবেলাকার মত বায়ু তুই অবিরত
লতার কুসুমরাশি কর্ লো কম্পিত!
নদী চল্ দুলে দুলে! পুষ্প দে হৃদয় খুলে!
নির্ঝর সরসীবক্ষ কর্ বিচলিত!

সেদিন আসিবে আর হৃদিমাঝে যাতনার
রেখা নাই, প্রমোদেই পূরিত অন্তর!
ছুটাছুটি করি বনে বেড়াইব ফুল্লমনে,
প্রভাতে অরুণোদয়ে উঠিব শিখর!

মালা গাঁথি ফুলে ফুলে জড়াইব এলোচুলে,
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল!
বড় বড় দুটি আঁখি মোর মুখপানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল!

সেদিন গিয়েছে হা রে— বেড়াই নদীর ধারে
ছায়াকুঞ্জে শুনি গিয়ে শুকদের গান!
না থাক্, হেথায় বসি, কি হবে কাননে পশি—
শুক আর গাবে নাকো খুলিয়ে পরাণ!
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান!

জুড়ায়ে হৃদয়ব্যথা দুলিবে না পুষ্পলতা,
তেমন জীবন্ত ভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণহীন যেন সবি— যেন রে নীরব ছবি—
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়!

তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল!
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে!
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল!

যাই তবে বনে বনে ভ্রমিগে আপনমনে,
যাই তবে গাছে গাছে ঢালি দিই জল!
শুকপাখীদের গান শুনিয়া জুড়াই প্রাণ,
সরসী হইতে তবে তুলিগে কমল!

হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে!
ভ্রমি ত ভ্রমিই বনে ম্রিয়মাণ শূন্যমনে,
দেখি ত দেখিই বোসে সলিল-উচ্ছ্বাসে!
তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে—
দেখিয়া লতার কোলে ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—

নির্ঝরের ঝরঝরে হৃদয়ে তেমন কোরে
উল্লাসে শোণিতরাশি উঠে না নাচিয়া!
কি জানি কি করিতেছি, কি জানি কি ভাবিতেছি,
কি জানি কেমনধারা শূন্যপ্রায় হিয়া!

তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে,
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল!

কাননে পশিগে তবে শুক যেথা সুধারবে
গান করে জাগাইয়া নীরব কানন।
উঁচু করি করি মাথা হরিণেরা বৃক্ষপাতা
সুধীরে নিঃশঙ্কমনে করিছে চর্ব্বণ!”

সুন্দরী এতেক বলি পশিল কাননস্থলী,
পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।
বৃক্ষছায়ে তলে তলে ধীরে ধীরে নদী চলে
সলিলে বৃক্ষের মূল করি প্রক্ষালন।

হরিণ নিঃশঙ্কমনে শুয়ে ছিল ছায়াবনে,
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি রয়,
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

ছুটিছে হরিণচয়, কমলা অবাক্ রয়—
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রুজল।
ওই যায়—ওই যায় হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।

কমলা বিষাদভরে কহিল সমুচ্চস্বরে—
প্রতিধ্বনি বন হোতে ছুটে বনান্তরে—
"যাস্ নে—যাস্ নে তোরা, আয় ফিরে আয়!
কমলা—কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে!

সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে,
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে!
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে!

কোথা যাস্—কোথা যাস্—আয় ফিরে আয়!
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা!
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায়?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ! আয় লো চপলা!

এলি নে—এলি নে তোরা এখনো এলি নে—
কমলা ডাকিছে যে রে, তবুও এলি নে!
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে?
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে?

খুলিয়া ফেলিনু এই কবরীবন্ধন,
এখনও ফিরিবি না হরিণের দল?
এই দেখ্—এই দেখ্ ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল!
যাক্ তবে, যাক্ চ'লে—যে যায় যেখানে—
শুক পাখী উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে!
আয়—আয়—আয় তুই আয় রে মরণ!
বিনাশশক্তিতে তোর নিভা এ যন্ত্রণা!
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!
বহিতে অনল হৃদে আর ত পারি না!

নীরদ স্বরগে আছে, আছেন জনক
স্নেহময়ী মাতা মোর কোল রাখি পাতি—
সেথায় মিলিব গিয়া, সেথায় যাইব—
ভোর করি জীবনের বিষাদের রাতি!
নীরদে আমাতে চড়ি প্রদোষতারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ,
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এত কাল যার কোলে কাটিল জীবন।

শুকতারা প্রকাশিবে ঊষার কপোলে
তখন রাখিয়া মাথা নীরদের কোলে—
অশ্রুজলসিক্ত হয়ে কব সেই কথা
পৃথিবী ছাড়িয়া এনু পেয়ে কোন্ ব্যথা!

নীরদের আঁখি হোতে ব'বে অশ্রুজল!
মুছিব হরষে আমি তুলিয়া আঁচল!
আয়—আয়—আয় তুই, আয় রে মরণ!
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!"

এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারি দিক গেছে খুলে
উপত্যকা, বনভূমি, বিপিন, ভূধর!

তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়!
ছোট ছোট গাছপালা—
সঙ্কীর্ণ নির্ঝরমালা—
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা-প্রায়।

গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর!

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মাথায় জলদ ঠেকে,
চরণে চাহিয়া দেখে
গাছপালা ঝোপে-ঝাপে ভূধর আবরি!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা-রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা
কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায়!
বন, গিরি, লতা, পাতা আঁধারে মিশায়!

অসংখ্য শিখরমালা ব্যাপি চারি ধার—
মধ্যের শিখর-'পরে

(মাথায় আকাশ ধরে)
কমলা দাঁড়ায়ে আছে, চৌদিকে তুষার!

চৌদিকে শিখরমালা—
মাঝেতে কমলা বালা
একেলা দাঁড়ায়ে মেলি নয়নযুগল!
এলোথেলো কেশপাশ,
এলোথেলো বেশবাস,
তুষারে লুটায়ে পড়ে বসন-আঁচল!

যেন কোন্ সুরবালা
দেখিতে মর্ত্ত্যের লীলা
স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাদ্রিশিখরে
চড়িয়া নীরদ-রথে—
সমুচ্চ শিখর হোতে
দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে!

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
হিমময় বায়ু ছুটে,
অন্তরে অন্তরে ফুটে
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছাস স্তব্ধপ্রায় করি!
শীতল তুষারদল
কোমল চরণতল
দিয়াছে অসাড় ক'রে পাষাণের মত!
কমলা দাঁড়ায়ে আছে যেন জ্ঞানহত!
কোথা স্বর্গ—কোথা মর্ত্ত্য—আকাশ পাতাল!
কমলা কি দেখিতেছে!
কমলা কি ভাবিতেছে!
কমলার হৃদয়েতে ঘোর গোলমাল!

চন্দ্র সূর্য্য নাই কিছু—
শূন্যময় আগু পিছু!
নাই রে কিছুই যেন ভূধর কানন!
নাইক শরীর দেহ,
জগতে নাইক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন!
কে আছে—কে আছে—আজি কর গো বারণ!

বালিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন!
বারণ কর গো তুমি গিরি হিমালয়!
শুনেছ কি বনদেবী—করুণা-আলয়—

বালিকা তোমার কোলে করিত ক্রন্দন,
সে নাকি মরিতে আজ করেছে মনন?

বনের কুসুমকলি
তপনতাপনে জ্বলি
শুকায়ে মরিবে নাকি করেছে মনন!
শীতল শিশিরধারে
জীয়াও জীয়াও তারে
বিশুষ্ক হৃদয়মাঝে বিতরি জীবন!

উদিল প্রদোষতারা সাঁঝের আঁচলে—
এখনি মুদিবে আঁখি?
বারণ করিবে না কি?
এখনি নীরদকোলে মিশাবে কি বোলে?

অনন্ত তুষারমাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মোহস্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি!

উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন!
বনবালা থাকি থাকি
সহসা মুদিল আঁখি
কাঁপিয়া উঠিল দেহ! কাঁপি উঠে মন!

অনন্ত আকাশমাঝে একেলা কমলা!
অনন্ত তুষারমাঝে একেলা কমলা!
সমুচ্চ শিখর-'পরে একেলা কমলা!
আকাশে শিখর উঠে
চরণে পৃথিবী লুটে—
একেলা শিখর-'পরে বালিকা কমলা!

ওই—ওই—ধর্—ধর্—পড়িল বালিকা!
ধবলতুষারচ্যুতা পড়িল বিহ্বল!—
খসিল পাদপ হোতে কুসুমকলিকা!
খসিল আকাশ হোতে তারকা উজ্জ্বল!

প্রশান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
ধরিল বুকের পরে কমলাবালায়!

উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া!
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায়!

কমলার দেহ বহে সলিল-উচ্ছ্বাস!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
ফুরাইল কমলার দুখের নিঃশ্বাস,
জুড়াইল কমলার তাপিত পরাণ!

কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন!
কমলার—প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন!

শৈশব সঙ্গীত

শৈশব সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

উপহার

এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার—বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

গ্রন্থকার

ফুলবালা

গাথা

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।
যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া অফুট গান;
থাকিয়া থাকিয়া, বিজনে পাপিয়া
কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।
পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
কুসুমে কুসুমে শিশির দুলে,
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে,
মুকুতা গুলিন সাজায়ে ফুলে।
তটের চরণে তটিনী ছুটিছে,
ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস,
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভি শ্বাস।
কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল,
শিহরি উঠিছে দিকের বালা,
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা যত চাঁদের মালা।
ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি।
সুধীরে আঁধার ঘোমটা হইতে
কুসুমের থোলো হাসে মুচুকি।
এস কল্পনে! এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পুরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।
হাসি কহে বালা "ফুলের জগতে
যাইবে আজিকে কবি?
দেখিবে কত কি অভূত ঘটনা,
কত কি অভূত ছবি!
চারিদিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
উড়িছে মধুপ-কুল।
ফুল দলে দলে ভ্রমি ফুল-বালা
ফুঁ দিয়া ফুটায় ফুল।

দেখিবে কেমনে শিশির সলিলে
মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুম রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ফুলে ফুলে করে খেলা।
দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে,
প্রজাপতি-'পরে চড়ি,
কমল-কাননে কুসুম-কামিনী
ধীরে ধীরে যায় উড়ি।
কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
দুলিছে লহরী ভরে,
হাসি মুখখানি দেখিছে নীরবে
সরসী আরসি 'পরে।
ফুল কোল হতে পাপড়ি খসায়ে
সলিলে ভাসায়ে দিয়া,
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া।
কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
গাহিবারে কহে গান।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
ফুলমধু করে দান।
দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
কামিনী পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল
পাপড়ি পড়য়ে খসি।
দুই ফুলবালা মিলি বা কোথায়
গলা ধরাধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
প্রজাপতি ধরি ধরি।
কুসুমের 'পরে দেখিয়া ভ্রমরে
আবরি পাতার দ্বার
ফুল ফাঁদে ফেলি পাথায় মাথায়
কুসুম রেণুর ভার।
ফাঁফরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
বাহির হইতে চায়.
কুসুম রমণী হাসিয়া অমনি
ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।
ডাকিয়া আনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
'কেমন পরাগচোর!'"
এত বলি ধীরে কলপনা রাণী
বীণায় আভানি তান

বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া
অবশ করিয়া প্রাণ!
গভীর নিশীথে সুদূরে আকাশে
মিশিল বীণার রব,
ঘুমঘোরে আঁখি মুদিয়া রহিল
দিকের বালিকা সব।
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল,
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগ বালা,
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জোছনা মাখানো জলদ মালা।
একি একি ওগো কলপনা সখি!
কোথায় আনিলে মোরে!
ফুলের পৃথিবী—ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুমঘোরে?
হাসি কলপনা কহিল শোভনা
"মোর সাথে এস কবি!
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা
কত কি অদ্ভুত ছবি!
ওই দেখ ওই ফুলবালাগুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
শাদা শাদা ছোট পাখাগুলি তুলি
এ ফুলে ও ফুলে উড়িয়া যায়!
এ ফুলে লুকায় ও ফুলে লুকায়
এ ফুলে ও ফুলে মারিছে উঁকি,
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়
ফুল টলমল পড়িছে ঝুঁকি।
ওই হোথা ওই ফুল-শিশু সাথে
বসি ফুলবালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপিচুপি হৃদয় খুলে।"
কহিল হাসিয়া কলপনা বালা
দেখায়ে কত কি ছবি;
"ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখন কবি?"
এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
বসিনু চাঁপার তলে,
সুমুখে মোদের কমল কানন
নাচে সরসীর জলে।
এ কি কলপনা, এ কি লো তরুণী
দুরন্ত কুসুম-শিশু,
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
হানিছে ফুলের ইষু।

চারিদিক হতে ছুটিয়া আসিয়া
হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারিধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
যতেক কুসুম-রাণী!
গোলাপ মালতী, শিউলি সেঁউতি
পারিজাত নরগেশ,
সব ফুলবাস মিলি এক ঠাঁই
ভরিল কানন দেশ।
চুপি চুপি আসি কোন ফুল-শিশু
ঘা মারে বীণার 'পরে,
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তার
চমকি পলায় ডরে।
অমনি হাসিয়া কলপনা সখী
বীণাটি লইয়া করে,
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুল মৃদুল
বাজায় মধুর স্বরে।
অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
শোভনার মুখপানে।
ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
হাতখানি দিয়া গালে,
ফুলে বসি বসি ফুল-শিশুগণ
দুলিতেছে তালে তালে।
হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
কহিল তাদের কানে—
"এখনো রয়েছে বাকী কত কাজ
বসে আছ এইখানে?
রঙ্গ দিতে হবে কুসুমের দলে
ফুটাতে হইবে কুঁড়ি
মধুহীন কত গোলাপ কলিকা
রয়েছে কানন জুড়ি!"
অমনি যেন রে চেতন পাইয়া
যতেক কুসুম-বালা
পাখাটি নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া
পশিল কুসুম-শালা।
মুখ ভারী করি ফুল-শিশুদল,
তুলিকা লইয়া হাতে,
মাখাইয়া দিল কত কি বরন
কুসুমের পাতে পাতে।
চারি দিকে দিকে ফুল-শিশুদল
ফুলের বালিকা কত

নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া
সবাই কাজেতে রত।
চারিদিক এবে হইল বিজন,
কানন নীরব ছবি,
ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
কহে কলপনা দেবী।

—

আজি পূর্ণিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু-হাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কলকল স্বরে,
অলি ছুটাছুটি করে
গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীর-প্রাণ
গাহিয়া উঠিছে গান,
তটিনী ধরেছে তান,
ডাকি উঠে পাপিয়া।
সুখের স্বপন মত
পশিছে সে গান যত—
ঘুমঘোরে জ্ঞান-হত
দিক্-বধূ শ্রবণে—
সমীর সভয় হিয়া
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতা-বধূ-ভবনে!
কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপরাজি
এক ঠাঁই কাননে!
ফুলের বিছানা পাতি
হরষে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখ-রাতি
নৃত্য-গীত-বাদনে!

ফুল-বাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া

নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী,
চুলগুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে
ফুল-রেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী।
ফুল-বাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুল-শিশু বসি ফুল-আসনে।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে।
কোন ফুল-রমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুল-বালকের কানে কথা যায় বলিয়ে,
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে!
কোন ফুল-বালিকা
গাঁথি ফুল-মালিকা
ফুল-বালকের কথা একমনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে,
হরষিত মরমে,
আনত আননে বালা ফুলদল গুণিছে!

দেখেছ হোথায় অশোক বালক
মালতীর পাশে গিয়া,
কহিছে কত কি মরম-কাহিনী
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া।
ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমল-হৃদয় দলি।
অধীর অশোক যদি বা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে।
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সেগুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোক-প্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,

মলিন অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে বহিয়া ব্যথা।
দেখ দেখি চেয়ে মালতীহৃদয়ে
কাহারে সে ভালবাসে!
বল দেখি মোরে হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরই নাম লিখা!
অশোকেরি তরে জ্বলিছে তাহার
প্রণয়-অনল-শিখা!
এই যে নিদয়-চাতুরী সতত
দলিছে অশোক-প্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতী-হৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ।
মনে মনে করে কত বার বালা,
অশোকের কাছে গিয়া—
কহিবে তাহারে মরম-কাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া।
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধোরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা
পরাণ ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া—
কহিবে মনের ব্যথা।
তবুও কি যেন আটকে চরণ
সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারে না
মনো-কথা ফুল-রাণী।
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে—
প্রকাশ পায় যে আর,
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
এমন জ্বালা সে তার!
মলিন অশোক ম্রিয়মাণ মুখে
একেলা রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হৃদয়ে হৃদয়-ব্যথা।
দেখে নি কিছুই, শোনে নি কিছুই
কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি, বহি আপনার
হৃদয়ে বিঁধানো বাণ।
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
সব সে গিয়েছে ভুলি,
নাহি রে আপনি—নাহি রে হৃদয়
রয়েছে ভাবনাগুলি।

ফুল-বালা এক, দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে,
কেন গো অশোক—মলিন হইয়া
ভাবিছ বসিয়া কারে?
এত বলি তার ধরি হাতখানি
আনিল সভার 'পরে—
"গাও না অশোক—গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুলবালা-দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্ রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

বিষাদের গান কেন গো আজিকে?
আজিকে প্রমোদ-রাতি!
হরষের গান গাও গো অশোক
হরষে প্রমোদে মাতি!
সবাই কহিল "গাও গো অশোক
গাও গো প্রমোদ-গান
নাচিয়া উঠুক কুসুম-কানন
নাচিয়া উঠুক প্রাণ!"
কহিল অশোক "হরষের গান
গাহিতে বোলো না আর—

কেমনে গাহিব? হৃদয়-বীণায়
বাজিছে বিষাদ তার।”
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির 'পরে—
কে কোথায় সব, গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা ভরে!
কিছু দিন আগে—কি ছিল অশোক!
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর পারা!
নবীন-যুবক, শোহন-গঠন,
সবাই বাসিত ভালো—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেখান করিত আলো!
কিছু দিন হ'তে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর।
একলাটি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণ ভার!
অরুণ-কিরণ হইতে এখন
বরন বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তুলিটি ধরি:
পূরণিমা-রেতে জোছনা হইতে
অমিয় করিয়া চুরি
মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
কুসুম পাতায় পূরি!

ক্রমশ নিভিল চাঁদের জোছনা
নিভিল জোনাক-পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
আলোকে মিশাল রাতি!
প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া
ফুটিল প্রভাত-কুসুম-কলি—
প্রভাত শিশিরে নাহিবে বলিয়া
চলে ফুল-বালা পথ উজলি।
তার পর-দিন রটিল প্রবাদ
অশোক নাইক ঘরে
কোথায় অবোধ কুসুম-বালক
গিয়েছে বিষাদ-ভরে!
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—

কি হবে—কোথাও নাহিক অশোক
কোথায় বালক গেল রে চলি!

কহে কলপনা "খুঁজি চল গিয়া
অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুম-কানন
দেখ দেখি কবি হোথা!
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
ফুটেছে ম্যাগ্নোলিয়া—
কাননের যেন চোখের সামনে
রূপরাশি খুলি দিয়া!
সাধাসাধি করে কত শত ফুল
চারি দিকে হেথা হোথা—
মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা!
হ্যাদে দেখ কবি সরসী ভিতরে
কমল কেমন ফুটেছে!
এ পাশে ও পাশে পড়িছে হেলিয়া-
প্রভাত সমীর উঠেছে!
ঘোমটা ভিতরে লোহিত অধরে
বিমল কোমল হাসি
সরসী-আলয় মধুর করেছে
সৌরভ রাশি রাশি!
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভালো!
কানন বিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে,
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী
সখীদের কানে কানে।
হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী 'পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে,
মরম-সরম-ভরে।
দূর হতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর যদিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
স'রে যায় এক পাশে!
গুন গুন করি যদিবা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—

কাঁপে থর থর, না দেয় উত্তর,
হেঁট করি থাকে মাথা!
ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা!”

চমকিয়া কহে কল্পনা বালা—
দেখিয়া কাননছবি
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি!
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,
মাথার উপরে আটকে তপন
প্রজাপতি পাখা মেলি!
এস দেখি কবি ওইখানটিতে
দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি, মালতী-বালারে
ভ্রমর কি কথা বলে।
কহিছে ভ্রমর “কুসুম-কুমারি—
বকুল পাঠালে মোরে,
তাই ত্বরা ক'রে এসেছি হেথায়
বারতা শুনাতে তোরে!
অশোক বালক কি যে হ'য়ে গেছে
সে কথা বলিব কারে!
তোর মত হেন মোহিনী বালারে
ভুলিতে কি কভু পারে?
তবু তারে আহা উপেখিয়া তুই
র'বি কি হেথায় বোন?
পরাণ সঁপিয়া অশোক তবু কি
পাবে নাকো তোর মন?
মনের হুতাশে আশারে পুড়ায়ে
উদাস হইয়া গেছে,
কাননে কাননে খুঁজিয়া বেড়াই
কে জানে কোথায় আছে!”
চমকি উঠিল মালতী-বালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
“চলিয়া গিয়াছে অশোক কুমার?”
কহিল ক্ষণেক পর,

"চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর?
তবে আর আমি—বিষাদ কাননে
থাকিব কিসের আশে?
যাইব অশোক গিয়েছে যেখানে
যাইব তাহার পাশে!
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
অশোক কোথায় আছে!
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—
আমা হ'তে তবু হবে না কখনো
প্রণয়ের অপমান!"

ছাড়ি নিজ বন চলিল মালতী,
চলিল আপন মনে,
অশোক বালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে বনে।
"অশোক" "অশোক" ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে,
ভ্রমরে শুধায়, ফুলেরে শুধায়
"অশোক এখানে কি রে?"
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি!
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুল-বালাগুলি!
এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে,
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিতে যদি সে পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেনগুলি ধরি ধরি
ফুল-শিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি করি!
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—

হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে!
ওগো ফুলশিশু! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোক বালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে?
এখানেও নাই, এস তবে কবি
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—
ওই যে ওখানে গোলাপ ফুটিয়া
হোথায় রয়েছে—এ কি?
এ কে গো ঘুমায়—হেথায়—হেথায়—
মুদিয়া দুইটি আঁখি,
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় দেহটি রাখি!
এই আমাদের অশোক বালক
ঘুমায়ে রয়েছে হেথা!
দুখিনী ব্যাকুলা মালতী-বালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা?
চল চল কবি চল দুই জনে
মালতীরে ডেকে আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুম-রাণী!

কোথাও তাহারে পেনু না খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে?
অশোক বালক না যায় কোথাও
বুঝায়ে রাখিতে হবে!
গোলাপ-শয়নে ঘুমায় অশোক
দুখ তাপ সব ভুলি,
চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি!
দেখ দেখ কবি—অশোক-শিয়রে
ওই না মালতী হোথা?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা।
কত যে বেড়ানু খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি!
কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা?
রয়েছে হোথায় বসি!
ঘুমায়ে রয়েছে অশোক বালক
শ্রমেতে কাতর হয়ে,

মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লয়ে!
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোক বালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা
দুখানি নয়ন ভরি,
নয়ন হইতে শিশিরের মত
সলিল পড়িছে ঝরি!
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি!
"মালতী" "মালতী" বলিয়া বালার
হাতটি ধরিল চাপি!
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা—
"অশোক—অশোক—মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা।"
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
"এই যে রয়েছে হেথা!"
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা!
একি রে স্বপন? এখনো একি রে
স্বপন দেখিছে নাকি?
আবার চাহিল অশোক বালক
আবার মাজিল আঁখি!
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
বচন নাহিক সরে—
থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মত
কহিল অধীর স্বরে!
"মালতী—মালতী—আমার মালতী!"
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী—তোমারি মালতী!"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি!
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার—
কত না দিয়েছি জ্বালা—
ভালবাসি ব'লে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা!
তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,
দিবস রজনী রহিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি!

ও হৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা!
কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা!
উড়িল দুজনে পাশাপাশি হয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি!
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর,
নিঝর বহিল হাসি—
দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভি-রাশি!
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান।
অশোক মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাথায় বরন,
মধু দেয় ঢালি ঢালি!

বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী!
জোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—
টলমল ফুলদলে,
ধরি ধরি গলে দলে,
নাচে ফুলবালা দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীতধারা বরষে।

গান

দেখে যা—দেখে যা—দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—

(হেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান,
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে-
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম-ঘোর!

অতীত ও ভবিষ্যৎ

কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীরখানি,
সমুখে নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া,
সামনে বকুল গাছগুলি।
সারাদিন হু হু করি বহিছে নদীর বায়ু,
ঝর ঝর দুলে গাছপালা,
ভাঙাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
ওদিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দু-চারিটি গাভী
চিবায় নবীন তৃণদল,
কেহবা গাছের ছায়ে, কেহবা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।
জান ত কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলেবেলা
সেইখানে করেছি যাপন,
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হুহু ক'রে ওঠে যেন মন।
নিশীথে নদীর 'পরে ঘুমিয়েছে ছায়া চাঁদ,
সাড়াশব্দ নাই চারি পাশে,
একটি দুরন্ত ঢেউ জাগে নি নদীর কোলে,
পাতাটিও নড়ে নি বাতাসে,
তখন যেমন ধীরে দূর হ'তে দূর প্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান,

ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন,
উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ!
কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি, স্বপন বেশে পরাণের কাছে এসে
আধ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান,
আঁধার মরম মাঝে জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি,
কেঁদে ওঠে আকুল পরাণ!
হা দেবি, তেমনি যদি থাকিতাম চিরকাল!
না ফুরাত সেই ছেলেবেলা,
হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থল থল,
মরমেতে তরঙ্গের খেলা!
ঘুম-ভাঙ্গা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল উষা
ফেলে ধীরে সুরভি নিশ্বাস,
ঢেউগুলি জেগে ওঠে পুলিনের কানে কানে
কহে তার মরমের আশ।
তেমনি উঠিত হৃদে প্রশান্ত সুখের উর্ম্মি
অতি মৃদু, অতি সুশীতল,
বহিত সুখের শ্বাস, নাহিয়া শিশির-জলে
ফেলে যথা কুসুম সকল।
অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্ন কালে
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার শ্রান্ত বালকের মত
প'ড়ে থাকে সুনীল সলিলে।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকে না পাখী,
একটুও বহে না বাতাস,
তেমনি কেমন এক গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদয়ে তুলিত দীর্ঘশ্বাস।
এইরূপ কত কি যে হৃদয়ের ঢেউ খেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া,
মরমের ঘুমঘোরে কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া খুসিয়া।
বনের পাখীর মত অনন্ত আকাশ তলে
গাহিতাম অরণ্যের গান,
আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান।
প্রভাত এখনো আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা,
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে এ কি রে কুয়াশা!

যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!
সেদিকে ফিরায়ে আঁখি এখনো দেখিতে পাই
ছায়া ছায়া কাননের রেখা,
নানা বরণের মেঘ মিশেছে বনের শিরে
এখনো বুঝি রে যায় দেখা!
যেতেছি যেখানে ভাসি সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি
যত দিনে ডুবিয়া না যায়,
সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুত-শিখায়!

দিক্‌বালা

দূর আকাশের পথ উঠিছে জলদ রথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
অস্ফুট চিত্রের মত নদ নদী পরবত,
পৃথিবীর পটে যেন রয়েছে চিত্রিত!
সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরাধরি করি দিক্‌-বালাগণ
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে ছবির মতন।
কেহ বা জলদময় মাথায়ে জোছনা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।
সাগর তরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।
কোন কোন দিক্‌বালা বসি কুতূহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।
আঁকিল জলদ-মালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর, দিয়া জোছনার ধারা।
পাপিয়ার ধ্বনি শুনি কেহ হাসি মুখে
প্রতিধ্বনি রমণীরে জাগায় কৌতুকে!

শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল,
পূরবের দিক্‌দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিত কমল করে পূরবের দ্বার
খুলিয়া—সিন্দুর দিল সীমন্তে উষার।
মাজি দিয়া উদয়ের কনক সোপান,
তপনের সারথিরে করিল আহ্বান।
সাগর-উর্ম্মির শিরে সোনার চরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেচে গেল দিক্‌-বালাগণ।
পূরব দিগন্ত কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হ'তে আঁধার মুছায়ে,
বিমল শিশির জলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনক কিরণ,
সোনার মেঘের মত আকাশের তলে,
কনক কমল সম মানসের জলে,
ভাসিতে লাগিল যত দিক্‌-বালাগণে,
উলসিত তনুখানি প্রভাত পবনে।
ওই হিম-গিরি 'পরে কোন দিক্‌-বালা
রঞ্জিছে কনক-করে নীহারিকা-মালা!
নিভৃতে সরসী-জলে করিতেছে স্নান,
ভাসিছে কমলবনে কমল বয়ান।
তীরে উঠি মালা গাঁথি শিশিরের জলে
পরিছে তুষার-শুভ্র সুকুমার গলে।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা প্রান্তরে,
মধ্যে দিক্‌ দেবী শুভ্র বালুকার 'পরে।
অঙ্গ হতে ছুটিতেছে জ্বলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি,
আঁকিছে দিগন্ত-পটে মরীচিকা-ছবি।
অন্য দিকে কাশ্মীরের উপত্যকা-তলে,
পরি শত বরণের ফুল মালা গলে,
শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে,
সরসী লহরী মালা গুনিতে গুনিতে,
এলায়ে কোমল তনু কমল কাননে,
আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।
ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়েছে এবে শীত-সমীরণ,
বসন্ত পৃথিবী তলে অর্পিবে চরণ।
পাখীরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান,
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান,
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্‌-দেবীগণে।

বহিল মলয়-বায়ু কাননে ফিরিয়া,
পাখীরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুল-বালা সাথে আসি বন-দেবীগণ,
ধীরে দিক্‌-দেবীদের বন্দিল চরণ।

প্রতিশোধ

গাথা

গভীর রজনী, নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে
বিজন আলয়ে আঁধার হৃদয়ে,
বালক দাঁড়ায়ে আছে।
বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়!
পড়েছে দীপের অফুট আলোক
আঁধার মুখের 'পরে,
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক,
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে।
দেখিছে পিতার অসাড় অধরে
যেন অভিশাপ লিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
রোষের অনল শিখা—
ঘুম হ'তে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া,
সুধীর গভীর স্বর—
"শোনো বৎস শোনো, অধিক কি কব,
আসিছে মরণবেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবে অবহেলা।"
এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
ছুরিকা হৃদয় হতে,
ঝলকে ঝলকে উছসি অমনি
শোণিত বহিল স্রোতে।
কহিল—"এই নে, এই নে ছুরিকা—
তাহার উরস-'পরে
যত দিন ইহা ঠাঁই নাহি পায়,
থাকে যেন তোর করে!

হা হা ক্ষত্রদেব, কি পাপ করেছি—
এ তাপ সহিতে হ'ল,
ঘুমাতে ঘুমাতে, বিছানায় পড়ি,
জীবন ফুরায়ে এল।”
নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুন,
কথা হয়ে গেল রোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
“প্রতিশোধ প্রতিশোধ!”
পিতার চরণ পরশ করিয়া,
ছুঁইয়া কৃপাণখানি,
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল শপথ বাণী!
“ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু;
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু!
সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।”
রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ,
মুদিয়া পড়িল আঁখি।

ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথ ভার।
দেশে দেশে ভ্রমি তবুও ত আজি
পেলে না সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে,
এখনো পিতার শেষ কথাগুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
“কোথা যাও যুবা! যেও না যেও না,
গহন কানন ঘোর,
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী,
এস গো কুটীরে মোর!”
“ক্ষম গো আমায়, কুটীর-স্বামী!
বিরাম আলয় চাহি না আমি,
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়,
সে কাজ পালিব আগে”—

"শুন গো পথিক, যেও নাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার!
দেখেছ চাহিয়া, ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগন ভাগে।"
কত না ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীক হিয়া।
চলেছে—গহন গিরি নদী মরু
কোন বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথ-বাণী!
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুন গো কুটীরস্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মত
এসেছি অতিথি আমি।"
অতি ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।
এলোমেলো চুলে বনফুল মালা,
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কোমল সরল হাস।
বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
কুশের আসন পরি—
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন-কুটীরে
পথিক করিছে বাস?
কি কর যুবক, ছাড় এ কুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়,
সে কাজ যেও না ভুলি!
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,
যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়-পাশ!
শোণিতে লিখিত শপথ আখর
মন হতে গেল মুছি।

ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেন রে গেল না ঘুচি!

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজিকে বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে!
মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত,
গাহিছে নাচিছে হরষে সকলে,
যুবক রমণী শত।
কেহ বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুর পাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন,
অধরে সুখের হাস।
আইল কুমার বিবাহ-সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।
ও কি ও—ও কি ও—সহসা প্রতাপ
বসনে নয়ন চাপি,
মুরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর থর কাঁপি।
মালতীবালিকা পড়িল সহসা
মুরছি কাতর রবে!
বিবাহ সভায় ছিল যারা যারা
ভয়ে পলাইল সবে।
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত জ্বলে দু-নয়ন
শোণিতে মাখানো কায়া—
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হ'ল কথা রোধ,
জলদ-গভীর-স্বরে কে কহিল
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—
হা রে কুলাঙ্গার অক্ষত্র সন্তান,
এই কি রে তোর কাজ?

শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
বিবাহ করিলি আজ!
ক্ষত্রধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন—
ওরে কুলাঙ্গার, তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে!
নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এ মোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহ ধ্বনিল আবার
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—
বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি,
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।
অধীর হৃদয় পাগলের মত,
থর থর কাঁপে পাণি—
কত বার ছুরি ধরিল সে বুকে
কত বার নিল টানি।
মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।"
ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ,
মালতী উঠিল জাগি,
চারিদিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এসব কিসের লাগি।
কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে,
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।
"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী,
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।
চাহি চারিদিকে—দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হ'তে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিছে শোণিত-স্রোতে।
কহিলেন পিতা—অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবি অবহেলা।

হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে
সে অবধি এই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে।
করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
না হবে অন্যথা কভু।
নাম কি তাহার জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম—"
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
"প্রতাপ তাহার নাম!
এখনি এখনি ওই ছুরি তব
বসাইয়া দেও বুকে,
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
কব তাহা এক মুখে?
নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল!"
কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা ব'লো না—ব'লো না গো পিতা,
যেও না ছাড়িয়ে মোরে!
কুমার—কুমার—শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি!
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধিয়া,
এই পেতে দিনু হৃদি!"
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে,
ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে!
অতি নিদারুণ অনুতাপ শিখা
দহিছে যে হৃদি-তল,
সে হৃদয় মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বল গো কি হবে ফল?
অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা!
রাখ এই অনুরোধ!"

নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার,
প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!
হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইল বলে।
মালতী বালিকা মূর্চ্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে।
উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বন্ধ করি হস্ত মুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি,
এখনো কুমার, সেই বন মাঝে,
পাগল হইয়া ভ্রমে।
মালতী বালার চির মূর্চ্ছা আর
ঘুচিল না এ জনমে।

ছিন্ন লতিকা

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা সখি অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা।
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা?

কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলঢল মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন-অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা?

ভারতী-বন্দনা

আজিকে তোমার মানব সরসে
কি শোভা হয়েছে, মা!
অরুণ বরণ চরণ পরশে
কমল কানন, হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে, মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল করে টলমল,
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ, মিলিয়ে রাগিণী,
আকাশ হইতে করে গীত ধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হয়েছে অবশ প্রায়।
শুনিয়ে সে গীত হয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি,
পাখীরা গিয়েছে গাইতে ভুলিয়া,
সরসীর বুক উঠিছে ফুলিয়া,
ক্রমশঃ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তান-লয় ধীরি ধীরি;
তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীত-ধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতী ফুলের পরিমল সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা,
সুকুমার করে মৃণালের বালা,
লীলা-শতদল ধরি,
ফুল-ছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি উঠে গীতধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি।
দশ দিশি ছুটে ফুল-পরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নব দিবাকর ম্লান সুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,
জলদ আসনে দেববালাগণ
মোহিত বীণার তানে।

আজিকে তোমার মানস-সরসে
কি শোভা হয়েছে মা!
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে মা!
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি,
সুহাস কমল-নয়ন দুটি,
উঠেছে উজলি সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া, উঠিছে গাহিয়া,
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি!
এস মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি!
বহুদিন পরে ভারত অধরে
সুখময় হাসি উঠুক ফুটি!
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক ফুটিয়া
ভকতি-কমল-রাশি!
নমিয়া ভারতী-জননী-চরণে
সঁপিয়া ভকতি-কুসুম-মালা
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক দিকের বালা!
চরণ-কমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক!
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়ে কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক!

লীলা

গাথা

"সাধিনু—কাঁদিনু—কত না করিনু-
ধন মান যশ সকলি ধরিনু—
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার!

না যদি পেলেম— নাইবা পাইনু—
চাই না চাই না তারে!
কি ছার সে বালা! তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষ-হৃদি,
তা হ'লে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে!
এ কুমতি কেন হয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু হৃদি!
এ নয়ন-জল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ-তলে?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহক বলে?
এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকাহৃদয় করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা;
তার গলে দিবে পরিণয় মালা!
এ কি লাজ নিদারুণ!
হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষ্যার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষ্যা? কারে ঈর্ষ্যা? হীন রণধীরে?
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হ'ল কি রে
ঈর্ষ্যা-যোগ্য সে কি মোর?
তবে শুন আজি— শ্মশান-কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর!
আজ হ'তে মোর রণধীর অরি—
শত নৃ-কপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,
এ বিবাহ কভু দিব না ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ!
তবে নমি তোমা-শ্মশান-কালিকা!
শোণিত-লুলিতা—কপাল-মালিকা!
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় পিপাসা
যেন মোর এ কৃপাণ!"
কহিতে কহিতে বিজন-নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূরে হইতে
শত শত অট্ট হাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান-শান্তিরে নাশি!
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি!

কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি!
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি!
সহসা থামিল অট্ট হাসি ধ্বনি,
শিবার রোদন থামিল অমনি,
আবার ভীষণ সুগভীরতর
নীরব হইল নিশি!
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ—
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খরধার!

গিরি-অধিপতি রণধীর গৃহে
লীলা আসিতেছে আজি,
গিরিবাসীগণ হরষে মেতেছে,
বাজনা উঠেছে বাজি।
অস্তে গেল রবি পশ্চিম শিখরে,
আইল গোধূলি কাল,
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
সঘন আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি-ভবন পানে—
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে।
জ্বলিছে আলোক—বাজিছে বাজনা,
ধ্বনিতেছে দশ দিশি।
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়,
বন মাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত—
হে হরষধ্বনি—জন কোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।
থামিল শিবিকা, পথের মাঝারে
থামে অনুচর দল

সহসা সভয়ে "দস্যু দস্যু" বলি
উঠিল রে কোলাহল।
শত বীর-হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি,
শত শত শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।
আঁধার ক্রমশঃ নিবিড় হইল
বাধিল বিষম রণ,
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ।

কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখি জল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী—শুন এ মিনতি
বিপদে ডাকিব কারে!
পতি ব'লে যাঁরে করেছি বরণ
বাঁচাও বাঁচাও তাঁরে!
মোর তরে কেন এ শোণিত-পাত!
আমি মা—অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
ঘুচিত সকল জ্বালা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি—
জয় জয় রব, আহতের স্বর
কৃপাণের ঝনঝনি!
সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
আকাশে উঠিল তারা;
একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হতেছে সারা!
সহসা খুলিল কারাগার দ্বার—
বালিকা সভয় অতি—
কঠোর কটাক্ষ হানিতে হানিতে
বিজয় পশিল তথি।
অসি হতে ঝরে শোণিতের ফোঁটা,
শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
ফুটে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা—বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে—

"সমর-বারতা শুনেছ কুমারী?
সে কথা শুনিবে তবে?"
"বুঝেছি—বুঝেছি, জেনেছি—জেনেছি!
বলিতে হবে না আর—
না—না, বল বল—শুনিব সকলি
যাহা আছে শুনিবার।
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
বল কি বলিতে আছে!
যত ভয়ানক হোক না সে কথা
লুকায়ো না মোর কাছে!"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
তুলি অসি খরধার—
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার!"
"পামর, নিদয়—পাষাণ, পিশাচ!"
মুরছি পড়িল লীলা,
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
কারা হতে বাহিরিলা।

সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশঃ,
নিশা হল সুগভীর।
বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হল রণধীর।
কারাগার-মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—
"লীলা!—রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের 'পরে!"
ভূমিতল হতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ-আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বস একবার হেথা,
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহভরে,
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের 'পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো
বহিছে শোণিত ধারা—

রহে রণধীর পলক-বিহীন
যেন পাগলের পারা।
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
"পুরিল না কোন আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা!
পারিনু না সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা!
হা রে হা পামর, কি করিলি তুই?
নিদারুণ প্রতারণা!
এত দিনকার সুখ সাধ মোর
পুরিল না পুরিল না!"
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি—
রণধীর-মুখে রহিল চাহিয়া
মেলি অনিমেষ আঁখি!
রণধীর যবে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা,
বীরের নয়নে জ্বলিয়া উঠিল
রোষের অনল-কণা।
"পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই!"
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
শোকে রোষানলে জ্বলি রণধীর
রণভূমে এল ছুটি।
দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে!

ফুলের ধ্যান

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা,
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,

এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী!
দেখিতেছি শুধু উষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয়-'পরি!
তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।
আকাশে যখন শতেক তারা
রবির কিরণে হইবে হারা,
ধরায় ঝরিয়া শিশির-ধারা
ফুটিবে তারার মত,
ফুটিবে কুসুম শত,
ফুটিবে দিবার আঁখি,
ফুটিবে পাখীর গান,
তখন আমারে চুমিবে তপন,
তখন আমার ভাঙিবে স্বপন,
তখন ভাঙিবে ধ্যান।
তখন সুধীরে খুলিব নয়ান,
তখন সুধীরে তুলিব বয়ান,
পূরব আকাশে চাহিয়া চাহিয়া
কথা কব ভাঙা ভাঙা।
উষা-রূপসীর কপোলের চেয়ে
কপোল হইবে রাঙা।
তখন আসিবে বায়,
ফিরিতে হবে না তায়,
হৃদয় ঢালিয়া দিব বিলাইয়া,
যত পরিমল চায়।
ভ্রমর আসিবে দ্বারে,
কাঁদিতে হবে না তারে,
পাশে বসাইয়া আশা পূরাইয়া
মধু দিব ভারে ভারে।
আজিকে ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি—
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

অপ্সরা-প্রেম

গাথা

নায়িকার উক্তি

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ ছিল হ'ল পূর্ণিমা,
প্রতি নিশি নিশি বাড়িল চাঁদিমা,
প্রতি নিশি নিশি ক্ষীণ হয়ে এল
ফুরালো জোছনা ভাতি।
উদিছে তপন উদয় শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধরে
ধীর পদক্ষেপে অবসন্ন দেহে
যেতেছে চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ অতি।
উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী।
এস গো সখা এস গো—
কত দিন ধরে বাতায়ন পাশে
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
এস গো সখা এস গো!—
সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গণিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন।
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদু বায়ু ভরে,
সারা দিন যায়—সারা রাত যায়
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলক-হীন।
বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামিনী,
পাগলের মত হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়,
অবিশ্রাম সারারাতি।

বহিতেছে বায়ু পাদপের পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,
ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনী-লহরী
তটিনী উঠিছে মাতি।
কোথায় গো সখা কোথা গো!
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে
রয়েছি বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই,
কোথায় গো সখা কোথা গো!
যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয় আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
কাঁদিয়া হাসিয়া মুছিছে নয়ন
কোন জ্বালা নাহি জানে!
আমিই কেবল একা আছি প'ড়ে
পরিশ্রান্ত অতি— আশা ক'রে ক'রে—
নিরাশ পরাণ আর ত রহে না,
আর ত পারি না, আর ত সহে না,
আর ত সহে না প্রাণে।
এস গো সখা এস গো!
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই,
এস গো সখা এস গো!—
আসে সন্ধ্যা হয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
যে যাহার ঘরে আসিতেছে ফিরে,
জ্বলিছে প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে
আঁধার প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে-
আকাশে উঠিছে শশী।
কত দিন আর রহিব এমন,
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন!
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
যেতেছে দিবস নিশি!
কোথায় গো সখা কোথা গো!
কত দিন ধরে সখা তব আশে,
একেলা বসিয়া বাতায়ন পাশে,

দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
কোথায় গো সখা কোথা গো!—

অপ্সরার উক্তি

অদিতি-ভবন হইতে যখন
আসিতেছিলাম অলকা-পুরে—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন—
শারদ তটিনী বহিছে দূরে।
সাঁঝের কনক-বরণ সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরী-শিখর গিরির কাছে।
দেখিনু সহসা বীর একজন
সমর-সাগরে গিরির মতন,
পদতলে আসি আঘাতে লহরী
তবুও অটল পারা।
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই—
উরস বরষে বরষার মত
বরিষে বাণের ধারা।
অশনি-ধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি,
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙিছে,
তিনি সে মহান্ অতি;
এমন উদার শান্ত ভাব বুঝি
দেখি নি তাঁহারো কভু।
পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জন পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারী-হৃদয়ের
তাঁহারে করিনু প্রভু।
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার।
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিল
আকুল হৃদয় মোর।
থামিল সমর জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী-'পরে,

বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরব ভরে।
গেল কত দিন—পূরব-গগনে
উঠিল জলদ রেখা।
মুহু ঝলকিয়া ক্ষীণ সৌদামিনী
দূর হ'তে দিল দেখা।
ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ
অশনি সরোষে জ্বলি,
মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি।
সহসা ভ্রূকুটি উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি।
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙে-বিভোলা মহেশের মত
নাচিতে লাগিল যেন।
তরণীর 'পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর।
দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী
ডুবিল নাবিক যত—
যুঝি যুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতন হত।
আকাশ হইতে নামিয়া ছুইনু
অধীর জলধি জল,
পদতলে আসি করিতে লাগিল
উরমিরা কোলাহল।
অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
কেশপাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে লাগিনু
সুধীরে গীতের ধার!

গীত

কেন গো সাগর এমন চপল,
এমন অধীর প্রাণ,
শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান!
পূর্ণিমা-নিশি আসিবে যখন

আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিব গো ধীরে!
যত হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয়-'পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
নাচিবে পুলক ভরে!
তবে থাম গো সাগর থাম গো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ?
আমি লহরী-শিশুরে করিব তোমার
তারার খেলেনা দান।
দিক্‌বালাদের বলিয়া দিব,
আঁকিবে তাহারা বসি
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়
একটি একটি শশী।
তটিনীরে আমি দিব গো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান!
তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ?
যদি উরমি-শিশুরা নীরব-নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,
তবে জানিও সাগর ব'লে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান,
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান!
অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমার বিশাল বুকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে!
যদি কভু হয় খেলাবার সাধ,
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ-আকুল রবে—
সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি

মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবাল মুকুতা-রাশি!
তবে রাখ গো আমার কথা,
তবে শুন গো আমার গান,
তবে থাম গো সাগর, থাম গো
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ?
দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগর-বালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতা-মালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান!
কেহবা হরষে নাচিতেছিল
হরষে পাগল-পারা,
কেশ-পাশ হ'তে ঝরিতেছিল
নিটোল মুকুতা-ধারা!
কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমান ভরে,
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।
এমন সময়ে শতেক উরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
আহা সে বালার কোমল-বুকে!
ওই দেখ দেখ—আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতা রাশি—
ওই দেখ দেখ—হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি,
ওই দেখ দেখ—নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিন মুখে,
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ী-বুকে!
থাম গো সাগর, থাম গো—থাম গো
হোয়ো না অমন পাগলপারা—
আহা, দেখ দেখি সাগর-ললনা
ভয়ে একেবারে হয়েছে সারা!
বিবরণ হয়ে গিয়েছে কপোল
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থর থর করি কাঁপিছে বুক!
আহা, থাম তুমি থাম গো—
হোয়ো না অধীর প্রাণ,
রাখ গো আমার কথা

ওগো শোন গো আমারি গান!
যদি না রাখ আমার কথা,
যদি না থামে প্রমোদ তব,
তবে জানিও সাগর জানিও
আমি সাগর-বালারে কব।
তারা জোছনা-নিশীথে ত্যজিয়া আলয়
সাজিয়া মুকুতা-বেশে
হাসি হাসি আর গাহিবে না গান
তোমার উপরে এসে।
যে রূপ হেরিয়া লহরীরা তব
হইত পাগল মত,
যে গানে মজিয়া কানন ত্যজিয়া
আসিত বায়ুরা যত।
আধখানি তনু সলিলে লুকান,
সুনিবিড় কেশ রাশি
লহরীর সাথে নাচিয়া নাচিয়া
সলিলে পড়িত আসি,
অধীর উরমি মুখ চুমিবারে
যতন করিত কত,
নিরাশ হইয়া পড়িত ঢলিয়া
মরমে মিশায়ে যেত।
সে বালারা আর আসিবে না,
সে মধুর হাসি হাসিবে না,
জোছনায় মিশি সে রূপের ছায়া
সলিলে তোমার ভাসিবে না,
তবে থাম গো সাগর থাম গো
কেন হয়েছ অধীর প্রাণ,
তুমি রাখ এ আমার কথা
তুমি শোন এ আমার গান।

দেখিতে দেখিতে শতেক উরমি
সাগর উরসে ঘুমায়ে এল,
দেখিতে দেখিতে মেঘেরা মিলিয়া
সুদূর শিখরে খেলাতে গেল।
যে মহা পবন সাগর-হৃদয়ে
প্রলয় খেলায় আছিল রত,
অতি ধীরে ধীরে কপোল আমার
চুমিতে লাগিল প্রণয়ী-মত।
গীত-রব মোর দ্বীপের কাননে
বহিয়া লইয়া গেল সে ধীরে
"কে গায়" বলিয়া কানন-বালারা

থামিতে কহিল পাপিয়াটিরে।
বীরেরে তখন লইয়া এলাম
অমর দ্বীপের কানন তীরে,
কুসুম শয়নে অচেতন দেহ
যতন করিয়া রাখিনু ধীরে।
চেতন পাইয়া উঠিল জাগিয়া
অবাক্ রহিল চাহি,
পৃথিবীর স্মৃতি ঢাকিয়া ফেলিনু
মায়াময় গীত গাহি।
নূতন জীবন পাইয়া তখন
উঠিল সে বীর ধীরে,
সহসা আমারে দেখিতে পাইল
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে।
নিমেষ হারায়ে চাহিয়া রহিল
অবাক্ নয়ন তার,
দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন
দেখা ফুরায় না আর!
যেন আঁখি তার করিয়াছে পণ
এইরূপ এক ভাবে
নিমেষ না ফেলি চাহিয়া চাহিয়া
পাষাণ হইয়া যাবে।
রূপে রূপে যেন ডুবিয়া গিয়াছে
তাহার হৃদয়-তল,
অবশ আঁখির পলক ফেলিতে
যেন রে নাইক বল!
কাছে গিয়া তার পরশিনু বাহু
চমকি উঠিল হেন—
তিখিনী তিখিনী অশনি সমান
বিঁধেছে যে দেহে শত শত বাণ,
নারীর কোমল পরশটুকুও
তার সহিল না যেন!
কাছে গেলে যেন পারে না সহিতে,
অভিভূত যেন পড়ে সে মহীতে,
রূপের কিরণে মন যেন তার
মুদিয়া ফেলে গো আঁখি,
সাধ যেন তার দেখিতে কেবল
অতিশয় দূরে থাকি!

—

নায়কের উক্তি

কি হল গো, কি হল আমার!
বনে বনে সিন্ধুতীরে, বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
কি যেন হারান' ধন খুঁজি অনিবার!
সহসা ভুলিয়ে যেন গিয়েছি কি কথা!
এই মনে আসে-আসে, আর যেন আসে না সে,
অধীর-হৃদয়ে শেষে ভ্রমি হেথা হোথা।
এ কি হল, এ কি হল ব্যথা!
সম্মুখে অপার সিন্ধু দিবস যামিনী
অবিশ্রাম কলতানে কি কথা বলে কে জানে,
লুকান' আঁধার প্রাণে কি এক কাহিনী।
সাধ যায় ডুব দিই, ভেদি গভীরতা
তল হতে তুলে আনি সে রহস্য কথা।
বায়ু এসে কি যে বলে পারি নে বুঝিতে,
প্রাণ শুধু রহে গো যুঝিতে!
পাপিয়া একাকী কুঞ্জে কাঁপায় আকাশ,
শুনে কেন উঠে রে নিশ্বাস!
ওগো, দেবি, ওগো বনদেবি,
বল মোরে কি হয়েছে মোর!
কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুমঘোর।
এ যে সব লতাপাতা হেরি চারি পাশে
এরা সব জানে যেন তবুও বলে না কেন!
আধখানি বলে, আর দুলে দুলে হাসে!
নিশীথে ঘুমাই যবে, কি যেন স্বপন হেরি,
প্রভাতে আসে না তাহা মনে,
কে পারে গো ছিঁড়ে দিতে এ প্রাণের আবরণ—
কি কথা সে রেখেছে গোপনে।
কি কথা সে!
এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি
কোন্ খানে কিসের হুতাশে!

—

অপ্সরার উক্তি

হল না গো হল না!
প্রেমসাধ বুঝি পুরিল না।
বল সখা বল কি করিব বল,
কি দিলে জুড়াবে হিয়া!
বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়াছি ফুল,
তুলেছি গোলাপ, তুলেছি বকুল,
নিজ হাতে আমি রচেছি শয়ন
কমল কুসুম দিয়া।

কাঁটাগুলি সব ফেলেছি বাছিয়া,
রেণুগুলি ধীরে দিয়েছি মুছিয়া,
ফুলের উপরে গুছায়েছি ফুল
মনের মতন করি,
শীতল শিশির দিয়েছি ছিটায়ে
অনেক যতন করি।
হল না গো হল না,
প্রেমসাধ বুঝি পুরিল না!
শুন ওগো সখা, বনবালারে
দিয়েছি যে আমি বলি,
প্রতি শাখে শাখে গাইবে পাখী
প্রতি ফুলে ফুলে অলি।
দেখ চেয়ে দেখ বহিছে তটিনী,
বিমল তটিনী গো।
এত কথা তার রয়েছে প্রাণে,
বলিবারে চায় তটের কানে,
তবুও গভীর প্রাণের কথা
ভাষায় ফুটে নি গো!
দেখ হোথা ওই সাগর আসি
চুমিছে রজত বালুকারাশি,
দেখ হেথা চেয়ে চপল চরণে
চলেছে নির্ঝর ধারা,
তীরে তীরে তার রাশি রাশি ফুল,
হাসি হাসি তারা হতেছে আকুল,
লহরে লহরে ঢলিয়া ঢলিয়া
খেলায়ে খেলায়ে হতেছে সারা।
হল না গো হল না,
প্রেম সাধ বুঝি পুরিল না।
তবে শুনিবে কি সখা গান?
তবে খুলিয়া দিব কি প্রাণ?
তবে চাঁদের হাসিতে নীরব নিশীথে
মিশাব ললিত তান?
আমি গাব হৃদয়ের গান।
আমি গাব প্রণয়ের গান।
কভু হাসি কভু সজল নয়ন,
কভু বা বিরহ কভু বা মিলন,
কভু সোহাগেতে ঢলঢল তনু
কভু মধু অভিমান।
কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে,
সরমে তবুও কথা না ফুটে,
কভু বা পাষাণে বাঁধিয়া মরম
ফাটিয়া যেতেছে প্রাণ!

হল না গো হল না,
মনোসাধ আর পূরিল না।
এস তবে এস মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে,
যেথা সাধ যাও আমি একাকিনী
ব'সে থাকি সিন্ধুতীরে।

গান

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায়,
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়!
সাধের স্বপন যায় রে যায়!
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্!
কি জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার
তবে থাক্ তবে থাক্!

—

প্রভাতী

শুন, নলিনী খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখ, তোমারি দুয়ার-'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

শুনি,   প্রভাতের গাথা মোর
দেখ   ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ   জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি।
তবে   তুমি গো সজনি, জাগিবে না কি,
আমি যে তোমারি কবি।
শুন,   আমার কবিতা তবে,
আমি   গাহিব নীরব রবে
ভবে   নব জীবনের গান।
প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিশাবে মধুর তান!
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি!
শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি,   লোহিত বসনে সাজি,
দেখ   বিমল সরসী-আরসীর 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে,   থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া,
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।

কামিনী ফুল

ছি ছি সখা কি করিলে,   কোন্ প্রাণে পরশিলে,
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষপরশ-ভরে   শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান ত কামিনী সতী,   কোমল কুসুম অতি
দূর হতে দেখিবারে, ছুঁইবারে নহে সে,
দূর হতে মৃদু বায়,   গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে   পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে!

পরশিতে রবিকর শুকায়েছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না-ছুঁলে নয়!
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া!
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে,
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

লাজময়ী

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না।
অভিমানে যাই দূরে, কথা তার নাহি ফুরে
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
চেয়ে থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি দেখে দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
মরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ি তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু ছুটে না!

প্রেম-মরীচিকা

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভালবাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়
তবে সত্য ব'লে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়? কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন।

গোলাপবালা

গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌

বলি, ও আমার গোলাপবালা,
বলি, ও আমার গোলাপবালা,
তোল মুখানি, তোল মুখানি,
কুসুমকুঞ্জ কর আলা।
বলি, কিসের সরম এত?
সখি, কিসের সরম এত?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌-বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল এমন সময় কোথা?
প্রিয়ে, তোল মুখানি, আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত!
আমি, এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
আর কেহ শুনিবে না, কেহ জাগিবে না,
প্রেমকথা শুনি প্রতিধ্বনি বালা
উপহাস সখি করিবে না,
পরিহাস সখি করিবে না।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি, একটি চুম্বন দাও!
গোপনে একটি চুম্বন দাও!
সখি, তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,

আমি সারারাত ধ'রে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধ'রে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে চাহিবে আকাশ-পানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণগান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন দাও!

হর-হৃদে কালিকা

কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের—পৃথিবীর ভাবনা!
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওই রূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জ্বলন্ত শিরে রক্তরাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরাণখানি এখনও বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয় মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী কামিনী,
শোণিত তরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মনখানা, ঘুমায়েছে প্রাণ গো,
এক স্বপ্নে ভরা শুধু হৃদয়ের স্থান গো!
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপ ছলে পাগল ভিখারী বলে,
তাই আমি চাই হতে আর কিবা চাহি রে!
ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘাম্বর পরিয়ে,
বিমোহন রূপখানি হৃদিমাঝে ধরিয়ে।

… …

একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা,
অমনি এ জগতের রাশ-রজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্ব্বস্ব হারা, অন্ধ যত গ্রহ তারা

দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হতে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয়, জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে!
আঁধার কুন্তল তোর মহা শূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কাল ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সেই বিশ্ব-চূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে!
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয় মাঝে, কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া!
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে,
ঘোর স্তব্ধ, মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে,
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই ঊর্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া;
তখনো র'বি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

ভগ্নতরী

গাথা

প্রথম সর্গ

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হল অবসান,
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনক-কিরণ পান।
অলস লহরী তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,
এ উহার গায়ে পড়েছে এলায়ে
ভাঙাচোরা মেঘগুলি।
কনক-সলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায়—
উড়িয়াছে পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল বায়।
শত কণ্ঠ হতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,

তালে তালে তার পড়িতেছে দাঁড়,
ধ্বনিতেছে চারি ভিত।
বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরী কত,
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জ্ঞানহত।
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশী,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি।
অতি নিরিবিলি, নিরালায় দেখ
না মিশিয়া কোলাহলে
ললিতা হোথায়, পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি,
ঢলঢল তনু গল'গল' কথা
ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি।
আধো আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহি যে ওর,
প্রণয়-বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর।
পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
অতি ধীর মৃদু-শ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশেপাশে।
মধুর মধুর সকলি মধুর
মধুর আকাশ ধরা,
মধু-রজনীর মধুর অধর
মধু জোছনায় ভরা।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ু ভরে।
ছোট ছোট ঢেউ মাথাগুলি তুলি
টলমল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে, তুলিয়া
শত বরনের পাখা,
মৃদু বায়ু ভরে লঘু মেঘ যেন
সাঁঝের কিরণ মাখা।
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে
মরম গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে;

গান

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্‌?
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল!
আদরের ধন তুমি আদরে রাখিব আমি,
আদরিণি, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি,
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখিজলে আঁখিজল।

হরষে কভু বা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখপানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।

গান

ওই কথা বল সখা, বল আর বার,
ভালবাসো মোরে তাহা বল বার-বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভালবাসো মোরে তাহা বল গো আবার!

সান্ধ্য দিক্‌বধূ স্তব্ধ ভয় ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার;
ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
মিলিয়া অযুত জলদ-ভার।
তড়িত-ছুরিতে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথচক্ররব
ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল ঘোর গরজন
প্রলয় ঝটিকা আসিছে ছুটে,
ছিন্ন মেঘ-জাল দিগ্বিদিকে ধায়,
ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে।
পাগলের মত তরীযাত্রী যত
হেথা হোথা ছুটে তরণী-'পরে,
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
করে হাহাকার কাতর স্বরে!
ছিন্ন-তার বীণা যায় গড়াগড়ি,
অধীরে ভাঙিয়া ফেলেছে বাঁশি,
ঝটিকার স্বর দিতেছে ডুবায়ে
শতেক কণ্ঠের বিলাপ রাশি।

তরণীর পাশে নীরব অজিত,
ললিতা অবাক্ হিয়া,
মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি?
মুকুতা শয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি!
দুইটি প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
কাছাকাছি পাশাপাশি,
পশিবে না সেথা দ্বেষ কোলাহল,
কুটিল কঠোর হাসি।
ঝটিকার মুখে হীনবল তরী
করিতেছে টলমল,
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে
ভিতরে পশিছে জল।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ়তর বাহু ডোরে,
আদরে অজিত ললিতা-অধর
চুমিল হৃদয় ভ'রে।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
নয়নের জল দুটি,
নবীন সুখের স্বপন, হায় রে,
মাঝখানে গেল টুটি।
"আয় সখি আয়," কহিল অজিত
হাত ধরাধরি করি—
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল
আকুল সাগর-'পরি।

দ্বিতীয় সর্গ

নব-রবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া
নিশার আঁধার রাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘ-কোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী।
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিয়া চায়,
ক্ষীণ হাসিখানি হেসে আবার ঘুমায়।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে
তীর-উপলের 'পরে পড়ে কেঁপে কেঁপে।

দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া,
অজস্র কনক ধারা পড়িছে ঝরিয়া।
মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব সুরঞ্জিত,
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণ-ঢালা গীত।
বহু দিন হতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবন যাপন।
বিজনতা-ভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর।
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটীর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করে তার দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত—একি রে—একি রে-
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে?
রূপসী ললনা এক রয়েছে শয়ান,
প্রভাত-কিরণ তার চুমিছে বয়ান;
মুদিত নয়ন দুটি, শিথিলিত কায়;
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা ঢলিয়া বেলায়
এলানো কুন্তল ল'য়ে কত না খেলায়।
বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন,
বহু দিন পরে হেরি মানুষের মুখ
উচ্ছ্বসি উঠিল সুখে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাস-সমীর,
এখনো তুষার-হিম হয় নি শরীর।
যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশপাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া।
সুকুমার মুখখানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীর ভিতরে।
কতক্ষণ পরে তবে লভিয়া চেতন,
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন।
দেখিল যুবক এক রয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষ বিহীন;
কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি গৌর গ্রীবা-'পরে
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
শরমে সম্বরে তার শিথিল অঞ্চল।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া।

সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নব-বলে বলী।
সুরেশের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া,
পাগলের মত বালা উঠিল কহিয়া;
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ?
অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
দ্বার হতে ফিরাইয়া আনিলে নিষ্ঠুর!
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিও না তাপস-বর বাধা এক রতি—
মরিব—নিভাব প্রাণ সাগরের জলে,
মিলিব সখার সাথে নীল সিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়—ঊর্ম্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না কোলাহল তার!"

তৃতীয় সর্গ

মরমের ভার বহি—দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন।
নয়নে নাই সে জ্যোতি—হৃদয় অবশ অতি
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ।
আলুথালু কেশপাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি।
কি করুণ মুখখানি—একটি নাইক বাণী
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটি আঁখি।
যে দিকে চরণ ধায়, সে দিকে চলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে,
গাছের কাঁটার ধার, ছিঁড়িছে আঁচল তার
লতা-পাশ বাঁধিছে চরণে।
একাকী আপন মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে,
লতায় পাতায় গাছে—আঁধার করিয়া আছে,
সেইখানে শুইত সুধীরে।
জল কলরব রাশি, প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা!
ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হত সারা।
কানন-শৈলের পায়ে, মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা,
কত কি ভাবিত হায়—উচ্ছ্বসি উঠিত বায়
ঝরিয়া পড়িত শুষ্ক পাতা।

গভীর নীরব রাতে—উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তারা-পানে চেয়ে চেয়ে, কত-কি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদ কাহিনী!
কি করিলে ললিতার—ঘুচিবে হৃদয় ভার,
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত, যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া।
"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বল দেখি
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও, কি দিব বালা, বল গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?"
করুণ মমতা পেয়ে—সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিত দরদরে।
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধকণ্ঠে কহে তবে
"সখা গো ভেব না মোর তরে.
আমারে দিও না দেখা—বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর, কাঁদিয়া করিব ভোর
জানিতেও পারিবে না কেহ!"
সুরেশ ব্যথিত-হিয়া, একেলা বিজনে গিয়া
ভাবিত কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার, তবুও ত ললিতার
পারিল না অশ্রুবিমোচনে।
সুরেশ প্রভাতে উঠি—সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুল-ভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি, গাঁথি লয়ে মালাগাছি
ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল—তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত—পর্ণ-শয্যা বিছাইত
গুছাইত ঘরখানি তার।

শীতের তীব্রতা সহি—তপন কিরণে দহি,
করিয়া শতেক অত্যাচার,
মনের ভাবনা ভরে অবসন্ন কলেবরে
পীড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক—শুকায়ে যেতেছে মুখ,
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়,
নিশ্বাস অনলময়, শয্যা অগ্নি মনে হয়,
ছটফট করে যাতনায়।

ত্যজিয়া আহার পান সারা রাত্রি দিনমান
সুরেশ করিছে তার সেবা,
তৃষার্ত্ত অধরে তার ঢালিছে সলিল ধার,
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্ণ-ঘরে একটি শিলার-'পরে
দীপ-শিখা নিভ'নিভ' বায়ে,
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর, দু পা হয়ে অগ্রসর,
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি, কাতর নিশ্বাস ফেলি,
একটিও কথা না কহিয়া,
শিয়রের সন্নিধানে সুরেশ সে মুখপানে
একদৃষ্টে রহিত চাহিয়া।
বিকারে ললিতা যত বকিত পাগল-মত,
ছটফট করিত শয়নে—
ততই সুরেশ-হিয়া উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পূরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে—ললিতা উঠিত চেয়ে,
দেখিত সে শিয়রের কাছে
ম্লান-মুখ করি নত—নিস্তব্ধ ছবির মত
সুরেশ নীরবে বসি আছে।
মনে তার হ'ত তবে, এ বুঝি দেবতা হবে,
অসহায়া অবলা বালারে
করুণা-কোমল প্রাণে, এ ঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।
অশ্রুধারা দরদরি কপোলে পড়িত ঝরি,
সুরেশের ধরি হাতখানি
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণে, আঁখি তুলি মুখপানে
নীরবে কহিত কত বাণী!
রোগের অনল-জ্বালা, সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ-পাশ ও-পাশ,
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়—
অনেক যাতনা হ'ত হ্রাস।
ফল মূল অন্বেষণে—যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার।
চাহিত উৎসুক-হিয়া প্রতি শব্দে চমকিয়া,
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া—ফুল ফল আহরিয়া—
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত—অতি মৃদু উঠাইত
হাসিটি উঠিত ফুটি ধীরে।
দিন রাত্রি নাহি মানি—বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার।

রোগ চলি গেল ধীরে, বল ক্রমে পেলে ফিরে,
সুস্থ হ'ল দেহ ললিতার।
রোগশয্যা তেয়াগিয়া—মুক্ত সমীরণে গিয়া,
মন-সুখে বনে বনে ফিরি,
পাখীর সঙ্গীত শুনি—সিন্ধুর তরঙ্গ গুনি
জীবনে জীবন এল ফিরি।

চতুর্থ সর্গ

বসন্ত-সমীর আসি, কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব যৌবনের গানে।
এক ঠাঁই পাশাপাশি, ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে ঢলাঢলি।
খেলি প্রতি ফুল-'পরে, সুরভি-রাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি।
কোথায় ডাকিছে পাখী, খুঁজিয়া না পায় আঁখি
বনে বনে চারি দিকে হাসিরাশি বাদ্যগান।
দুরগম শৈল যত, ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান।
ললিতার আঁখি হতে শুকায়েছে অশ্রুধার,
বসন্তগীতের সাথে বাজিছে হৃদয় তার।
পুরানো পল্লব ত্যজি নব-কিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,
তেমনি গো ললিতার হৃদয় লতাটি ঘিরে
নবীন হরিত-প্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে।
ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্ত হসিত বনে, ভ্রমিত হরষ মনে,
করুণ চরণক্ষেপে ফুলরাশি মাড়াইয়া।
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পড়েছে ঝুঁকি,
অতি ক্লেশে সেথা উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
সায়াহ্ন-কিরণ জলে করিত গো ঝিকিমিকি।
লহরীরা শৈল-'পরে, শৈবালগুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল-ভরা গুল্মগুলি সলিলে পড়েছে ঝুলি,
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনীবালা জোছনা-মদিরা-পানে,
হাসিছে সরসীখানি কাননের মাঝখানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখাগুলি
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি—
চড়ি সে নৌকার 'পরে, জ্যোৎস্না-সুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিত গো ফিরি ফিরি,

ললিতা থাকিত শুয়ে কোলে তার মাথা থুয়ে,
কখন বা মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
কখন বা সায়াহ্নের বিষণ্ণ কিরণ-জালে,
অথবা জোছনা যবে কাঁপে বকুলের ডালে,
মৃদু মৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতা-হৃদি আকুলি উঠিত যদি—
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দুনয়নে—
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখখানি,
কহিত করুণ স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখিধারা যতন করিয়া অতি,
শরত মেঘের মত হৃদয় আঁধার যত
মুহূর্ত্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি, হৃদয়ের ভার-রাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জ্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ

নারিকেল-তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায়—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণপণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,
দেখিয়া দোঁহার হিয়া উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময় হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে!
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে,
কুটীর বাঁধিবে এক বিপাশার তীরে।
দুখ শোক ভুলি গিয়া—একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন।

উঠিল তরণী 'পরে, অনুকূল বায়ু ভরে
স্বদেশে করিল আগমন;
বাঁধিয়া পরণ-শালা না জানিয়া কোন্ জ্বালা
করিতেছে জীবন যাপন।
নির্ঝর কানন নদী, দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে,
দুটিতে মগন হয়ে, অতীতের কথা লয়ে
ফুরাতে নারিত সারাক্ষণে।
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে, পল্লব-মর্ম্মর সাথে
শুনি বিপাশার কলস্বর—

স্বপনে হইত মনে, দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝর ঝর্ঝর।
দ্বীপের কুটীরখানি কল্পনায় মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহসজ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়াগড়ি;
হয়ত গো কাঁটা গাছে এত দিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—
এত দিনে শাখা জুড়ি ফুটেছে মালতী কুঁড়ি
দেখিবার নাই কোন জন।
সেই যে শৈলেতে উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
নারিকেল কুঞ্জটির কাছে—
চারি দিকে শিলারাশি, ছড়াছড়ি পাশাপাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে।
মজিয়া কল্পনা-মোহে, কত কি ভাবিত দোঁহে
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস,
অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস।
একদা চাঁদিনী রাতি, দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা, কহিতে কহিতে কথা
কত দূরে গেল আন্‌মনে।
সহসা সে বিভাবরী, আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘরাশি,
পথ নাহি দেখা যায়, ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের পরিহাস-হাসি।
প্রতি বজ্র গরজনে, ললিতা শঙ্কিত মনে
সুরেশে জড়ায় দৃঢ়তর।
অবসন্ন পদ তায়, প্রতি পদে বাধা পায়
তরাসেতে তনু থর থর।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হতে তার, মুমূর্ষু-আলোক ধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয়-পানে, দোঁহে আশ্বাসিত প্রাণে,
সহসা জাগিল নীরবতা,
উঠিল সঙ্গীত-স্বর, বালার হৃদয়-'পর
প্রবেশিল দু-একটি কথা—
"পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্‌
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।"
কাঁপিছে বালার বুক, নীল হয়ে গেছে মুখ,
কপোলে বহিছে ঘর্ম্মজল—

ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর,
শরীরে নাইক বিন্দু-বল।
তবুও অবশ মনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে,
অঙ্গন হইয়া পার, খুলি এক জীর্ণ দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের 'পরে, দীপ মিট্ মিট্ করে,
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে,
ভেদি গৃহ-ভিত্তি যত, বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা,
পুরুষ একটি শ্রান্ত-কায়,
অতি শীর্ণ দেহ তার এলোথেলো জটাভার,
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি ভায়।
জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর; পাতাটিও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি;
দ্বারে শুনি পদধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গণি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।
সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল,
সহসা মুহূর্ত্ত তরে দেহে এল বল।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
দু-পা হয়ে অগ্রসর—কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হয়ে ভূমিতলে পড়িল আবার।
করুণ নয়নে অতি— ললিতা-মুখের প্রতি
অজিত রহিল স্তব্ধ একদৃষ্টে চাহি:
দীপশিখা অতি স্থির— স্তব্ধ গৃহ সুগভীর,
চারি দিকে একটুকু সাড়াশব্দ নাহি।
দুই হাতে আঁখি চাপি, থর থর কাঁপি কাঁপি
মূর্চ্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি;
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি,
জীর্ণ গৃহ কাঁপাইয়া— ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ূচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ, গৃহ পূরিল আঁধারে।

পথিক

প্রভাতে

উঠ, জাগ তবে—উঠ, জাগ সবে—
হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরন গো!
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার

শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো!
মাথায় বিজয়-কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয় কিরণ-মাল,
বিজয়-বিভায় উজলি উঠেছে,
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল!
উষা নব-বধূ দাঁড়াইয়া পাশে,
গরবে, শরমে, সোহাগে, উলাসে,
মৃদু মৃদু হেসে সারা হ'ল বুঝি,
বুঝিবা শরম রহে না তার;
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,
অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
হাসি সে বারণ সহে না আর!
এস এস তবে—ছুটে যাই সবে,
কর কর তবে ত্বরা,
এমন বহিছে প্রভাত বাতাস,
এমন হাসিছে ধরা!
সারা দেহে যেন অধীর পরান
কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
অধীর হৃদয় মম
প্রভাত বিহগ সম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে,
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব,
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান, জীবনের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে,
অতি দূর দূর যাব!
কোথায় যাইবে? কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়,
কুসুম কাননে, অচল শিখরে,

নির্ঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!
দেখ—চেয়ে দেখ—পথ ঢাকা আছে
কুসুমরাশিতে রে,
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে!
ফুলে কাঁটা আছে? কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই—নাই—নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই!
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
ত্বরা ক'রে আয় ত্বরা ক'রে আয়,
যাই মোরা যাই চল্।
নির্ঝর যেমন বহিয়া চলিছে
হরষেতে টলমল,
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
হাসিতেছে খল খল!
তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর;
ছুটেছে কোথায়?—কে জানে কোথায়!
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া—তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল্।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাত পবন,
হাসিছে এমন ধরা!
যে যাইবি আয়—যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি—কর্ ত্বরা!

—

আমি যাব গো!—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান

দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো!
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়—
শতবার আশা করি শতবার ভেঙে যায়;
আমি যাব গো!
সারারাত ব'সে আছি আঁখি মোর অনিমেষ।
প্রাণের ভিতর দিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারি দিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা—ভগ্ন সুখ—ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি।
সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি ইঁট খসিতেছে নিতি নিতি;
আমি যাব গো।
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়!—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে সুর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃদুলে জাগায়,
তারা ভগ্ন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়!
কত দীপালোক—কত ফুল—কত পাখী!
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি!
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
কত স্বপ্ন হায়!
হৃদয় চমকি উঠি চারি দিকে চায়,
দেখে গো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায়!
সে দীপ নিভিয়া গেছে—
সে ফুল শুখায়ে গেছে—
সে পাখী মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চিরতরে নিমীলিত।
আমি যাব গো!
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকি আছে তার!
এখনো প্রভাতে যদি হরষিত প্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই—চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনেরি গান

সেই দুটি তার।
টুটে গেছে ছিঁড়ে গেছে বাকি যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে;
এখনো যদি গো শুনে বসন্ত পাখীর গীত,
এখনো পরশে যদি বসন্ত মলয় বায়,
দু-চারিটি কিশলয়
এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত,
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ করেছে আজি গো—
নব-যৌবনের গান ললিত রাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে,
শ্মশানেতে হাসিমুখ শিশুটির প্রায়,
লইয়া মাথার খুলি, আধ-পোড়া অস্থিগুলি,
প্রমোদে ভস্মের 'পরে ছুটিয়া বেড়ায়।
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ— তোমাদেরি সাথে যায়—
সাধ— তোমাদেরি গান গায়;
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরানো কণ্ঠ মোর
বাজিবে না সুরে?
না হয় নীরবে রব', না হয় কথা না কব
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পুরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণপণে;
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে—দিস্ রে আশ্রয়।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার?
কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়,
পর্ব্বত-শিখর-শায়ী বিস্তৃত তুষার।
কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি,
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্ত্তের জল,
হা দুর্ব্বল তুই তার কি ভাবিলি বল?
ভাবিয়া ত কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর— জীবন দুর্ব্বহ ভার;
সহিব এ পোড়া ভালে যা আছে লিখন।
যদি প্রতি পদে পদে অদৃষ্টের কাঁটা বিঁধে,

প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি!
না হয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

—

মধ্যাহ্ন

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন কেন!
ছি ছি ছি সামান্য ব্যথায় অধীর
শিশুর মতন হেন!"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাহাই ব'লে কি আধ' পথ হ'তে
ফিরে যেতে সাধ হয়?"
"তবে চল যাই—যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ—
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"বল দেখি তবে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?
পাব কি আবার শ্যামল্ কানন,
ঘন ছায়াময় গাছে?"
"হয়ত বা পাবে—হয়ত পাবে না,
হয়ত বা আছে—হয়ত নাই!"
"ওই যে সুদূরে দূর-দিগন্তরে
শ্যামল কানন দেখিতে পাই।"
"শ্যামল কানন—শ্যামল কানন—
ওই যে গো হেরি শ্যামল কানন—
চল, সবে চল, হসিত আনন,
চল ত্বরা চল—চল গো যাই!"
"ও যে মরীচিকা"—"ও কি মরীচিকা?"
"মরীচিকা?" "তাই হবে!"

"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্ খানে তবে?"

—

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহে না যেন—
পারি না বহিতে দেহ ভার।
এ পথের বাকি কত আর!
কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?
ছেলেবেলা এক দিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বলেছিনু—
"সারা পথ আমাদের হবে না বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধপথে না যাইতে যত বাল্য-সখা
কে কোথায় চ'লে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্ত-পদে দীর্ঘ-পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশা-পুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ?
ভগ্ন আশা-ভিত্তি-'পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায়, উনমাদ হেন?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল প'ড়ে, স্মৃতি নাম যার।
এক দিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা তাই সেথা আছে;
এক দিন ফুটেছিল যে ফুলসকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সঙ্গীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গলঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ!
সে প্রেত-ভূমিতে আমি ছিনু রাত্রি দিন
প্রেত-সহচর!
কেহ বা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণ-কলেবর।
কেহ বা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই— নয়নে পলক নাই—
শুধু ব'সে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হ'লে শুইতাম— দীপহীন শূন্য ঘর;
কেহ কাঁদে— কেহ হাসে—
কেহ পায়— কেহ পাশে—

কেহ বা শিয়রে ব'সে শত প্রেত সহচর!
কেহ শত সঙ্গী ল'য়ে, আকাশ মাঝারে র'য়ে
ভাব-শূন্য স্তব্ধ মুখে করিত গো নেত্রপাত—
এমনি কাটিত দিন এমনি কাটিত রাত!
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে—
ফুরাত জীবন-দিন চিন্তাহীন, ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে,
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে!
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর?
তবে কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?
এখন ফিরিতে নারি, অতি দূর—দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাকো আর,
শ্রান্ত হইয়াছি বড় বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই,
অতি দূর—দূর পথ—বসি একবার।

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ?" "যেথা হোক্ নাক'
তবুও যাইতে হবে,
পথে কাঁটা আছে শুধু ফুল নহে,
তাহাও জানিও সবে!
হয়ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয়ত যাইব না;
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব—
হয়ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ।
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এস—
ধর সবে মোর হাত।

দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই,
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকি,
চল ত্বরা ক'রে যাই।"
"ও পথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে যাইব" "পশ্চিমে যাইব"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা ক'রে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

যেও না ফেলিয়া মোরে, যেও নাকো আর;
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই,
যেও না, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে চলিনু" "পশ্চিমে চলিনু"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক, যে আসিবে এস,
মোরা ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল।
দক্ষিণে কেহ বা যায়, পশ্চিমে কেহ বা যায়,
কেহ বা উত্তরে চলি গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারি ধার,
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখিপাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।

কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম?
দক্ষিণা-বাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে,
হৃদয়ে উত্তর বায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে?
জানিস কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি-'পরে
বসন্তের কুসুম-শয়ন?
অরুণ-কিরণ-ময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন মেলন?
যৌবন-বীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর,
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরা তার!
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ-মাঝে,
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে!
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীন,
সেই ছন্দে এক গান বাজিতেছে নিশিদিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণকবির হাতে;
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের পাতে পাতে!
তবে কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম!
তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি;
এক পদ উঠিব না মরি ত হেথায় মরি।
প্রভাতে উঠিবে রবি, নিশীথে উঠিবে তারা,
পড়িবে মাথার 'পরে রবিকর বৃষ্টিধারা।
হেথা হতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না,
চরণ অচল রবে, অচল পাষাণ-পারা।
দেখিস, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষ-কোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠে না রে মন!
উল্লাসে অধীর-হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ-হেন
ভুলিস নে—ভুলিস নে—সায়াহ্নেরে যেন!

পরিশিষ্ট ২

অভিলাষ

১

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

২

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

৩

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

৪

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

৫

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

৬

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

৭

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয় তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

৮

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

৯

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

১০

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

১১

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

১২

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

১৩

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

১৪

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

১৫

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

১৬

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

১৭

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

১৮

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

১৯

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্পে পরিপূর্ণ শোভন আপণ।

২০

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

২১

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

২২

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?"

২৩

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষাচয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়।"

২৪

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

২৫

ঐ দেখ গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির 'পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

২৬

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

২৭

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে?

২৮

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

২৯

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

৩০

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর।

৩১

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

৩২

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

৩৩

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

৩৪

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

৩৫

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

৩৬

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

৩৭

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

৩৮

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

৩৯

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি-
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়ু।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূর্ণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
“কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিল ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিল ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃংখলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিগয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙিগয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙখলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।”

অমৃতবাজার পত্রিকা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[দ্বিতীয় পাঠ]

বিস্তারিয়া ঊর্ম্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে॥
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে॥
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলকা-রাশি
কবরী কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতি-দেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়ন-দ্বয়, প্রশান্ত বিষাদ-ময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে॥—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তাহলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।
তাহলে কি হিমালয়, গর্ব্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান॥
তাহলে কি শতদলে তোর সরোবর-জলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুম-রাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কিলো অমন সুবাস॥
তাহলে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করে্য
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলনা॥
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন
গলিল তুষার মালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহার-বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে॥
ঈষৎ আঁধার রাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি
আটক করিল নব অরুণের কর।

মেঘ-রাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বত-শিখর॥
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরী।—
'কাঁদ কাঁদ আরো কাঁদ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেল্যে দে' না অলঙ্কার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরত-ভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে॥
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদ ভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।
দ্যাখ্ আর্য্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্য পটে রয়েছে চিত্রিত।
দ্যাখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য্য উঠি প্রাতঃকালে, তাড়ায় আঁধার জালে
কেমন স্বাধীন ভাবে বিস্তারিয়া কর॥
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা-ঝঙ্কারিত।
শুনিয়া ভারত পাখী, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত॥
সে সব স্মরণ কর্যে কাঁদ্ লো আবার!
আয়্ রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জ্জটি! সংহার শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু দল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যে যাক ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগর বালুকা রাশি,
মরুভূমি হয়্যে থাক সমস্ত প্রদেশ॥'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতি সুন্দরী,
ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি॥
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গ ভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর।
সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘ গণে,
সুতীব্র রবির ছটা হ'ল বিকীরিত।

আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত॥—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশু-গণে॥
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ॥
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল যাইত শুকায়ে—
তপন-কিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ॥
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্য মুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত, আনন্দে দিবস যে'ত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান॥
তা হ'লে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল॥
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হ'লে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হ'ত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর যাতনা॥
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায় আনন্দে বিহবল প্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না॥
আর্য্যেরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হ'ল তোর বন।
হরষে প্রফুল্ল মুখে হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন॥
ঋষিগণ সমস্বরে অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্য ভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি॥
সরস্বতী নদী-কূলে, কবিরা হৃদয় খুলো
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত॥

সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভা'লে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্তকালের মত, সুখসূর্য্য অস্তগত
ভাগ্য কি অনন্তকাল র'বে এই রূপে॥
তোর ভাগ্যচক্র-শেষে থামিল কি হেতা এস্যে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জ্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু-দল,
ছিন্নভিন্ন কর্য়ে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি, উগর বালুকারাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ॥'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
শকাব্দ ১৭৯৭ আষাঢ়
১৮৭৫ জুন-জুলাই

প্রকৃতির খেদ

[প্রথম পাঠ]

১

বিস্তারিয়া ঊর্ম্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

২

অদূরেতে দেখা যায়,
উজল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা,
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়॥

৩

ফুটেছে কনক-পদ্ম অরুণ কিরণে॥
অমল সরসী 'পরে,
কমল, তরঙ্গ ভরে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে॥

৪

হেলিয়া নলিনী দলে,
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে,
সরসী-লহরী ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি,
দুলায়ে অলকা রাশি,
কবরী-কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ॥

৫

বিজনে খুলিয়া প্রাণ,
নিখাদে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গান ধীরে ধীরে।
নলিন নয়নদ্বয়,
প্রশান্ত বিষাদময়
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে॥

৬

"অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে,
তাহলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ?
তা হলে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা 'পরে হতো বহমান?
তা হলে কি হিমালয়,
গর্ব্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার-মুকুট শিরে করি পরিধান।

৭

তা হলে কি শতদলে,
তোর সরোবর-জলে,
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ?
কাননে কুসুম রাশি,
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস?

৮

তাহলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু করে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ;
প্রজ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের করিত ছলন!"
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন॥

৯

গলিল তুষার মালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেনিল নীহার-নীর সরসীর জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল;
উথলে গঙ্গার জল,
তরু-স্কন্ধ ছাড়ি লতা লুঠিল ভূতলে॥

১০

ঈষৎ আঁধার রাশি,
গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিয়া দিল অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া,
আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্ব্বত-শিখর॥

১১

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান॥
কাঁদ্! কাঁদ্! আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত
হায়! দুঃখ-নিশা তোর,
হলো না হলো না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হলো না আগত?

১২

লজ্জাহীনা! কেন আর,
ফেলে দে-না অলঙ্কার,
প্রশান্ত গভীর ওই সাগরের তলে?
পূতধারা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া মরত ভূমি
আবদ্ধ হউক পুনঃ ব্রহ্ম-কমণ্ডলে॥

১৩

উচ্চশির হিমালয়,
প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্‌ তুই তার পরে,
অসহ্য বিষাদ ভরে,
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি॥

১৪

দেখ্‌, আর্য্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্য-পটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্‌ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥

১৫

কেমন স্বাধীন মনে,
গাহিছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে প্রসূন নিকর।
সূর্য্য উঠি প্রাতঃকালে,
তাড়ায় আঁধার জালে;
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর!

১৬

তখন কি মনে পড়ে—
ভারতী-মানস-সরে,
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝঙ্কারিত!
শুনিয়ে ভারত-পাখী
গাহিত শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত?

১৭

সে সব স্মরণ করে, কাঁদলো আবার॥
"আয়রে প্রলয় ঝড়
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার!
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল হোক্ একাকার॥

১৮

প্রভঞ্জন ভীম-বল!
খুলে দাও, বায়ুদল!
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি
উগর বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ॥

১৯

বলিতে নারিল আর প্রকৃতি-সুন্দরী।
ধ্বনিয়া আকাশভূমি,
গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি॥

২০

জাহ্নবী উন্মত্ত পারা,
নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড-বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
মানস সরস-'পরে,
পদ্ম কাঁপে থরে থরে
দুলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর॥

২১

সুচঞ্চল সমীরণে,
উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হলো বিকীরিত
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত॥

২২

'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিল যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে,
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?

সম্পদ বিপদ সুখ,
হরষ বিষাদ দুখ,
কিছুই না জানিতিস্‌ সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,
যখন মানব গণ,
করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ॥
না বিতরি গন্ধ হায়,
মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল, যাইত শুকায়ে
তপন-কিরণ তপ্ত মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ॥

২৩

সেইরূপ রহিল না কেন চিরকাল!
না দেখি মনুষ্য-মুখ
না জানিয়া দুঃখসুখ
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত,
আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান॥

তাহলে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল!
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ,
তাহলে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হত না?
পদাঘাতে উপহাসে,
তাহলে ত কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা॥

২৪

অরণ্যেতে নিরিবিলি,
সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়!
আনন্দে বিহ্বল প্রায়!
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না॥

২৫

আইল হিন্দুরা শেষে,
তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।
হরিষে প্রফুল্ল মুখে,
হাসিল সরলা! সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিল আপন॥

২৬

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি,
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি॥
সরস্বতী-নদী-কূলে,
কবিরা হৃদয় খুল্যে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে,
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত॥

২৭

সেই এক অভিনব
মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগর তলে
একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে,
একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস্ তুই আহা,
নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
সেই অমানিশা তোর,
আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে॥
অনন্ত কালের মত,
সুখ-সূর্য্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল রবে এই রূপে।

তোর ভাগ্যচক্রশেষে,
থামিল কি হেথা এস্যে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার
আয় রে প্রলয় ঝড়,
গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল,
খুল্যে দেও বায়ু-দল,
ছিন্ন ভিন্ন কর্য্যে দিক ভারতের বেশ।
ভারত সাগর রুষি,
উগর বালুকা-রাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ॥

প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮২

'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন! দেখ্‌রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;

জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!
দেখ্‌রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্‌রে চন্দ্রমা দেখ্‌রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব দেখ্‌ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্‌রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

[নভেম্বর ১৮৭৫]

প্রলাপ ১

১

গিরির উরসে নবীন নিঝর,
ছুটে ছুটে অই হতেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগল পারা।

২

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কি করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

৩

কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনী জলে।

৪

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

৫

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্ গুন্ গুন্ রাগিয়া আগুনে,
অভিশাপ দিয়া কত কি বলে।

৬

তপন কিরণ—সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি, ভাসি, ভাসি স্বর্ণ ফুল রাশি
হাসি, হাসি হাসি সলিলে দোলে।

৭

প্রজাপতিগুলি পাখা দুটি তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা
কিরণে পশিতে কুসুম দলে।

৮

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

৯

তুই কে লো বালা! বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান!
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস্ গান।

১০

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরাণ,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

১১

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃত ধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

১২

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।

১৩

কে লো তুই বালা! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীণা কোলের 'পরে।
জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢল প্রমোদ ভরে।

১৪

বিভোর নয়নে বিভোর পরাণে—
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে!
হাসি উঠে দিক্! ডাকি উঠে পিক্!
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে!!

১৫

চারি দিক্ চেয়ে কে লো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্?
আঁধার ছুটিয়া জোছনা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্!

১৬

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা!
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী মালা।

১৭

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুম রাশি
বাম করতলে কপোল ছাপি।

১৮

এতকাল তোরে দেখিনু সেবিনু—
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে নয়নে, পরাণে পরাণে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

১৯

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় রহেছে খালি।
তোরে প্রাণ মন করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি।

২০

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

২১

দেখিব উষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা।

২২

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরন,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

২৩

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

২৪

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নির্ঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া—নাচিয়া—বহিয়া যায়।

২৫

বসিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে সব কথা।

২৬

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে—মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

২৭

আয় কলপনা আয়লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে, বাতাসে, আকাশে, আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

২৮

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক জগত রহিবে চাহি!

২৯

জলধর রাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

৩০

সুর সুরধুনী আলোকময়ী,
উজলি কনক বালুকা রাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

৩১

প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরী লীলা।
সোনার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর বালিকারা করিবে খেলা।

৩২

আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী।
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৩

কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৪

আয় কল্পনা আয়লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
অগ্রহায়ণ ১২৮২

প্রলাপ ২

ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্!
সুনীল আকাশে রজত ধারা!
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা!
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি!
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি!
হাসুক পৃথিবী, হাসুক জগৎ,
হাসুক হাসুক চাঁদিমা তারা!
হৃদয় খুলিয়া করিব রে গান
হৃদয় হয়েছে পাগলপারা!
আধ ফুটো ফুটো গোলাপ কলিকা
ঘাড়খানি আহা করিয়া হেঁট
মলয় পবনে লাজুক বালিকা
সউরভ রাশি দিতেছে ভেট!
আয়লো প্রমদা! আয়লো হেথায়
মানস আকাশে চাঁদের ধারা!
গোলাপ তুলিয়া পরলো মাথায়
সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা।
হেসে ঢল্ ঢল্ পূর্ণ শতদল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সুরভি রাশি
নয়নে নয়নে, অধরে অধরে
জ্যোছনা উছলি পড়িছে হাসি!

চুল হতে ফুল খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়িছে ভুমে!
খসিয়া খসিয়া পড়িছে আঁচল
কোলের উপর কমল থুয়ে!
আয়লো তরুণী! আয়লো হেথায়!
সেতার ওই যে লুটায় ভুমে
বাজালো ললনে! বাজা একবার
হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান!
অবাক্ হইয়া মুখপানে তোর
চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ!
গলার উপরে সঁপি হাতখানি
বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অস্ফুটে কত কি যে কথা
কহিবি পরানে ঢালিয়া সুখ!
ওইরে আমার সুকুমার ফুল
বাতাসে বাতাসে পড়িছে দুলে
হৃদয়েতে তোরে রাখিব লুকায়ে
নয়নে নয়নে রাখিব তুলে।
আকাশ হইতে খুঁজিবে তপন
তারকা খুঁজিবে আকাশ ছেয়ে!
খুঁজিয়া বেড়াবে দিক্‌বধূগণ
কোথায় লুকাল মোহিনী মেয়ে?
আয়লো ললনে! আয়লো আবার
সেতারে জাগায়ে দে-না লো বালা!
দুলায়ে দুলায়ে ঘাড়টি নামায়ে
কপোলেতে চুল করিবে খেলা।
কি যে ও মুরতি শিশুর মতন!
আধ ফুটো ফুটো ফুলের কলি!
নীরব নয়নে কি যে কথা কয়
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
কি যে ঘুমঘোরে ছায় প্রাণমন
লাজে ভরা ঐ মধুর হাসি!
পাগলিনী বালা গলাটি কেমন
ধরিস্ জড়িয়ে ছুটিয়ে আসি!
ভুলেছি পৃথিবী ভুলেছি জগৎ
ভুলেছি, সকল বিষয় মানে!
হেসেছে পৃথিবী—হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিলি কাহারো পানে!
আয়! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
পৃথিবী ছাড়িয়া যাইলো চলে!

চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে!
চল যাই মোরা আরেক জগতে
দুজনে কেবল বেড়াব মাতি
কাননে কাননে, খেলাব দুজনে
বনদেবী কোলে যাপিব রাতি!
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল!
সুরভি পূরিত কুসুম কলি!
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
সেথায় দুজনে যাইব চলি!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
ফাল্গুন ১২৮২

প্রলাপ ৩

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বল কি আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি!
আর বলিব না এই শেষবার
এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
হৃদয় ভাঙিগয়া গিয়াছে সই!
পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
হুতাশনময়ী দামিনী বালা!
অবারিত করি মরমের তল
কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!
কতবার তোরে কহেছি ললনে!
দেখায়েছি খুলে হৃদয় প্রাণ!
মরমের ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
সে সব কথায় দিস্ নি কান।
কতবার সখি বিজনে বিজনে
শুনায়েছি তোরে প্রেমের গান,
প্রেমের আলাপ—প্রেমের প্রলাপ
সে সব প্রলাপে দিস্ নি কান!
কতবার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতিশোধ তুই দিস্‌নিকো তার
শুধু এক ফোঁটা নয়ন জলে!
শুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! আমার রেতে

আঁখি জল কত করেছে গোপন
মর্ত্ত্য পৃথিবীর নয়ন হতে!
শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!
সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!
সহেছি সে সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা!
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়!
তোমারি তরে লো সহেছি সে সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!
কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।
কিছুই চাহিনি পৃথিবীর কাছে—
প্রেম চেয়েছিনু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হ'ল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!
তোর কাছে বালা এই শেষবার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া;
ভিখারী হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া!
সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি
সেইদিন আমি ভেবেছিনু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি।
তখনো হায়রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরাণ দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!
আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙ্গিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন
ভিখারী হইয়া যাইব চলি!

পাষাণের পটে ও মূরতিখানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি! তোর ওই মুখখানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়ন বারি
যতকাল ওই ছবিখানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।
কি করিব বালা মরণের জলে
ঐ ছবিখানি মুছিতে হবে!
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে!
এ ভাঙ্গা হৃদয় কত সবে আর!
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা!
মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরাণ জুড়াল বালা!
তোরে সখি এত বাসিতাম ভাল
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়-তল
সে সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল?
আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে! আমার তরে
এক ফোঁটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্ কখনো বিষাদ ভরে!
সেই নেত্র জলে—এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা!
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮৩

‘দিল্লী দরবার’

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?

তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি

রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,

তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া

রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!

হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে?

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না

আমরা গাব না হরষ গান,

এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

১৮৭৭

হিমালয়

যেখানে জ্বলিছে সূর্য্য, উঠিছে সহস্র তারা
প্রজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎ-যন্ত্র, ঘুরিছে নিয়ম-চক্রে
অসংখ্য উজ্জ্বল-গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া॥
গম্ভীর অচল তুমি, দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া॥
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম-সুখ
ক্ষুদ্র নর এই আমি আসিয়াছি ছুটিয়া।
পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া॥
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহময় শূন্য পানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া॥
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালাগুলি চিত্র-সম শোভিবে।
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছপালা
একে একে ছোট ছোট তারাগুলি নিভিবে॥
তখনি বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, একতানে নির্ঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে॥
ক্রমে ক্রমে আসিবেক, জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর, দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু—বায়ু যাবে বহিয়া॥
চখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকার মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হ'য়ে কানে গিয়া পশিবে॥
এতকাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদে কেঁদে— ক্লান্ত শিশুটির মত
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব॥
সে ঘুম ভাঙিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব॥

'হে কবিতা—হে কল্পনা' : 'দয়াময়ি, বাণী বীণাপাণি'। অবসাদ
পাণ্ডুলিপি : মালতী-পুঁথি 56/২৯খ

ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া॥
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হ'তে এক গীতধ্বনি উঠিছে॥
গভীর আনন্দ ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া॥

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন!
ঢাল' এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল!
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;
নিজ্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল!
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারি দিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন-প্রাণহীন-জনহীন-মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,
নিজ্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এস দেবি, এস, মোরে
রাখ এ মূর্চ্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাওগো উঠায়ে!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া-
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়ে-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন-বলহীন-চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকর্ম্মণ্য-অনাথ-অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!

পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব— যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্ম্মের অনুষ্ঠান!
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বী তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুর্ব্বল পথিকে
করগো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে!

রচনা :
আমেদাবাদ
৬ জুলাই ১৮৭৮

পরিশিষ্ট ৩

ক-গ

স্ফুলিঙ্গ

১

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে!
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি।

২

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

৩

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধূলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

৪

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে
প্রতি ক্ষণে করিয়ো মার্জনা।

৫

অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
জীবন কেবলি খোঁজা।
অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা।
যা পাই নি তারি লইয়া সাধনা
যাব কি সাগরপার।
যা গাই নি তারি বহিয়া বেদনা
ছিঁড়িবে বীণার তার?

৬

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।

সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা!
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা!

৭

অন্ধকারের পার হতে আনি
প্রভাতসূর্য মন্দ্রিল বাণী,
জাগালো বিচিত্ররে
এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।

৮

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে,
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়।

৯

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

১০

অপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

১১

অপাকা কঠিন ফলের মতন,
কুমারী, তোমার প্রাণ
ঘন সংকোচে রেখেছে আগলি
আপন আত্মদান।

১২

অবসান হল রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে—
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক্ চিনে।

১৩

অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে এ কী ভুল—
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

১৪

অমলধারা ঝরনা যেমন
স্বচ্ছ তোমার প্রাণ,
পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক
আনন্দময় গান।
সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভ'রে
সফলতার দান।

১৫

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

১৬

আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে না পায় জন্তু,
মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।

১৭

আকাশে যুগল তারা
চলে সাথে সাথে
অনন্তের মন্দিরেতে
আলোক মেলাতে।

১৮

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

১৯

আকাশের আলো মাটির তলায়
লুকায় চুপে,
ফাগুনের ডাকে বাহিরেতে চায়
কুসুমরূপে।

২০

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

২১

আগুন জ্বলিত যবে
আপন আলোতে
সাবধান করেছিলে
মোরে দূর হতে।
নিবে গিয়ে ছাইচাপা
আছে মৃতপ্রায়,
তাহারি বিপদ হতে
বাঁচাও আমায়।

২২

আজ গড়ি খেলাঘর,
কাল তারে ভুলি—
ধূলিতে যে লীলা তারে
মুছে দেয় ধূলি।

২৩

আঁধার নিশার
গোপন অন্তরাল,
তাহারই পিছনে
লুকায়ে রচিলে
গোপন ইন্দ্রজাল।

২৪

আপন শোভার মূল্য
পুষ্প নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে।

২৫

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।
আপন-বাহিরে মেলো চোখ,
সেইখানে অনন্ত আলোক।

২৬

আপনারে দীপ করি জ্বালো,
আপনার যাত্রাপথে
আপনিই দিতে হবে আলো।

২৭

আপনারে নিবেদন
সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।

২৮

আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে
গন্ধ তার ঢালে দখিনবায়ে।

২৯

আমি অতি পুরাতন,
এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে
নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই—
আছে কোনো গুণ,
ভিতরে নবীন থাকে
অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপাগাছে
নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে
অমৃতের ভাষা।

৩০

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই-যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবীকালের হাতে।

৩১

আয় রে বসন্ত, হেথা
কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের
হৃদয়ের গোপন আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস রেখে,
সুবর্ণের তুলিখানি
পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

৩২

আলো আসে দিনে দিনে,
রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।
মরণসাগরে মিলে
সাদা কালো গঙ্গাযমুনার।

৩৩

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

৩৪

আশার আলোকে
জ্বলুক প্রাণের তারা,
আগামী কালের
প্রদোষ-আঁধারে
ফেলুক কিরণধারা।

৩৫

আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
উদয় হতে অস্তাচলে,
কেঁদে হেসে নানান বেশে
পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
এই ধরণীর ধুলা জুড়ে,
দিন না যেতেই রেখা তাহার
ধুলার সাথে যায় যে উড়ে।

৩৬

ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই।
ঈশ্বরপ্রণামে তবে হাতজোড় হয়
যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয়।

৩৭

ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা
নৃত্যদোলায় দাও দোলা,
বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে—
তরণী হয় পথ-ভোলা।

৩৮

এই যেন ভক্তের মন
বট অশ্বত্থের বন।
রচে তার সমুদার কায়াটি
ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি,
মর্মরে বন্দনমন্ত্র জাগায় রে
বৈরাগী কোন্ সমীরণ।

৩৯

এই সে পরম মূল্য
আমার পূজার—
না পূজা করিলে তবু
শান্তি নাই তার।

৪০

এক যে আছে বুড়ি
জন্মদিনে দিলেম তারে
রঙিন সুরের ঘুড়ি।
পাঠ্যপুঁথির পাতাগুলো
অবাক হয়ে রয়,
বুদ্ধা মেয়ের উধাও চিত্ত
ফেরে আকাশ-ময়।
কণ্ঠে ওঠে গুন্‌গুনিয়ে
সারে গামা পাধা।
গানে গানে জাল বোনা হয়
ম্যাট্রিকের এই বাধা।

৪১

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

৪২

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে।

৪৩

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা,
চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা।

৪৪

'এসো মোর কাছে'
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা
নিবে চ'লে গেল,
মানিল সে আহ্বান।

৪৫

'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, 'যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।'

৪৬

ওড়ার আনন্দে পাখি
শূন্যে দিকে দিকে
বিনা অক্ষরের বাণী
যায় লিখে লিখে।
মন মোর ওড়ে যবে
জাগে তার ধ্বনি,
পাখার আনন্দ সেই
বহিল লেখনী।

৪৭

কঠিন পাথর কাটি
মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা।
অসীমেরে রূপ দিক্‌
জীবনের বাধাময় সীমা।

৪৮

'কথা চাই' 'কথা চাই' হাঁকে
কথার বাজারে;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে
মৌনে ঢাকিয়া রাখো তাকে
মুখর এ হাটের মাঝারে।

৪৯

কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা।

৫০

কল্লোলমুখর দিন
ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে
সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল
পেতে চায় ফল।
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে
চলিছে চঞ্চল।

৫১

কহিল তারা, 'জ্বালিব আলোখানি।
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।'

৫২

কাছে থাকি যবে
ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন
মনে রাখো।

৫৩

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

৫৪

কাঁটার সংখ্যা
ঈর্ষাভরে
ফুল যেন নাহি
গণনা করে।

৫৫

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৫৬

কী পাই, কী জমা করি,
কী দেবে, কে দেবে—
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চ'লে তো যেতেই হবে—
'কী যে দিয়ে যাব'
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো।

৫৭

কী যে কোথা হেথা-হোথা যায় ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যতনে বাঁধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাঁধন যায় রে ফেঁসে,
ধুলায় ভোলার দেশে
যায় গড়াগড়ি—
হায় রে, রয় না তার দাম কড়াকড়ি।

৫৮

কীর্তি যত গড়ে তুলি
ধূলি তারে করে টানাটানি।
গান যদি রেখে যাই
তাহারে রাখেন বীণাপাণি।

৫৯

কুসুমের শোভা
কুসুমের অবসানে
মধুরস হয়ে
লুকায় ফলের প্রাণে।

৬০

কোথায় আকাশ
কোথায় ধূলি
সে কথা পরান
গিয়েছে ভুলি।
তাই ফুল খোঁজে
তারার কোণে,
তারা খুঁজে ফিরে
ফুলের বনে।

৬১

কোন্ খ'সে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি
সুরের অশ্রুধারা।

৬২

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা।

৬৩

ক্ষণকালের গীতি
চিরকালের স্মৃতি।

৬৪

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে
সহসা নির্ঝরিণী
আপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের ক্বচিৎ বিকাশে
বিস্মিত মোর প্রাণ
পায় নিজ সন্ধান।

৬৫

ক্ষুদ্র-আপন-মাঝে
পরম আপন রাজে,
খুলুক দুয়ার তারই।
দেখি আমার ঘরে
চিরদিনের তরে
যে মোর আপনারই।

৬৬

ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ,
রজনী দিবস বহিছে তীরের স্নেহ।
দিকে দিকে যেথা বিপুল জলের দোল
গোপনে সেথায় এনেছে ধরার কোল।
উত্তাল ঢেউ তারা যে দৈত্য-ছেলে
পুত্তলী ভেবে লাফ দেয় বাহু মেলে।
তার হাত হতে বাঁচায়ে আনিলে তুমি,
ভূমির শিশুরে ফিরে পেল পুন ভূমি।

৬৭

গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের
যত ধুলা, যত কালি,
প্রতি উষা দেয় নবীন আশার
আলো দিয়ে প্রক্ষালি।

৬৮

গাছ দেয় ফল
ঋণ ব'লে তাহা নহে।
নিজের সে দান
নিজেরি জীবনে বহে।

পথিক আসিয়া
লয় যদি ফলভার
প্রাপ্যের বেশি
সে সৌভাগ্য তার।

৬৯

গাছগুলি মুছে-ফেলা,
গিরি ছায়া-ছায়া—
মেঘে আর কুয়াশায়
রচে এ কী মায়া।
মুখ-ঢাকা ঝরনার
শুনি আকুলতা—
সব যেন বিধাতার
চুপিচুপি কথা।

৭০

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

৭১

গাছের পাতায় লেখন লেখে
বসন্তে বর্ষায়—
ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী
ধুলায় মিশে যায়।

৭২

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে।

৭৩

গিরিবক্ষ হতে আজি
ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
এনে দিক নবজাগরণ।
মৌন তার ভেঙে যাক,
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক হতে
বাণীর নির্ঝরধারা
প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।

৭৪

গোঁড়ামি সত্যেরে চায়
মুঠায় রাখিতে—
যত জোর করে, সত্য
মরে অলক্ষিতে।

৭৫

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি ভুলে।
ভাবিছ বসে, সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে!

৭৬

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয়গৃহখানি।

৭৭

চলার পথের যত বাধা
পথবিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে
তারি টানে সুর হয় বাঁধা।
রচে যদি দুঃখের ছন্দ
দুঃখের-অতীত আনন্দ
তবেই রাগিণী হবে সাধা।

৭৮

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

৭৯

চলে যাবে সত্তারূপ
সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে,
রেখে যাবে মায়ারূপ
রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

৮০

চাও যদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর আলোতে দেখো,
হোয়ো নাকো অন্ধ।

৮১

চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী
চীন-লণ্ঠন দুলায়ে
চলেছ সাগরপারে।
আমি যে উদাসী একেলা প্রবাসী,
নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে
দূর জানালার ধারে।

৮২

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি,
চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।
মন্ত্রে কালি হল গত,
জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

৮৩

চাষের সময়ে
যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম
ফসল কাটার বেলা।

৮৪

চাহিছ বারে বারে
আপনারে ঢাকিতে—
মন না মানে মানা,
মেলে ডানা আঁখিতে।

৮৫

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার—
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

৮৬

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

৮৭

চোখ হতে চোখে
খেলে কালো বিদ্যুৎ—
হৃদয় পাঠায়
আপন গোপন দূত।

৮৮

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

৮৯

জানার বাঁশি হাতে নিয়ে
না-জানা
বাজান তাঁহার নানা সুরের
বাজানা।

৯০

জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর,
প্রান্তর তব শান্ত,
পর্বত তব কঠিন নিবিড়,
কানন কোমল কান্ত।

৯১

জীবনদেবতা তব
দেহে মনে অন্তরে বাহিরে
আপন পূজার ফুল
আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্যে সৌরভে তারি
অহোরাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি,
এই আমি আশীর্বাদ করি।

৯২

জীবনযাত্রার পথে
ক্লান্তি ভুলি, তরুণ পথিক,
চলো নির্ভীক।
আপন অন্তরে তব
আপন যাত্রার দীপালোক
অনির্বাণ হোক।

৯৩

জীবনরহস্য যায়
মরণরহস্য-মাঝে নামি,
মুখর দিনের আলো
নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

৯৪

জীবনে তব প্রভাত এল
নব-অরুণকান্তি।
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক্
শিশিরে-ধোওয়া শান্তি।
মাধুরী তব মধ্যদিনে
শক্তিরূপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের
করুক দূর ক্লান্তি।

৯৫

জীবনের দীপে তব
আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে
সঞ্চিত করুক জাগরণ।

৯৬

জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা।
আঁধারগহনে রচো
আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো
অমৃতের গীতিকা।

৯৭

ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে
তপ্তবারির স্রোতে—
গোপনে লুকানো অশ্রু কী লাগি
বাহিরিল এ আলোতে।

৯৮

ডালিতে দেখেছি তব
অচেনা কুসুম নব।
দাও মোরে, আমি আমার ভাষায়
বরণ করিয়া লব।

৯৯

ডুবারি যে সে কেবল
ডুব দেয় তলে।
যে জন পারের যাত্রী
সেই ভেসে চলে।

১০০

তপনের পানে চেয়ে
সাগরের ঢেউ
বলে, 'ওই পুতলিরে
এনে দে-না কেউ।'

১০১

তব চিত্তগগনের
দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
পেয়েছে মহিমা।

১০২

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে,
মুছে বারে বারে।

১০৩

তারাগুলি সারারাতি
কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

১০৪

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারি গান।

১০৫

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে—
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

১০৬

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

১০৭

তোমার মঙ্গলকার্য
তব ভৃত্য-পানে
অযাচিত যে প্রেমেরে
ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়,
যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে—
সে তোমারি দান।

১০৮

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে—
অনেক দূরের থেকে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে—
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

১০৯

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু, এই মুখখানি
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

১১০

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল— আজ ভুবনে
আকাশভরা ছুটি।

১১১

দিগন্তে পথিক মেঘ
চ'লে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে।

১১২

দিগ্‌বলয়ে
নব শশীলেখা
টুক্‌রো যেন
মানিকের রেখা।

১১৩

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি, সঙ্গীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমলসাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে—
যেন আমার বিফল রাতের
চেয়ে থাকার স্মৃতি
কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ওই যে ছায়াখানি।

১১৪

দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্মভার।
দিনান্ত ভরিছে তরী রঙিন মায়ায়
আলোয় ছায়ায়।

১১৫

দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন
মহাকাল আছে জাগি—
যাহা নাই কোনোখানে,
যারে কেহ নাহি জানে,
সে অপরিচিত কল্পনাতীত
কোন্ আগামীর লাগি।

১১৬

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।

১১৭

দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে।
দুঃখ সহিবার শক্তি
যেন পাই মনে।

১১৮

দুঃখশিখার প্রদীপ জেবলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

১১৯

দুখের দশা শ্রাবণরাতি—
বাদল না পায় মানা,
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ
ক্ষণহাসির দূত।

১২০

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জবালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

১২১

দোয়াতখানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে।

১২২

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায়।

১২৩

নববর্ষ এল আজি
দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে;
আনে নি আশার বাণী,
দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়।
প্রতিকূল ভাগ্য আসে
হিংস্র বিভীষিকার আকারে;
তখনি সে অকল্যাণ
যখনি তাহারে করি ভয়।
যে জীবন বহিয়াছি
পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা;
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে
শোধ করি তার শেষ দেনা।

১২৪

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পার না তাও,
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও!

১২৫

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণকপোলতলে
রাতের বিদায়চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

১২৬

নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু,
শান্তি তাহা নয়—
যে কর্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয়।

১২৭

নূতন জন্মদিনে

পুরাতনের অন্তরেতে
নূতনে লও চিনে।

১২৮

নূতন যুগের প্রত্যূষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়্
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে।

১২৯

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পুরা।

১৩০

পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি
রবির করের লিখন ধরিবে বলি।
সায়াহ্নে রবি অস্তে নামিবে যবে
সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে।

১৩১

পরিচিত সীমানার
বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে;
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।
সেথাকার বাঁশিরবে
অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে
জানা না-জানার মাঝে
বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে।

১৩২

পশ্চিমে রবির দিন
হলে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পুরবীর গান।

১৩৩

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বন-মাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে।

১৩৪

পায়ে চলার বেগে
পথের বিঘ্ন হরণ-করা
শক্তি উঠুক জেগে।

১৩৫

পাষাণে পাষাণে তব
শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ,
অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের
প্রভাতে সন্ধ্যায়,
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত
অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র,
তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে
রাখিবে কি লিখে—

তব শৃঙ্গশিলাতলে
দুদিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের
আনন্দের মেলা।

১৩৬

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাতি
লেখে নানামতো আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরানে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

১৩৭

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের
আশ্বাস বিপুল।

১৩৮

পেয়েছি যে-সব ধন,
যার মূল্য আছে,
ফেলে যাই পাছে।
যার কোনো মূল্য নাই,
জানিবে না কেও,
তাই থাকে চরম পাথেয়।

১৩৯

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে;
তৃণে তৃণে উষা সাজালো শিশিরকণা।
যারে নিবেদিল তাহারি পিপাসী কিরণে
নিঃশেষ হল রবি-অভ্যর্থনা।

১৪০

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়—
আবার ফুটায়ে তুলে।

১৪১

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক
সুন্দর পরিমলে।
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য
মধুরসে-ভরা ফলে।

১৪২

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে
শুভ্রতম তেজে,
পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে
নানা বর্ণে সেজে।

১৪৩

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

১৪৪

ফাগুন এল দ্বারে,
কেহ যে ঘরে নাই—
পরান ডাকে কারে
ভাবিয়া নাহি পাই।

১৪৫

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ,
ফুলদল পথে করে কীর্ণ।
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

১৪৬

ফুল কোথা থাকে গোপনে,
গন্ধ তাহারে প্রকাশে।
প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,
গান যে তাহারে প্রকাশে।

১৪৭

ফুল ছিঁড়ে লয়
হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে
পাওয়া—

আনমনে তার
পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে
যাওয়া।

যে সেই ধুলার
ফুলে
হার গেঁথে লয়
তুলে
হেলার সে ধন
হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার
চুলে।

শুধায়ো না মোর
গান
কারে করেছিনু
দান—
পথধুলা-'পরে
আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে
মান।

১৪৮

ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।
পাথরে পাথরে লেখা
কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।

১৪৯

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

১৫০

বইল বাতাস,
পাল তবু না জোটে—
ঘাটের শানে
নৌকো মাথা কোটে।

১৫১

'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

১৫২

বড়ো কাজ নিজে বহে
আপনার ভার।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
সান্ত্বনা তাহার।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি,
ছোটো দুঃখ যত—
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
করে কণ্ঠাগত।

১৫৩

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা।

১৫৪

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া।
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

১৫৫

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি;
এ কথাটি মনে জান'—
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান,
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।

সিন্দুকে রহে বন্ধ,
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

১৫৬

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

১৫৭

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,
ফুলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাতির
প্রদীপ হয়েছে জ্বালা।

১৫৮

বসন্ত, দাও আনি,
ফুল জাগাবার বাণী—
তোমার আশায় পাতায় পাতায়
চলিতেছে কানাকানি।

১৫৯

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

১৬০

বসন্ত যে লেখা লেখে
বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র
লেখনীর 'পরে।

১৬১

বসন্তের আসরে ঝড়
যখন ছুটে আসে
মুকুলগুলি না পায় ডর,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়—
ঝড় তো তারি মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়।

১৬২

বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায়।
এই নৃত্যে সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
'ধন্য তুমি' বলে বার বার।

১৬৩

বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন,
ছন্দ সে রয় শক্তিতে,
অর্থ সে রয় ব্যক্তিতে।

১৬৪

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

১৬৫

বাতাস শুধায়, 'বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।'
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।'

১৬৬

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসায়ে ফেলিল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর সে নেই।

১৬৭

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সন্তোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

১৬৮

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ—
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

১৬৯

বাহির হতে বহিয়া আনি
সুখের উপাদান—
আপনা-মাঝে আনন্দের
আপনি সমাধান।

১৭০

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।

১৭১

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে—
কত রূপে রূপে কত-না অলংকারে
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

১৭২

বিকালবেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পুবগগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ।
লক্ষকোটি আলোবছর-পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র-মাঝে
যাত্রা আমার হবে—
অস্তবেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে।

১৭৩

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপিচুপি করে মরমর।

১৭৪

বিদায়রথের ধ্বনি
দূরে হতে ওই আসে কানে।
ছিন্নবন্ধনের শুধু
কোনো শব্দ নাই কোনোখানে।

১৭৫

বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা।
অন্ধ ভক্তি দিনু যবে
করিলেন হেলা।

১৭৬

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি।

১৭৭

বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে।
কুসুমের লেখা তার
বারবার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বারবার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
কিছুতে না ঘোচে।

১৭৮

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল,
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবনতরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

১৭৯

বেছে লব সব-সেরা,
ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে
দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান,
থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই
বেছে লয় মোরে।

১৮০

বেদনা দিবে যত
অবিরত
দিয়ো গো।
তবু এ ম্লান হিয়া
কুড়াইয়া
নিয়ো গো।
যে ফুল আনমনে
উপবনে
তুলিলে
কেন গো হেলাভরে
ধুলা-'পরে
ভুলিলে।
বিঁধিয়া তব হারে
গেঁথো তারে
প্রিয় গো।

১৮১

বেদনার অশ্রু-ঊর্মিগুলি
গহনের তল হতে
রত্ন আনে তুলি।

১৮২

ভজনমন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর,
হে সাধক, মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

১৮৩

ভেসে-যাওয়া ফুল
ধরিতে নারে,
ধরিবারই ঢেউ
ছুটায় তারে।

১৮৪

ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি।
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।

১৮৫

মনের আকাশে তার
দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগি স্বপনপাখি
চলিয়াছে ধেয়ে।

১৮৬

মর্ত্যজীবনের
শুধিব যত ধার
অমরজীবনের
লভিব অধিকার।

১৮৭

মাটিতে দুর্ভাগার
ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি
গাঁথিছে আশা।

১৮৮

মাটিতে মিশিল মাটি,
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

১৮৯

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টকপথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি।

রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।

১৯০

মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যের কোরো না পরাভব।

১৯১

মিছে ডাক'—মন বলে, আজ না—
গেল উৎসবরাতি,
ম্লান হয়ে এল বাতি,
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।
সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিনু এবার,
চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।
শেষ আলো, শেষ গান,
জগতের শেষ দান
নিয়ে যাব—আজ কোনো কাজ না।
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

১৯২

মিলন-সুলগনে,
কেন বল্‌,
নয়ন করে তোর
ছলছল্‌।
বিদায়দিনে যবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি তো
হাসিমুখ।

১৯৩

মুকুলের বক্ষোমাঝে
কুসুম আঁধারে আছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে
প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

১৯৪

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে।

১৯৫

মুহূর্ত মিলায়ে যায়
তবু ইচ্ছা করে—
আপন স্বাক্ষর রবে
যুগে যুগান্তরে।

১৯৬

মৃতেরে যতই করি স্ফীত
পারি না করিতে সঞ্জীবিত।

১৯৭

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে,
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।

১৯৮

মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃতলোকে
মৃত্যু করে জয়।

১৯৯

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

২০০

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি একরোখে।
দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে—
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

২০১

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর-আকাশে-আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

২০২

যা পায় সকলই জমা করে,
প্রাণের এ লীলা রাত্রিদিন।
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সকলই শূন্যেতে হয় লীন।

২০৩

যা রাখি আমার তরে
মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে
সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে
সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে,
রাখে তারে সবে।

২০৪

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ।
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

২০৫

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

২০৬

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

২০৭

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

২০৮

যে ছবিতে ফোটে নাই
সবগুলি রেখা
সেও তো, হে শিল্পী, তব
নিজ হাতে লেখা।
অনেক মুকুল ঝরে,
না পায় গৌরব—
তারাও রচিছে তব
বসন্ত-উৎসব।

২০৯

যে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্য মনে পথিক দেখে তারে।
সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

২১০

যে তারা আমার তারা
সে নাকি কখন্‌ ভোরে
আকাশ হইতে নেমে
খুঁজিতে এসেছে মোরে।
শত শত যুগ ধরি
আলোকের পথ ঘুরে
আজ সে না জানি কোথা
ধরার গোধূলিপুরে।

২১১

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

২১২

যে বন্ধুরে আজও দেখি নাই
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই।

২১৩

যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি,
পরানের তলে
স্বপনতিমিরতটে
তারা হয়ে জ্বলে।

২১৪

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।

২১৫

যে যায় তাহারে আর
ফিরে ডাকা বৃথা।
অশ্রুজলে স্মৃতি তার
হোক পল্লবিতা।

২১৬

যে রত্ন সবার সেরা
তাহারে খুঁজিয়া ফেরা
ব্যর্থ অন্বেষণ।
কেহ নাহি জানে, কিসে
ধরা দেয় আপনি সে
এলে শুভক্ষণ।

২১৭

রজনী প্রভাত হল—
পাখি, ওঠো জাগি,
আলোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি।

২১৮

রাখি যাহা তার বোঝা
কাঁধে চেপে রহে।
দিই যাহা তার ভার
চরাচর বহে।

২১৯

রাতের বাদল মাতে
তমালের শাখে;
পাখির বাসায় এসে
'জাগো জাগো' ডাকে।

২২০

রূপে ও অরূপে গাঁথা
এ ভুবনখানি—
ভাব তারে সুর দেয়,
সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা
নিত্য কানাকানি।

২২১

লুকায়ে আছেন যিনি
জীবনের মাঝে
আমি তাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে।

২২২

লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি
কি স্মরণমুরতি রচিলে ধূলি—
দূর ফাগুনের কোন্ চরণের
সুকোমল অঙ্গুলি!

২২৩

লেখে স্বর্গে মর্ত্যে মিলে
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক,
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি।

২২৪

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

২২৫

শিকড় ভাবে, 'সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা।'

২২৬

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে।

২২৭

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি—
পালায় ঘোমটা টানি।

২২৮

শেষ বসন্তরাত্রে
যৌবনরস রিক্ত করিনু
বিরহবেদনপাত্রে।

২২৯

শ্যামল ঘন বকুলবন-
ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর বাজে মধুর
পায়ে পায়ে।

২৩০

শ্রাবণের কালো ছায়া
নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌ললনার
গলিত-কাজল-বরিষনে।

২৩১

সখার কাছেতে প্রেম
চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি
চাহে শয়তান।

২৩২

সংসারেতে দারুণ ব্যথা
লাগায় যখন প্রাণে
'আমি যে নাই' এই কথাটাই
মনটা যেন জানে।
যে আছে সে সকল কালের,
এ কাল হতে ভিন্ন—
তাহার গায়ে লাগে না তো
কোনো ক্ষতের চিহ্ন।

২৩৩

সত্যেরে যে জানে, তারে
সগর্বে ভাণ্ডারে রাখে ভরি।
সত্যেরে যে ভালোবাসে
বিনম্র অন্তরে রাখে ধরি।

২৩৪

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথচাওয়া নয়নের বাণী।

২৩৫

সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়
নাম সই ক'রে।
লেখা তার মুছে যায়,
মেঘ যায় সরে।

২৩৬
সফলতা লভি যবে
মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার
অক্ষমতা যত।

২৩৭
সব-কিছু জড়ো ক'রে
সব নাহি পাই।
যারই মাঝে সত্য আছে
সব যে সেথাই।

২৩৮
সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

২৩৯
সময় আসন্ন হলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের
আনন্দের আশা রাখিলাম
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

২৪০
সারা রাত তারা
যতই জ্বলে
রেখা নাহি রাখে
আকাশতলে।

২৪১
সিন্ধুপারে গেলেন যাত্রী,
ঘরে বাইরে দিবারাত্রি
আস্ফালনে হলেন দেশের মুখ্য।
বোঝা তাঁর ওই উষ্ট্র বইল,
মরুর শুষ্ক পথে সইল
নীরবে তার বন্ধন আর দুঃখ।

২৪২

সুখেতে আসক্তি যার
আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্যের তারে
বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

২৪৩

সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে
মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া
সোনার খেয়ালে।

২৪৪

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই।

২৪৫

সেই আমাদের দেশের পদ্ম
তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে
অন্য সুদূর দেশে।

২৪৬

সেতারের তারে
ধানশি
মীড়ে মীড়ে উঠে
বাজিয়া।
গোধূলির রাগে
মানসী
সুরে যেন এল
সাজিয়া।

২৪৭

সোনায় রাঙায় মাখামাখি,
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি
পথিক রবির স্বপন ঘিরে।
পেরোয় যখন তিমিরনদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে।
অস্ত-উদয়-রথে-রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি।

পায় সে ফিরে মেঘের কোণে,
পায় ফাগুনের পারুলবনে
প্রতিদানের রঙের ডালি।

২৪৮

স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য, যা রহে না জেগে,
ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।
যে নদীর ক্লান্তি ঘটে মধ্যপথে সিন্ধু-অভিসারে
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
নির্জীব আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি।
পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে,
জানে না সে আঁধারে মিশিতে।

২৪৯

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।

২৫০

স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত
আকাশেরে ঢাকে,
আকাশ তাহার কোনো
চিহ্ন নাহি রাখে।
তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে
হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে
দেয় ফুলে ফলে।

২৫১

স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা।

২৫২

হাসিমুখে শুকতারা
লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী
আঁধারের শেষপাতে।

২৫৩

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী
রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।

২৫৪

হে উষা, নিঃশব্দে এসো,
আকাশের তিমিরগুণ্ঠন
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে
মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও,
জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি-তামসের
মোহযবনিকা, হে আত্মন্,
করো উন্মোচন।

২৫৫

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
'ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।

২৫৬

হে পাখি, চলেছ ছাড়ি
তব এ পারের বাসা,
ও পারে দিয়েছ পাড়ি—
কোন্ সে নীড়ের আশা?

২৫৭

হে প্রিয়, দুঃখের বেশে
আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ ব'লে
চিনি সেই ক্ষণে।

২৫৮

হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুসুমে ডালে,
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে।

২৫৯

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার—
মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।

২৬০

হেলাভরে ধুলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো।
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধুলো।

শীত

অঘ্রান হ'ল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর-তালে-তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

ও পারে চরের মাঠে
কৃষাণেরা ধান কাটে,
কাস্তে চালায় নতশিরে।
নদীতে উজান-মুখে
মাস্তুল পড়ে ঝুঁকে,
গুণ-টানা তরী চলে ধীরে।

পল্লীর পথে মেয়ে
ঘাট থেকে আসে নেয়ে,
ভিজে চুল লুণ্ঠিত পিঠে।
উত্তর-বায়ু-ভরে
বক্ষে কাঁপন ধরে,
রোদ্দুর লাগে তাই মিঠে।

শুক্‌নো খালের তলে
এক-হাঁটু ডোবা-জলে
বাগ্‌দিনি শেওলায় পাঁকে
করে জল ঘাঁটাঘাঁটি
কক্ষে আঁচল আঁটি—
মাছ ধ'রে চুব্‌ড়িতে রাখে।

ডাঙায় ঘাটের কাছে
ভাঙা নৌকোটা আছে—
তারি 'পরে মোক্ষদা বুড়ি
মাথা ঢুলে পড়ে বুকে
রৌদ্র পোহায় সুখে
জীর্ণ কাঁথাটা দিয়ে মুড়ি।

আজি বাবুদের বাড়ি
শ্রাদ্ধের ঘটা ভারি,
ডেকেছেন আশু জন্দার।
হাতে কঞ্চির ছড়ি
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ি
চলে তাই কালু সর্দার।

বউ যায় চৌগাঁয়ে,
ঝি-বুড়ি চলেছে বাঁয়ে,
পাল্‌কি কাপড়ে আছে ঘেরা।
বেলা ওই যায় বেড়ে
হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে,
হন্‌-হন্‌ ছোটে বাহকেরা।

শ্রান্ত হয়েছে দিন,
আলো হয়ে এল ক্ষীণ,
কালো ছায়া পড়ে দিঘি-জলে।
শীত-হাওয়া জেগে ওঠে,
ধেনু ফিরে যায় গোঠে,
বকগুলো কোথা উড়ে চলে।

আখের খেতের আড়ে
পদ্মপুকুর-পাড়ে
সূর্য নামিয়া গেল ক্রমে।
হিমে-ঘোলা বাতাসেতে
কালো আবরণ পেতে
খড়-জ্বালা ধোঁয়া ওঠে জ'মে।

ঝোড়ো রাত

ঢেউ উঠেছে জলে,
হাওয়ায় বাড়ে বেগ।
ওই-যে ছুটে চলে
গগন-তলে মেঘ।
মাঠের গোরুগুলো
উড়িয়ে চলে ধুলো,
আকাশে চায় মাঝি
মনেতে উদ্‌বেগ।

নামল ঝোড়ো রাতি,
দৌড়ে চলে ভুতো।
মাথায় ভাঙা ছাতি,
বগলে তার জ়ুতো।
ঘাটের গলি-'পরে
শুকনো পাতা ঝরে,
কল্‌সি কাঁখে নিয়ে
মেয়েরা যায় দ্রুত।

ঘণ্টা গোরুর গলে
বাজিছে ঠন্‌ ঠন্‌।
নীচে গাড়ির তলে
ঝুলিছে লণ্ঠন।
যাবে অনেক দূরে
বেণীমাধব-পুরে—
ডাইনে চাষের মাঠ,
বাঁয়ে বাঁশের বন।

পশ্চিমে মেঘ ডাকে,
ঝাউয়ের মাথা দোলে।
কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে
বক উড়ে যায় চ'লে।
বিদ্যুৎকম্পনে
দেখছি ক্ষণে ক্ষণে
মন্দিরের ওই চূড়া
অন্ধকারের কোলে।

গৃহস্থ কে ঘরে,
খোলো দুয়ারখানা।
পান্থ পথের 'পরে,
পথ নাহি তার জানা।
নামে বাদল-ধারা,
লুপ্ত চন্দ্র তারা,
বাতাস থেকে থেকে
আকাশকে দেয় হানা।

পৌষ-মেলা

শীতের দিনে নামল বাদল,
বসল তবু মেলা।
বিকেল বেলায় ভিড় জমেছে,
ভাঙল সকাল বেলা।

পথে দেখি দু-তিন-টুকরো
কাঁচের চুড়ি রাঙা,
তারি সঙ্গে চিত্র-করা
মাটির পাত্র ভাঙা।

সন্ধ্যা বেলার খুশিটুকু
সকাল বেলার কাঁদা
রইল হোথায় নীরব হয়ে,
কাদায় হল কাদা।

পয়সা দিয়ে কিনেছিল
মাটির যে ধনগুলা
সেইটুকু সুখ বিনি পয়সায়
ফিরিয়ে নিল ধুলা।

উৎসব

দুন্দুভি বেজে ওঠে
ডিম্‌-ডিম্‌ রবে,
সাঁওতাল-পল্লীতে
উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের
জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা
তন্দ্রা হারায়।

তাল-গাছে তাল-গাছে
পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে
কল্লোলময়।
আম্রের মঞ্জরী
গন্ধ বিলায়,
চম্পার সৌরভ
শূন্যে মিলায়।

দান করে কুসুমিত
কিংশুকবন
সাঁওতাল-কন্যার
কর্ণভূষণ।
অতিদূর প্রান্তরে
শৈলচূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক-
পতাকা উড়ায়।

ওই শুনি পথে পথে
হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে
বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের
হাস্যের রোল
অম্বরতলে দিল
উল্লাসদোল।

ধীরে ধীরে শর্বরী
হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের
প্রত্যুষগান।
বনচূড়া রঞ্জিল
স্বর্ণলেখায়
পূর্বদিগন্তের
প্রান্তরেখায়।

ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায়।

স্পন্দিত নদীজল
ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি
বালুকার চরে।

নৌকা ডাঙায় বাঁধা,
কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমারাত্রির
মত্ততা লাগে।

খেয়াঘাটে ওঠে গান
অশ্বত্থতলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি
আনমনে চলে।
ধায় সে বংশীরব
বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর
পার হয়ে যায়।

দূরে কোন্ শয্যায়
একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে
ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে,
রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্নাসমুদ্রের
তরী যেন চাঁদ।

চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে
সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে
ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়,
পাখি জাগে বনে—
চাঁদের তরণী ঠেকে
ধরণীর কোণে।

তপস্যা

সূর্য চলেন ধীরে
সন্ন্যাসীবেশে
পশ্চিম নদীতীরে
সন্ধ্যার দেশে
বনপথে প্রান্তরে
লুণ্ঠিত করি

গৈরিক গোধূলির
　　　　ম্লান উত্তরী।
পিঠে লুটে পিঙ্গল
　　　　মেঘ জটাজুট,
শূন্যে চূর্ণ হ'ল
　　　　স্বর্ণমুকুট।

অন্তিম আলো তাঁর
　　　　ওই তো হারায়
রক্তিম গগনের
　　　　শেষ কিনারায়—

সুদূর বনান্তের
　　　　অঞ্জলি-'পরে
দক্ষিণা দিয়ে যান
　　　　দক্ষিণ করে।
ক্লান্ত পক্ষীদল
　　　　গান নাহি গায়,
নীড়ে-ফেরা কাক শুধু
　　　　ডাক দিয়ে যায়।
রজনীগন্ধা শুধু
　　　　রচে উপহার
যাত্রার পথে আনি
　　　　অর্ঘ্য তাহার।

অন্ধকারের গুহা
　　　　সংগীতহীন,
হে তাপস, লীলা তব
　　　　সেথা হ'ল লীন।
নিঃস্ব তিমিরঘন
　　　　এই সন্ধ্যায়
জানি না বসিবে তুমি
　　　　কী তপস্যায়।

রাত্রি হইবে শেষ,
　　　　উষা আসি ধীরে
দ্বার খুলি দিবে তব
　　　　ধ্যানমন্দিরে।

জাগিবে শক্তি তব
নব উৎসবে,
রিক্ত করিল যাহা
পূর্ণ তা হবে।
ডুবায়ে তিমিরতলে
পুরাতন দিন
হে রবি, করিবে তারে
নিত্য নবীন।

উড়ো জাহাজ

ওরে যন্ত্রের পাখি,
ওরে রে আগুন-খাকী,
একি ডানা মেলি আকাশেতে এলি,
কোন্ নামে তোরে ডাকি?

কোন্ রাক্ষুসে চিলে
কী বিকট হাড়গিলে
পেড়েছিল ডিম প্রকাণ্ড ভীম,
তোরে সে জন্ম দিলে।

কোন্ বটে, কোন্ শালে,
কোন্ সে লোহার ডালে,
কিরকম গাছে তোর বাসা আছে
দেখি নি তো কোনো কালে।

যখন ভ্রমণ কর
গান কেন নাহি ধর—
কোন্ ভূতে হায় চাবুক কষায়,
গোঁ গোঁ ক'রে ক'রে মর।

তোমার ও দুটো ডানা
মানুষের পোষ-মানা—
কলের খাঁচায় তোমারে নাচায়,
তুমি বোবা, তুমি কানা।

হায় রে একি অদৃষ্ট,
কিছুই তো নহে মিষ্ট—
মানুষের সাথ থাক দিন রাত,
নাহি বল রাধাকৃষ্ট।

যত হও নাকো বড়ো,
দাঁত কর কড়োমড়ো—
তবু ভয়ে তোর লাগিবে না ঘোর,
হব নাকো জড়োসড়ো।

মানুষেরে পিঠে ধরি
ঘোর দিবা-বিভাবরী—
আমরা দোয়েল পাপিয়া কোয়েল
দূর হতে গড় করি।

ছবি-আঁকিয়ে

ছেঁড়াখোঁড়া মোর পুরোনো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যক্ষনি ছুটি পাই।
বঙ্কিম মামা বুঝিতে পারে না—
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা;
বলে, কী হয়েছে, ছাই!

আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডক বনে যাবেন যে চ'লে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই-যে পাহাড়,
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়,
হেথা সিংহের বাসা।
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে,
নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।
ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবঠাকুরের রান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।
সাদা কাগজের চর করে ধু ধু,
সাদা হাঁস দুটো ব'সে আছে শুধু,
কেউ কোথাও নেই।
গোল ক'রে আঁকা এই দেখো দিখি,

সূর্যের ছবি ঠিক হয় নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালি লেপা দেখিছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এইখানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যার মতো।
আমি তো স্পষ্ট দেখি সব-কিছু—
শালবন দেখো এই উঁচুনিচু,
মাছগুলো দেখো জলে।

'ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে—
দোষ আছে তোর মামারই দু চোখে'
বাবা এই কথা বলে।

চিত্রকূট

একটুখানি জায়গা ছিল
রান্নাঘরের পাশে,
সেইখানে মোর খেলা হ'ত
শুক্‌নো-পারা ঘাসে।
একটা ছিল ছাইয়ের গাদা
মস্ত ঢিবির মতো,
পোড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে
সাজিয়েছিলেম কত।
কেউ জানে না সেইটে আমার
পাহাড় মিছিমিছি,
তারই তলায় পুঁতেছিলেম
একটি তেঁতুল-বিচি।
জন্মদিনের ঘটা ছিল,
ছয় বছরের ছেলে—
সেদিন দিল আমার গাছে
প্রথম পাতা মেলে।
চার দিকে তার পাঁচিল দিলেম
কেরোসিনের টিনে,
সকাল বিকাল জল দিয়েছি
দিনের পরে দিনে।
জল-খাবারের অংশ আমার
এনে দিতেম তাকে,
কিন্তু তাহার অনেকখানিই
লুকিয়ে খেত কাকে।

দুধ বা বাকি থাকত দিতেম
জানত না কেউ সে তো—
পিঁপড়ে খেত কিছুটা তার,
গাছ কিছু বা খেত।

চিকন পাতায় ছেয়ে গেল,
ডাল দিল সে পেতে—
মাথায় আমার সমান হল
দুই বছর না যেতে।
একটি মাত্র গাছ সে আমার
একটুকু সেই কোণ,
চিত্রকূটের পাহাড়-তলায়
সেই হল মোর বন।
কেউ জানে না সেথায় থাকেন
অষ্টাবক্র মুনি—
মাটির 'পরে দাড়ি গড়ায়,
কথা কন না উনি।
রাত্রে শুয়ে বিছানাতে
শুনতে পেতেম কানে
রাক্ষসেরা পেঁচার মতো
চেঁচাত সেইখানে।

নয় বছরের জন্মদিনে
তার তলে শেষ খেলা,
ডালে দিলুম ফুলের মালা
সেদিন সকাল-বেলা।
বাবা গেলেন মুন্‌শিগঞ্জে
রানাঘাটের থেকে,
কোল্‌কাতাতে আমায় দিলেন
পিসির কাছে রেখে।
রাত্রে যখন শুই বিছানায়
পড়ে আমার মনে
সেই তেঁতুলের গাছটি আমার
আঁস্তাকুড়ের কোণে।
আর সেখানে নেই তপোবন,
বয় না সুরধুনী—
অনেক দূরে চ'লে গেছেন
অষ্টাবক্র মুনি।

চলন্ত কলিকাতা

ইঁটের টোপর মাথায় পরা
শহর কলিকাতা
অটল হয়ে ব'সে আছে,
ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়,
না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে
ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে
একটু না দেয় কাঁপন।
শীত বসন্তে সমান ভাবে
করে ঋতুযাপন।

অনেক দিনের কথা হ'ল
স্বপ্নে দেখেছিনু
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে
বললে আমায় বিনু
'চেয়ে দেখো', ছুটে দেখি
চৌকিখানা ছেড়ে—
কোল্‌কাতাটা চ'লে বেড়ায়
ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে
পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হ'য়ে
চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি
অজগরের দল,
ট্র্যাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে
করছে টলোমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে
যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গীর মাঠখানা ওই
যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেন্টে লেগেছে দোল,
উল্‌টিয়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো
ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

ইস্কুলেতে ছেলেরা সব
করতেছে হৈ হৈ,
অঙ্কের বই নৃত্য করে
ব্যাকরণের বই।
মেঝের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায়
ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপগুলো সব পাখির মতো
ঝাপট মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে
ঢঙ্ ঢঙা ঢঙ্ বাজে—
দিন চ'লে যায়, কিছুতে সে
থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে
রান্নাঘরের ঝি,
'লাউ কুম্ড়ো দৌড়ে বেড়ায়,
আমি করব কী!'

হাজার হাজার মানুষ চেঁচায়
'আরে, থামো থামো—
কোথা যেতে কোথায় যাবে,
কেমন এ পাগ্লামো!'

'আরে আরে, চলল কোথায়'
হাব্ড়ার ব্রিজ বলে,
'একটুকু আর নড়লে আমি
পড়ব খ'সে জলে।'
বড়োবাজার মেছোবাজার
চিনেবাজার থেকে—
'স্থির হয়ে রও' 'স্থির হয়ে রও'
বলে সবাই হেঁকে।
আমি ভাবছি যাক্-না কেন,
ভাব্না কিছুই নাই—
কোল্কাতা নয় দিল্লি যাবে
কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হ'ল,
তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি কোল্কাতা সেই
আছে কোল্কাতায়।

হনুচরিত

হনু বলে, তুলব আমি গন্ধমাদন,
অসাধ্য যা তাই জগতে করব সাধন।
এই ব'লে তার প্রকাণ্ড কায় উঠল ফুলে।

মাথাটা তার কোথায় গিয়ে ঠেকল মেঘে,
শালের গুঁড়ি ভাঙল পায়ের ধাক্কা লেগে,
দশটা পাহাড় ঢাকল তাহার দশ আঙুলে।
পড়ল বিপুল দেহের ছায়া যে দিক বাগে
দুপুর বেলায় সেথায় যেন সন্ধ্যা লাগে,
গোরু যত মাঠ ছেড়ে সব গোষ্ঠে ছোটে।
সেই দিকেতে সূর্যহারা আকাশ-তলে
দিন না যেতেই অন্ধকারের তারা জ্বলে,
শেয়ালগুলো হুক্কাহুয়া চেঁচিয়ে ওঠে।
লেজ বেড়ে যায় হু হু ক'রে এঁকে বেঁকে,
লেজের মধ্যে বন্যা নামল কোথা থেকে,
নগর পল্লী তলায় তাহার চাপা পড়ে।
হঠাৎ কখন্ মস্ত মোটা লেজের বাধায়
নদীর স্রোতের মধ্যখানে বাঁধ বেঁধে যায়,
উপড়ে পড়ে দেবদারুবন লেজের ঝড়ে।
লেজের পাকে পাহাড়টাকে দিল মোড়া,
ঝেঁকে ঝেঁকে উঠল কেঁপে আগাগোড়া,
দুড়্‌দাড়িয়ে পাথর পড়ে খ'সে খ'সে।
গিরির চূড়া এক পাশেতে পড়ল ঝুঁকি,
অরণ্যে হয় গাছে গাছে ঠোকাঠুকি,
আগুন লাগে শাখায় শাখায় ঘ'ষে ঘ'ষে।
পক্ষী সবে আর্তরবে বেড়ায় উড়ে,
বাঘ-ভালুকের ছুটোছুটি পাহাড় জুড়ে,
ঝর্নাধারা ছড়িয়ে গেল ঝর্‌ঝরিয়ে।
উপুড় হয়ে গন্ধমাদন পড়ল লুটে,
বসুন্ধরার পাষাণ-বাঁধন যায় রে টুটে।
ভীষণ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত থর্‌থরিয়ে
ঘূর্ণিধুলা নৃত্য করে অম্বরেতে,
ঝঞ্ঝাহাওয়া হুংকারিয়া বেড়ায় মেতে,
ধূসর রাত্রি লাগল যেন দিগ্‌বিদিকে।

গন্ধমাদন উড়ল হনুর পৃষ্ঠে চেপে,
লাগল হনুর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে-
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝিকিমিকে।

পাঙ্‌চুয়াল

গতকাল পাঁচটায়
তেলে ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে,
ছিল সাথে ছেঁচ্‌কি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে—
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
আর ওঠে হেঁচ্‌কি।
মহা রোষে তিনুরায়
যেতে চায় আগ্‌রায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাই মেলে
ভোরে উঠে তাই আজ
হাওড়ায় চলল।

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো—
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার!

২

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

৩

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

৪

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

৫

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে,
পূজে যাঁরে দেবতা সকল,
অমৃত যাঁহার ছায়া,
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

এই-সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাঁহার এই
নদী-সাথে মহাপারাবার,
দশ দিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়,
যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

সত্যধর্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন, না করুন পিতা!
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

পাঠান্তর

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর; এই সর্ব দিক্ যাঁর বাহু;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ; সূর্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা,
আমাদের না করুন নাশ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

৬

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি
এসেছি পাপের কূলে—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া করে লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি।

৭

হে বরুণদেব,
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ ক'রে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।

৮

হে বরুণ, তুমি দূর করো হে, দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান্, ওহে সম্রাট্, মোরে যেন দয়া হয়।
বাঁধন-ঘুচানো বৎসের মতো ঘুচাও পাপের দায়—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায়!

বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব, যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিয়ো না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর প্রাণ।

তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত, আজও করি তব গান—
আগামী কালেও, সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান।
হে অপরাজিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত
স্খলনবিহীন রয়েছে অটল পর্বতে-আশ্রিত।

ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিজে করেছি যে পাপ!
অন্যের কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ!
বহু উষা আজও হয় নি উদিত, সে-সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে॥

৯

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর,
সব দেবতার পরমদেব,
সকল পতির পরমপতি,
সব পরমের পরাৎপর।
তাঁরে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
তিনি ভুবনেশ্বর।
কর্ম-বাঁধনে নহেন বাঁধা,
বাঁধে না তাঁহারে দেহ—
সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
বড়ো নাই নাই কেহ।
তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
প্রকাশে জলে স্থলে—
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
আপনা-আপনি চলে।
জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
কলেবর নাই কভু—

তিনিই কারণ, মনের চালন—
নাই পিতা, নাই প্রভু।
ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে,
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা।

১০

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের,
তিনি প্রভু নিখিল জনার—
আপনিই প্রভু আপনার।
বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি,
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।

১১

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
ঊর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।

১২

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

১৩

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?'
তিনি বললেন, 'জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি;
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।'
তিনি বললেন, 'সৌম্য, কী গোত্র তুমি?'
সে বললে, 'আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন— যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।'

তিনি তখন বললেন, 'এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।'

১৪

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে

পাথায় ভূমিরে হানে,
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

১৫

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

১৬

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত,
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।

১৭

যেমন আমি
সর্বসহা শক্তিমতী,
তেমনি হও
সর্বসহ আমার প্রতি।
আপন পথে
যেমন হয় জলের গতি,
তোমার মন
আসুক ধেয়ে আমার প্রতি।

ধম্মপদ

যুগ্মগাথা

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে॥ ১

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
সুখ তার পাছে ফিরে ছায়া যথা কায়ার পিছনে॥ ২

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলই বাড়িল॥ ৩

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল॥ ৪

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয়॥ ৫

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে॥ ৬

শরীরের শোভা খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত,
ভোজনে রাখে না মাত্রা বীর্যহীন অলস সতত,
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে 'মার' তারে মারে সেইমতো॥ ৭

অঙ্গশোভা নাহি খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত,
ভোজনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিয়ত,
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মতো॥ ৮

দমহীন, সত্যহীন, অন্তরে কামনা,
গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা॥ ৯

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে॥ ১০

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার॥ ১১

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য সংকল্পের কাছে সার মিলে তার॥ ১২

ভালো ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে,
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে॥ ১৩

ভালো ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা,
সতর্ক যে মন তারে কী করে বাসনা॥ ১৪

হেথা মরে শোকে, সেথা মরে শোকে,
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে—
ব্যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে॥ ১৫

হেথা সুখ তার, সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায় বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার॥ ১৬

হেথা পায় তাপ, সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ।
'এই মোর পাপ' এই ব'লে তাপ,
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ॥ ১৭

হেথা আনন্দ, সেথা আনন্দ,
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত।
'পুণ্য করেছি' ব'লে আনন্দ,
সুগতি লভিয়া পরমানন্দ॥ ১৮

যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন,
কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি—
অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল
হয় কি সেজন শ্রেয়ের ভাগী॥ ১৯

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য,
ধর্মের পথে করে বিচরণ
রাগ দোষ মোহ করি পরিহার,
জ্ঞানসমাপ্ত বিমুক্তমন—
বিষয়বিহীন ইহপরলোকে
কল্যাণভাগী হয় সেইজন॥ ২০

অপ্রমাদবর্গ

অপ্রমাদ অমৃতের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ—
অপ্রমত্ত নাহি মরে, প্রমত্ত সে মৃতবৎ॥ ১

অপ্রমাদ কারে বলে পণ্ডিত তা মনে রাখি
অপ্রমাদে সুখে রন জ্ঞানীর গোচরে থাকি॥ ২

ধ্যাননিষ্ঠ ধীরগণ নিত্য দৃঢ়পরাক্রম
নির্বাণ করেন লাভ যোগক্ষেম মহোত্তম॥ ৩

স্মৃতিমান, শুচিকর্ম, সাবধান, জাগ্রত, সংযত,
ধর্মজীবী, অপ্রমত্ত— যশ তাঁর বেড়ে যায় কত॥ ৪

জাগরণে অপ্রমাদে সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে
মেধাবী রচেন দ্বীপ, বন্যা ঠেকে যায় তার তীরে॥ ৫

মূঢ় সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের ফাঁদ,
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ॥ ৬

মোজো না প্রমাদে পড়ি, ভজনা কোরো না কামরতি—
বহুসুখ পান তিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানে যাঁর মতি॥ ৭

জ্ঞানী অপ্রমাদবলে প্রমাদেরে ফেলি দিয়া দূরে
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাতুরে,
গিরি হতে ধীর যথা দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে॥ ৮

অমত্ত জাগ্রত ধায়, সুপ্ত মত্তজনে
পড়ে থাকে নীচে—
দ্রুত অশ্ব যেইমত দুর্বল অশ্বেরে
ফেলে যায় পিছে॥ ৯

অপ্রমাদে ইন্দ্রদেব হয়েছেন দেবতার সেরা—
অপ্রমাদে তুষে সবে. প্রমাদে দুষেন পণ্ডিতেরা॥ ১০

প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধ যত॥ ১১

অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায়
ভ্রষ্ট নাহি হয় কভু— নির্বাণের কাছে যায়॥ ১২

চিত্তবর্গ

যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে রাখা দায়,
মেধাবী তারে করেন সিধা ইষুকারের তীরের প্রায়॥ ১

এই-যে চিত্ত আকুল নিত্য মারের বাঁধন কাটিতে—
জলের পদ্ম কে যেন সদ্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে॥ ২

চপল লঘু অবশ চিত্ত যেখানে খুশি পড়ে—
সুখে সে রহে, এমন মন দমন যেবা করে॥ ৩

নহে সে সোজা, যায় না বোঝা, যেখানে খুশি ধায়,
মেধাবী তারে রক্ষা করে তবেই সুখ পায়॥ ৪

দূরে যায়, একা চরে, অশরীর থাকে সে গুহায়—
হেন মন বশে রাখে মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায়॥ ৫

অস্থির যাহার চিত্ত সত্যধর্ম হতে আছে দূরে,
হৃদয় প্রসাদহীন— প্রজ্ঞা তার কভু নাহি পূরে॥ ৬

বাসনাবিমুক্ত চিত্ত অচঞ্চল পুণ্যপাপহীন—
কোনো ভয় নাহি তার জাগিয়া সে রহে যত দিন॥ ৭

কুম্ভের মতো জানিয়া শরীর নগরের মতো বাঁধিয়া চিত্ত
প্রজ্ঞা-অস্ত্রে মারিবে মরণে, নিজেরে যতনে বাঁচাবে নিত্য॥ ৮

অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছ জড় কাঠি
মাটিতে পড়িয়া হায় হয়ে যায় মাটি॥ ৯

শত্রু সে শত্রুতা করে যত, যত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী—
মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন আপনার ক্ষতি করে বেশি॥ ১০

মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুজন যত তার করে উপকার—
সত্যে যার বাঁধা আছে মন বেশি শ্রেয় করে আপনার॥ ১১

পুষ্পবর্গ

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন—
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন॥ ১

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকেতন,
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন॥ ২

ফেনের মতন জানিয়া শরীর, মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে,
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা রে॥ ৩

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সুপ্তপল্লী মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয়॥ ৪

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পুরিতে তার তৃষা বাসনার মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়॥ ৫

বরন-সুবাস না করিয়া হানি
ভ্রমর যেমন ফুলেরস টানি
যায় সে উড়ে,
সেইমত যত জ্ঞানীমুনিজন
সংসারমাঝে করি বিচরণ
পালান দূরে॥ ৬

পর কী বলেছে কঠিন বচন পর কী করে বা না করে—
তাহে কাজ নাই, তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখো রে॥ ৭

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে॥ ৮

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম বাণী কাজে খাটাইলে তাকে॥ ৯

ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিবিধ কুশলকর্ম রচনা করিবে নর॥ ১০

মহাভারত। মনুসংহিতা

১

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো॥

২

সুখ বা হোক দুখ বা হোক,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করি নিয়ো॥

পাঠান্তর

ক

সুখ হোক দুঃখ হোক,
প্রিয় হোক অথবা অপ্রিয়,
যা পাও অপরাজিত
হৃদয়ে বহন করি নিয়ো॥

খ

আসুক সুখ বা দুঃখ,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
বিনা পরাজয়ে তারে
বরণ করিয়ো॥

৩

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই,
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অদ্যই।
জানি তার আবর্তন অতি ধীরে ধীরে
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরে॥

আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি,
পুত্র বা পৌত্রেও তাহা ফলে নিরবধি।
এ কথা নিশ্চিত জেনো অধর্ম যে করে
নিষ্ফল হয় না কভু কালে কালান্তরে॥

আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা,
অধর্মেই আপনার ভালো দেখে তারা।
এ পথেই শত্রুদের পরাজয় করে,
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে॥

কালিদাস-ভবভূতি

মদনদহন

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিকবালা হেরিয়া তাহাই
ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস॥ ২৫
অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ॥ ২৬
নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
ভ্রমর-অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত॥ ২৭
মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ।
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে॥ ২৮
মর্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়ালমঞ্জরী হতে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল॥ ৩১
যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী॥ ৩৫
একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শনিমীলিতচক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর॥ ৩৬
আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে॥ ৩৭
পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আঁখি
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন॥ ৩৮
কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে॥ ৩৯
লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সংকেত॥ ৪১
[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
... হইল মূক, শান্ত হল মৃগ

… … … কাঁপিল সংকেতে॥ ৪২
নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন॥ ৪৩
দেখিল সে—মহাদেব শার্দুল-আসনে
দেবদারুবেদী-'পরে আছেন বসিয়া॥ ৪৪
উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন॥ ৪৫
বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায়॥ ৪৬
ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা,
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিস্পন্দ,
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার
বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ॥ ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভস্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মতো
নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নি-শিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধেয়ানে নিমগ্ন॥ ৪৮
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
কপালের শশধরে করিয়া মলিন॥ ৪৯
মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক॥ ৫১
হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
হেরি সে অতুলরূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার॥ ৫২
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোককুসুম
কনকবরন জিনি কর্ণিকার ফুল
মুক্তাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আরণ্য বসন্তফুলে… … …
… … … … … … …॥ ৫৩
স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো॥ ৫৪
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি॥ ৫৫

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্ভ্রমে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা॥ ৫৬
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে
মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস॥ ৫৭
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শংকরের
লতাগৃহদ্বার-মাঝে করিলা প্রবেশ।
পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন॥ ৫৮
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা করিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি॥ ৬০
উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম॥ ৬১
উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে॥ ৬২
[অন্য] নারী -অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশিসিলা দেব
... [ক] থার কভু হয় না অন্যথা॥ ৬৩
... [অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
... ... পতঙ্গের মতো
... ... করি॥ ৬৪
পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ॥ ৬৫
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন॥ ৬৬
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি-সম,
উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ॥ ৬৭
অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া॥ ৬৮
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে

দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত॥ ৬৯
দেখিলা জ্যাবন্ধমুষ্টি সশর মদন
তাঁর [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ॥ ৭০
তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখ মহাতপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল॥ ৭১
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ॥ ৭২

কুমারসম্ভব ॥ সূচনা

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু,
মানদণ্ড যেন তারি মাঝে॥

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে॥ ১

কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন—
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন॥ ২

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়— সেই দশা তাহারও কপালে॥ ৩

কিম্বা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার,
বজ্রবিদ্ধ মণি-মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার॥ ৪

আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ, কর্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগররাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে—

যথাবিধি হোম যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত—

দানহেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্রবরণ—

শৈশবে বিদ্যার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত, যোগবলে অন্তে দেহ-নাশ॥ ৫-৮

এ হেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল॥ ৯

পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালোমন্দ-বিচারে-নিপুণ—
সোনা খাঁটি কিম্বা ঝুটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন॥ ১০

অজবিলাপ

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,
তবু কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাক্যহীনা॥ ৪৮
মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু
মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবন্ধ রতি॥ ৫২
কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে॥ ৫৩
হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা—
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে॥ ৫৪
ও মুখে অলক দোলে যে মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে—
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে,
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে॥ ৫৫

[অলক তোমার কভু মৃদু বায়ুভরে
বিচলিয়া উঠে মৌন মুখের 'পরে—
শতদল যেন অবসান হলে দিন
নিশানিমীলিত অলিগুঞ্জনহীন॥] ৫৫

শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ-পরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে—
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে॥ ৫৬
শয়ন রচিত হত পল্লবে নব,
তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব।

আজ সেই তনু চিতা-আরোহণ আহা
কেমনে সহিবে, কেমনে সহিব তাহা॥ ৫৭
এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিক্কণ হারালো কি?
মনে হয় যেন সেও বুঝি তবু শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে॥ ৫৮
সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার—
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার॥ ৬৫
ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত—
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মতো॥ ৬৬
গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম—
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বলো গো আমার কি না সে করিল প্রিয়ে॥ ৬৭
তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে,
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে॥ ৬৯

মেঘদূত ॥ সূচনা

যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা,
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি- শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা॥ ১
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস
প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন।
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা,
বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে,
যক্ষ নিরখিল গিরি-'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে,
দন্ত হানে যেন করিবর॥ ২

পাঠান্তর

ক : আংশিক

অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—
নির্বাসনে সে রহি
প্রেয়সী-বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-
শিখর-আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিলধার॥ ১

পাঠান্তর

খ

কোনো-এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্
যত-কিছু॥ ১
কান্তাবিরহগুরু
দুখদিনগুলি
বর্ষকাল-তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার-স্নানজলে-
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে॥ ২

১

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর!
কোথা হে মহারাজ
মৃগের প্রাণ—
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

২

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়,
শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়।
এ নারী বল্কল পরি আরো মনোহর—
কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর!

পাঠান্তর

কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর,
চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
বল্কলও মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়?

৩

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

৪

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু-বাগে—
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।

৫

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়!

৬

মাঝে মাঝে পদ্মবনে
পথ তব হোক মনোহর।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি
ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পথধূলি
অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ।
হোক বায়ু অনুকূল
শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

৭

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।

৮

ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।

৯

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি-'পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা—
গৃহিণীর এই ধর্ম; কুলনাশী অন্যরূপ যারা।

১০

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল

১১

নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে,
রূপখানি দর্শন তিয়াসে
আঁখি মোর উৎসুক দশাতে
তিরস্করণী চাহে খসাতে।

—মালবিকাগ্নিমিত্র

১২

কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল—
সময় অসীম আর পৃথিবী বিপুল।

—মালতীমাধব-প্রস্তাবনা

১৩

অর্থ পরে বাক্য সরে
লৌকিক যে সাধুগণ তাঁদের কথায়।
আদ্য ঋষিদের বাক্যে
বাক্যগুলি আগে যায়, অর্থ পিছে ধায়।

১৪

কিছুই করে না, শুধু
সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি—
যে যাহার প্রিয়জন
সে তাহার কেমন কী জানি।

—উত্তররামচরিত

ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ কবিগণ

১

যেমন তেমন হোক মোর জাত,
হই ডোম হই চামার,
জন্মের কুল সেটা দৈবাৎ—
পৌরুষ সেটা আমার।

—বেণীসংহার

২

চতুরানন, পাপের ফল
যেমন খুশি তব
বিতর মোরে, সকলই আমি
যে ক'রে হোক সব।
মিনতি শুধু— অরসিকেরে
রসের নিবেদন
লিখো না, ওগো, লিখো না ভালে,
লিখো না সে বেদন।

পা ঠা ন্ত র

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে।

৩

ভালোই করেছ, পিক,
চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে।
মৌনই সেথায় শোভে
ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

৪

কাক কালো, পিক কালো,
বর্ষায় সমান তারা ঠিক—
বসন্ত যেমনি আসে
কাক কাক, পিক হয় পিক।

পাঠান্তর

কাক কালো, পিক কালো,
মিথ্যা ভেদ খোঁজা—
বসন্ত যেমনি আসে
ভেদ যায় বোঝা।

৫

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মানিকে জড়ানো হোক তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক।

—বররুচি : নীতিরত্ন

৬

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি
কমলা সদয়।
দৈবে করিবেন দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
দৈবেরে হানিয়া করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

—ঘটকর্পর

পাঠান্তর

ক

সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন,
তারি লক্ষ্মীলাভ।
দৈবপানে চেয়ে থাকে কাপুরুষগণ
দুর্বলস্বভাব।
দৈবেরে পরাস্ত করো আত্মশক্তিবলে,
পৌরুষ তাহাই।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবুও না ফলে
তাহে দোষ নাই।

খ

লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন
উদ্যোগী যে জন।
দৈবে করে ফল দান হেন কথা বলে
কাপুরুষ-দলে।
পৌরুষ সাধন করো দৈবেরে বধিয়া
আত্মশক্তি দিয়া।
বহুযত্নে ফল যদি নাহি মিলে হাতে
দোষ কী তাহাতে!

গ

উদ্যোগী পুরুষ বলবান্
লক্ষ্মী করে জয়,
দৈবে আসি করে বরদান
কাপুরুষে কয়।
দৈব ছাড়ি আত্মশক্তিবলে
পৌরুষ লভিবা—
যত্নে যদি সিদ্ধি নাহি ফলে
দোষ তাহে কিবা!

—ঘটকর্পর : নীতিসার

৭

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল—
আমি যে চাতক পাখি, চিত্ত বিকল—
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!

—পূর্বচাতকাষ্টক

৮

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর—
কূপ তৃষা দূর করে, করে না সাগর।

—কুসুমদেব : দৃষ্টান্তশতক

৯

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে,
পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে,
মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি—
সাধুর বচন নাহি ফিরে।

—কবিভট্ট : পদ্যসংগ্রহ

১০

সতের বচন লীলায় কথিত
শিলায়-খোদিত যেন সে।
অসতের কথা শপথজড়িত
জলের লিখন জেনো সে।

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

১১

নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী যদি আসেন বা যথা-ইচ্ছা ছাড়েন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হয় যদি কিম্বা যদি হয় যুগান্তরে—
ন্যায্য পথ হতে তবু ধীর কভু এক পা না সরে।

পাঠান্তর

ক

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক কিম্বা হোক যুগান্তরে-
ন্যায়পথ হতে ধীর এক-পা না সরে।

খ

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী ঘরে আসুন বা যথেচ্ছা ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে—
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক-পা না সরে।

১২

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জনের মৈত্রী যেন পূর্বাধদিবসছায়া।
সজ্জনের মৈত্রী ভায় অপরাহ্ণছায়াপ্রায়—
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায়।

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক

১৩

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারো মাস
হরিণেক্ষণার দ্বারে গৃহকর্মদাস,
বাক্য-অগোচর চিত্র চরিত্র যাঁহার,
ভগবান্ পঞ্চবাণ, তাঁরে নমস্কার।

১৪

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল।
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক

১৫

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে।
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে।—
শাস্ত্র নৃপ নারী কভু বশ নাহি মানে।

—বানরষষ্টক

১৬

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন।

—শার্ঙ্গধরপদ্ধতি

১৭

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যবে স্থির হয়ে থাকে।

—ভর্তৃহরি : সুভাষিতসংগ্রহ

১৮

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিস্র বনভূমি,
তিমিরশর্বরী, এ যে
শঙ্কাকুল— সঙ্গে লহো তুমি।

পাঠান্তর

মেঘলা গগন, তমাল-কানন
সবুজ ছায়া মেলে—
আঁধার রাতে লও গো সাথে
তরাস-পাওয়া ছেলে।

১৯

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি,
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

২০

বচন যদি কহ গো দুটি
দশনরুচি উঠিবে ফুটি.
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ

২১

কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর.
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অংকতলে—
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়—
কিসলয় পাখাখানি দোলাইব গায়?

পাঠান্তর

কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে—
তাঁহার করিব সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে?

—রূপগোস্বামী : হংসদূত

২২

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৩

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

—অমরুক : অমরুশতক

২৪

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কংকণ মুখর,
কথাটি কোয়ো না— তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৫

চক্ষু 'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!

—ত্রিবিক্রমভট্ট : নলচম্পূ

২৬

আনতাঙ্গী বালিকার
শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল,
না দেখিয়া পরস্পরে
তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল?

—জগন্নাথপণ্ডিত : ভামিনীবিলাস

২৭

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—

বাঁচিল কিনা দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

২৮

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না সরলে!
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে!

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৯

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা!
নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো, ওঠো,
সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

—বল্লভদেব : সুভাষিতাবলী

৩০

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়,
ছিল প্রীতি কুমুদিনী-পানে।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি মানে!

—ভ্রমরাষ্টক

৩১

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
'শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সংগীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

—চাণক্য : চাণক্যশতক

৩২

প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন,
দান-সহ ধন,
শৌর্য-সহ ক্ষমাগুণ— জগতে এ চারি
দুর্লভ মিলন।

—নারায়ণপণ্ডিত : হিতোপদেশ

৩৩

জলেতে কমল, জল কমলে,
শোভয়ে সরসী কমলে জলে।
মণিতে বলয়, বলয়ে মণি,
মণি বলয়েতে শোভয়ে পাণি।
নিশিতে শশী, শশীতে নিশি,
আকাশের শোভা উভয়ে মিশি।
কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি,
নৃপ-কবি-যোগে সভার ছবি।

৩৪

এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্যমহীন
ফলোদয় না হয় সে কাজে।

—নবরত্নমালা

পালি-প্রাকৃত কবিতা

১

স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত—
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

২

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনকবিজুরি নাচে রে,
অশনি গর্জন করে—
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

পাঠান্তর

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে—
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

মরাঠী : তুকারাম

১

শুন, দেব, এ মনের বাসনানিচয়—
জীবনও সঁপিতে আমি নাহি করি ভয়।
সকলই করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই—
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্তদেব, মোর আছিল সম্বন্ধডোর
তব সাথে বহু পূর্বে যাহা,
মিলি যত সাধুগণ আমাদের সে বাঁধন
দৃঢ়তর করিলেন আহা!
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন
যা আছে তোমারই পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে আমারে তোমারই কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ও তব চরণ।
তুমিই করো গো মোর লজ্জানিবারণ।

২

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতারচনে
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপবচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে, আদেশিলা পিছু—
বিঠলেরে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা-কিছু।
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে
এক শত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে।

৩

যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায়
দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভালোবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িয়ো না শুন গো বিঠ্ঠল!
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান
শান্তিসুখে কাটাইব এ মম পরান।
নামদেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে,
এই অনুগ্রহ তব গাঁথা র'ল মনে।

৪

'আমারই বেলায় উনি যোগী! নিজের তো বাকি নাই সুখ-
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু আমারই তো ঘুচিল না দুখ।
'ঘরে মোর অন্ন নেই ব'লে বলো দেখি যাই কার দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে আপদ সহিব কত আর?

অন্ন অন্ন ক'রে রাত দিন ছেলেগুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলই ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান, তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।'
তুকা বলে, 'দূর, পোড়ামুখী, আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে কাঁদিলে কী হবে বল্ আর!'

৫

'বোধ হয় এ পাষণ্ড পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি,
এ জনমে স্বামী হয়ে বৈর সাধিতেছে এত করি।
কত জ্বালা সবো বলো আর! কত ভিক্ষা মাগি পরম্বারে!
বিঠোবার মুখে ছাই! কী ভালো কল্লেন এ সংসারে!'
তুকা বলে, 'স্ত্রী আমার রাগিয়া কতই কটু ভাষে—
কভুবা কাঁদিয়া মরে, কভুবা আপনমনে হাসে।'

৬

'ঘরে দুটা অন্ন এলে ছেলেদের দেবো কোথা খেতে,
হতভাগা তা দেবে না— সকলই পরেরে যান দিতে।'
তুকা বলে, 'অতিথিরে যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মতো এসে হতভাগী ধরে মোর হাত।'
'না জানি যে পূর্বজন্মে কতই করিয়াছিলি পাপ'
তুকা বলে, 'এ জনমে তাই এত পেতেছিস তাপ।'

৭

'খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া,
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কী করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।'
তুকা বলে, 'ধৈর্য ধরো মনে,
এখনো সকল ফুরায় নাই।'

৮

'গেছে সে আপদ গেছে, ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক তা হোক ক'রে পেট ভ'রে খেতে পাব দুটি।

বোকে বোকে দিন্ এলে, জ্বালাতন হন্ হাড়ে মাসে।'
তুকা বলে 'যদিও সে দিবানিশি কত কষ্ট ভাষে,
তুকারে তুকার স্ত্রী মনে মনে তবু ভালোবাসে।'

৯

'ঘরে আর আসে না সে— কোনো পরিশ্রম নাহি ক'রে
নিজে নাকি খেতে পায় রোজ রোজ সুখে পেট ভরে!
না উঠিতে শয্যা হতে মিলি দলবলগুলো-সাথে
করতাল বাজাইতে আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা, জ্যান্তে তারা মড়ার মতন—
ঘরে আছে ছেলেপিলে, তাদের তো না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে— হতভাগী লজ্জা-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে মাথায় পাথর ভেঙে মরে।'
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'— তুকা বলে, 'থাকো সহ্য ক'রে।'

১০

'হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?'
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের তরে
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
ভালোমুখে দু-চারিটা কথা
না জানি তাহে কী ক্ষতি আছে!
কোথাও যায় না যারা কভু
ভালোবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভালো—হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া!
সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মতো করে তাড়া।'

১১

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে—
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।
আর কী কহিব বলো, মনে রেখো মোরে—
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বলো সবে রাম কৃষ্ণ বিঠ্‌ঠলের নাম—
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

১২

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা
এই আশীর্বাদ—সুখে থাকো গো তোমরা।
গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।

মধু-অন্বেষণ-তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হ'লে পরে আর কি সে জুড়ে?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই-সব কথাগুলি মনে জেনো সার—
এই-যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

১৩

ধরায় পাণ্ডরী আছে লোকেদের তরে,
আমি চলিলাম কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'পরে।
যাহা-কিছু কর সবে ইহা জেনো সার—
বৈকুণ্ঠের সেই পথ খুঁজে পাওয়া ভার।
আমি গেলে কাঁদিবে সকলে উচ্চরবে,
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
আমার যে পথ, বড়ো সহজ সে নয়—
দুর্গম সে পথ অতি জানিয়ো নিশ্চয়।

১৪

বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে—
তিনি ছাড়া সত্য বলো কী আছে এ ভবে।
'গ্রামের রত্ন যে ছিল সে ছাড়িল দেহ
মোদের সে বার্তা তবু জানালে না কেহ'
পাছে এই কথা বল ভয় করি, তাই
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু ভাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা, করি ভেরীরব
পাণ্ডরীপুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

১৫

তুকার পরীক্ষা শেষ হয়,
তিন লোকে লাগিল বিস্ময়।
প্রত্যহ দেবতাগুণগান
ইথে তার কেটে গেছে প্রাণ।
তুকা বসি আছে স্বর্গরথে,
দেবগণ দেখে স্বর্গ হতে।
বিধি তিনি ভক্তি শুধু চান,
তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান।

হিন্দী : মধ্যযুগ

১

গুরু, আমায় মুক্তিধনের
দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক
দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নামমণির দীপ্তি-জ্বালা।
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়-তৃষা।

২

চূড়াটি তোমার
যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার
চুনরি রাঙিয়ে দিয়ো।

পাঠান্তর

তোমার ঐ মাথার চূড়ায়
যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার
বুকের কাঁচলি।

শিখ ভজন

১

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
সেবক জনের সেবায় সেবায়,
প্রেমিক জনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখী জনের বেদনে বেদনে,
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,

মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ—
তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

২

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥

সংযোজন

মৈথিলী : বিদ্যাপতি

১

[ক]ণ্টকমাঝারে কুসুমপরকাশ,
[বি]কল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস।
[ভ্র]মভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাঁই—
[তু]হু বিনা, হে মালতী, বিশ্রাম নাই।
[ও] যে মধুজীবী তোমারি মধু চায়—
[স]ঞ্চি রেখেছ মধু মনের লজ্জায়।
[আ]পনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে
[ভ্রম]রবধের দায় লাগিবে কাহারে।
[বি]দ্যাপতি ভণয়ে তখনি পাবে প্রাণ
[অ]ধরপীযূষরস যদি করে পান। ২

২

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে,
এত আর কে করিয়াছে?
[ভ]বনভিত্তিতে লিখিত [ভু]জঙ্গপতি দেখিয়া
যার মন [প]রম ত্রাসিত হয়,
সেই সুবদনী [ফ]ণিমণি করে ঢাকিয়া
হাসিয়া [তে]ামার কাছে আসিল।*
...
কাম প্রেম উভয়ে যদি একমত হইয়া থাকে,
তবে কখন্ কী না করায়! ৭

*করে [ফ]ণিমণি ঢাকিবার তাৎপর্য [বো]ধ করি এইরূপ হইবে যে, [পা]ছে ফণিমণির আলোকে [তা]হাকে দেখা যায়, গোপন অভিসারের ব্যাঘাত করে।

৩

[রা]হু মেঘ হইয়া/আকার ধারণ করিয়া, সূর্য গ্রাস করিল।

...

এখন বর্ষণ হইতেছে না,
এবং দিনের বেলায় অবসর নাই,
সেই-হেতু পুরপরিজন কেহ সঞ্চরণ করিতে[ছে] না।

...

যাবজ্জীবন প্রেমের পর এক তিল সঙ্গম। ১৯

৪

মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল,
পদ্মের উপরে চাঁদ।
অমিয়-মকরন্দ পান করিয়া
পবন ও চকোর দুজনেই অলসিত হইল।—
কামিনী চকোর, পুরুষ ভ্রমর। ৩৭

৫

[স]মুদ্রের মতো নিশির [পার] পাই না।
[আ]মার হিতকর হইয়া [সূ]র্য কখন্ উদিত হয়। ৩৮

৬

লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি
অবগাহিয়া নবরস পান করে।

...

আরতি পতি পরতীতি মানে না—
কেলির নামে কী করে!

...

রোষে যেন মাটিতে উপেক্ষায়
পদ্মকে চাপিল।
এক হাত অধরে, এক হাত নীবিতে,
কিন্তু তিন হাত তো নেই—
কুচযুগে যে পাঁচটা পাঁচটা
শশী উদিত হই[ল]
কী দিয়ে ধনী সেটা গোপন করে!
অল্প আকুল, ব্যাকুল লোচনান্তর
নীরে [পূরিল]
মন্মথ মীনকে বংশী দিয়া বিঁধিল,
তাহা[র...] দশ দিকে ফিরিতেছে।

...

কোমল কামিনী অসহ কত সয়—
যামিনী জীবন দিয়া গেল। ২৯

৭

[য$^{\circ}$]াহার জন্মে গেলেম [ত$^{\circ}$]াহার অন্তে আসিলাম।
স্র্যোদয়ে অথবা চন্দ্রোদয়ে (?) গেলেম,
স্র্যাস্তে বা চন্দ্রাস্তে আসিলাম।
যাহার জন্য গেলেম সে চলিয়া আসি[ল],
তাই তর্তলে ল্কাইলাম।
সে প্ন গেল, তাকে আমি আনিলা[ম],
সে আমার পরম অন্যায়।
যখন কমল নাল ভাঙিয়া অবশেষে হাতে লইলাম
শব্দ করিয়া মধ্কর ধাইল,
আমার অধর দংশন করিল।
কুম্ভ ভরিয়া লইলাম,
তাই উরস্থল গ্রাসিয়া কেশপাশ সরিয়া খসিয়া পড়িল।
দশজন সখী আগ্পাছ্ হইয়া চলিল,
তে'ই উর্ধ্বশ্বাস ও বাক্য নাই।...
মনে গোপন করিয়া রাখ।
দিনে দিনে ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াই[বি],
বললে পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। ৩৯

৮

বিনা বিচারে ব্যভিচার ব্ঝ, শ্বাশ্ড়িকে রাগাও।
কৌতুকে কমলনাল তুলিয়া
অবতংস করিতে চাহিলাম,
রোষে আক্রোশে মধ্কর ধাইয়া অধর দংশন করিল।
সরোবর-ঘাটে বাটে কণ্টকতর্,
সকলগ্লে[া] আবার চোখেও পড়ে না।

...

তাই কেশপাশ খসিল,
আমি সখীদের পিছিয়ে পড়েছিল্ম
তাই দীর্ঘনিশ্বাস।
পথে অপরাধের নিন্দা প্রচারিল,
আমি তার উত্তর দিলেম।
ম্র্খ, তাই ধৈর্য ছিল না—
স্বরটা সেই জন্যে গদ্গদ-গোছ হয়েছে।

...

ননদী হইতে রসরীতি বাঁচিয়ে রেখো,
দেখো গোপন যেন ব্যক্ত না হয়ে পড়ে। ৪০

৯

...এক নগরেই মাধব বাস করে,
কিন্তু পরভাবিনীর বশ হইল।

অভিনব এক কমলফুল
নিমের দোনায় ভারে।
সে ফুল আতপে শুকাইল,
রসময় হইয়া ফুটিতে পারিল না।
বিধিবশে আজ আইল,
পরে আবার কাহার সহিত সমাগম হইবে—
আমার মন প্রত্যয় যায় না। ৪৩

১০

[লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি—
রাত্রিজাগরণগুরু নির্বেদ।
[যাও যাও] আর ভান কোরো না।
[যার] সঙ্গে রাত কাটালে [তা]র কাছে যাও।
[কুচকু]ঙ্কুম তোর হৃদয়ে [মা]খিল—যেন
অনু[রাগে]র রঙে গৌর [করিয়]াছ।
অন্যের ভূষণ [অঙ্গে] লাগিল,
ইহাতে [অ]ন্যের সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে।
[বিদ্য]াপতি ভণে—এরূপ বলা ভালো নয়,
[বড়ো]র অন্যায়ে মৌন হয়ে থাকাই উচিত। ৪৪

১১

কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে,
সব চেয়ে সেই বড়ো যাহার বিবেক আছে।
মানিনী ত্বরায় অভিসার করো—
অল্প অবসর, কিন্তু বহু উপকার।
মধু না দিলি...
সেই সম্পত্তি যাহা পরহিতের জন্য।...
যাবজ্জীবন অনুতাপ রহিল।
[তো]তে মন্দ না থাকু;
[তে]ার কাজ মন্দ।
মন্দ সমাজে ভালোও মন্দ হয়।
বিদ্যাপতি কহে—হে দূতী,
গোপনে বলো যে,
নিজক্ষতি বিনা পরহিত হয় না। ৪৫

১২

[ধ]ন যৌবন রসরঙ্গে
দিন দশ তরঙ্গ তোলে।
[বিধি] সুঘটিতকে বিঘটায়—
বাঁকা বিধাতা কী না করায়!

[ইহা ভ]ালো রীতি নয়—
জোর করে পূর্ব পিরীত দূর কোরো না।
[সচ]কিতে আশা পথ দেখো
সুপ্রভুর সমাগম স্মরণ করিয়া।
[নয়নে] জল, কাপড় পরাও নেই—
হায় পরাও!
[লাখ] যোজনে চাঁদ
তবুও কুমুদিনী আনন্দ করে।
দূরে গেলে দ্বিগুণ পিরীতি...
কথিত কথা নির্বাহ করে। ৪৬

১৩

কোন্ বনে মহেশ বসে
কেহ উদ্দেশ কহে না।
তপোবনে বসে মহেশ,
ভৈরব করিছে ক্লেশ—
কানে কুণ্ডল, হাতে গোলা,
তাহে বনে, পিয়ার মিঠি বোল।
যে বনে তৃণ না দোলে
সে বনে পিয়া হেসে বোলে।
একটি কথা মাঝে হইল—
প্রভু উঠি পরদেশ গেল। ৪৭

১৪

একদিন নূতন রীতি হয়েছিল,
জলে মীনে যেমন পিরীতি রে।—
একটি কথা মাঝে হল,
হাসি প্রভু উত্তর না দিল।—
একই পালঙ্গ-'পরে কান,
মোর মনে দূরদেশ-জ্ঞান।
যে বনে কিছুই না দোলে
সে বনে পিয়া হাসি বোলে।
ধরিব যোগিনীর বেশ রে,
করিব প্রভুর উদ্দেশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভান রে—
সুপুরুষ না করে নিদান রে। ৪৮

১৫

পূর্বপ্রেমে আসিনু তোমা হেরিতে।
আমি আসতেই বসিলে মুখ ফিরায়ে—
প্রথম বচনে উত্তর না দিলে,
নয়নকটাক্ষে জীবন হরি নিলে।

তুমি শশিমুখী ধনী না করিয়ো মান—
আমি যে ভ্রমর, অতি বিকল পরান।
আশ দাও, পুন নাহি করিয়ো নিরাশ।
হও হে প্রসন্ন, পুরাও মম আশ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
দুহু মনে উপজিল বিরহের বাণ। ৪৯

১৬

মানিনী, এখন উচিত নহে মান।
এখনকার রঙ্গ এমন-মতো লাগিছে—
জাগিল পঞ্চবাণ।
জুড়িয়া রজনী চকমক করে চন্দ্র—
এমন সময় নাহি আন।
হেন অবসরে প্রভুমিলন যেমন সুখ,
যাহার হয় সেই জানে—
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করে
যেমন (?) অধরমধুপান।
আপন আপন প্রভু সবাই সন্তোষিল,
ক্ষুধিত তোমারই যজমান॥
ত্রিবলীতরঙ্গ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম,
উরজ শম্ভুনির্মাণ—
পতি আরতি-প্রতিগ্রহ মাগিছে—
করো, ধনী, সর্বস্ব দান।
একজন দীপ, অপর আলো, মন স্থির রহে না-
করো দৃঢ় আপন-জ্ঞেয়ান।
সঞ্চিত মদনবেদন অতি দারুণ—
বিদ্যাপতি কবি ভান। ৫০

১৭

মাধব এ নহে উচিত বিচার—
যাহার এমন ধনী কামকলাসম
সে কি রে করে ব্যভিচার!
প্রাণ হতে তারে অধিক মানি
হৃদয়ের হার-সমান।
কোন্ যুক্তিতে সে অন্যেরে তাকায়—
এ কিরূপ তার জ্ঞান!
কৃপণ পুরুষে কেহ খ্যাতি নাহি করে,
জগ ভরি করে উপহাস।
নিজধন থাকিতে না করে উপভোগ,
কেবল পরের প্রতি আশ।

ভনয়ে বিদ্যাপতি—শুন মথুরাপতি,
এ বড়ো অনুচিত কাজ—
মেগে-আনা বিত্ত সে যদি হয় নিত্য তবে
আপন বিত্ত করিবে কোন্ কাজ! ৫১

১৮

আজু পড়িনু আমি কোন্ অপরাধে—
কেন না হেরিছে হরি লোচন-আধে!
অন্যদিন গ্রীবা ধরি নিয়ে আসে গেহ।
বহুবিধ বচনে বুঝাও স্নেহ।
মনে হয় রুষিয়া রহিল প্রভু সেই।
পুরুষের হৃদয় এমন নাহি হয়।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
বাড়িল প্রেম, চলিয়া গেল মান। ৫২

১৯

মাধব কী কহিব তাহার জ্ঞেয়ানে।*
সুপ্রভু কহনু যবে রোষ করিল তবে,
করে মুদিল দুই কানে।
আইল গমনবেলা, নীদ না টুটিল,
সে তো কিছু নাহি শুধাইল!
এমন কর্মহীন মম সম কোন্ ধনী!
হাত হইতে স্পর্শমণি গেল!
যদি আমি জানিতাম এমন নিঠুর প্রভু,
কুচে কাঞ্চনগিরি সাধি
কৌশল করিয়া বাহুলতা লয়ে
দৃঢ় করি রাখিতাম বাঁধি।
ইহা স্মরিয়া যবে জীবন না মরিল তবে
বুঝি বড়ো হৃদয় পাষাণ।
হেমগিরিকুমারী-চরণ হৃদয়ে ধরি
কবিবিদ্যাপতি-ভান। ৫৩

২০

কী কহিব, আহে সখী, নিজ অজ্ঞানে—
সকল রজনী গোঙাইনু মানে।
যখন আমার মন পরশ করিল
দারুণ অরুণ তখন উদিত হইল।

* অর্থাৎ, মাধবের জ্ঞা[নের] কথা কী ক[হিব]।

গুরুজন জাগিল, কী করিব কেলি—
তনু ঝাঁপইতে আমি আকুল হইনু।
অধিক চতুরপনে হইনু অজ্ঞানী,
লাভের লোভে মূলেই হল হানি।
ভণয়ে বিদ্যাপতি— নিজমতি-দোষ!
অবসরকালে উচিত নহে রোষ। ৫৪

২১

মাধব, তুঁহু যদি যাও বিদেশে
আমার রঙ্গ রভস লয়ে যাবে হে—
রাখিবে কোন্ সন্দেশে!
বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি (ভিন্নমতি),
বিসরি যাইবে পতি মোরে।
হীরা মণি মানিক কিছু নাহি মাগিব,
ফের মাগিব প্রভু তোরে।
যখন গমন কর, নয়নে নীর ভরি
দেখিতে না পাইনু প্রভু তোরে।
এক নগরেতে বসি প্রভু হইল পরবশ,
কেমনে পুরিবে মন মোর!
প্রভুসঙ্গে কামিনী বড়োই সোহাগিনী,
চন্দ্র-নিকটে যেন তারা!
ভণয়ে বিদ্যাপতি— শুন বরযুবতী,
আপন হৃদয়ে ধরো সার। ৫৫

২২

মোরে ত্যেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ,
কার 'পরে ক্ষেপিব এ বালিকা-বয়েস।
শয্যা হইল সুগন্ধি, ফুলের হইল বাস—
আমার ভ্রমর কত করিছে উপবাস!
স্মরিয়া স্মরিয়া চিত নাহি রহে স্থির—
মদনদহন দগধে শরীর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
কী করিবে নাথ, দৈব হল বাম। ৫৬

২৩

সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল—
কী যে বিধাতা কপালে লিখি দিল!
চিয়াইয়া উঠিল, বসিল শির নোয়াইয়া,
চৌদিশ হেরি হেরি রহিল লজ্জায়—

স্নেহের বন্ধু সেও চলে গেল!
দুহু কর প্রভুর খেলেনা হইল!
ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ লেহ—
যেমন বিরহ হয় তেমনি সিনেহ। ৫৭

২৪

মাধব আমার রহিল দূরে দেশ—
কেহ না কহে, সখী, কুশলসন্দেশ।
যুগ যুগ বাঁচুক, থাকুক লক্ষ ক্রোশ—
আমার অভাগ্য, তাহার কোন্ দোষ!
আমার করমে হইল বিধি বিপরীত,
ত্যেজিল মাধব পুরবের প্রীত।
হৃদয়ের বেদনা বাণসমান—
অন্যের দুঃখ নাহি জানে আন।
ভণয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
কী করিবে নাথ, দৈব হইল বাম। ৫৮

২৫

মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ—
দেখি নিশাকর জ্বলি উঠে গাত।
মদনবেদন করে মানস-অন্ত—
কাহারে কহিব দুখ, পরদেশ কান্ত।
স্মরিয়া স্নেহ গেহে নাহি আসে।
দারুণ দাদুর কোকিল ভাষে।
স'রে স'রে খসিতেছে নীবিবন্ধ আজ—
বড়ো মনোরথ, ঘরে প্রভু নাহি আজ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন এ প্রমাণ—
বুঝে নৃপ রাঘব নব পাঁচবাণ। ৬১

২৬

প্রথম ও একাদশ দিয়া প্রভু গেল,
সেও রে অতীত কত দিন হল!
রতি-অবতার বয়স মোর হইল,
তবুও প্রভু না মোরে দরশন দিল!
এখন ধরম বুঝি নাহি বাঁচে মোর,
দিনে দিনে মদন দ্বিগুণ করে জোর!

চাঁদ সূর্য মোরে সহ্য না হয়,
চন্দন লাগে বিষমশরসম!
ভণয়ে বিদ্যাপতি— গুণবতী নারী,
ধৈরজ ধরহ, মিলবে মুরারি। ৬২

২৭

চন্দন হইল বিষম শর,
ভূষণ হইল ভারী—
স্বপনেও হরি নাহি আইল
গোকুলগিরিধারী!
একাকী দাঁড়ায়ে কদমতলে
পথ নেহারে মুরারি!
হরি বিনা দেহ দগধ হইল,
ম্লান হইল সমস্ত!
যাও যাও তুমি উদ্ধব হে,
তুমি হে মধুপুরে যাও।
চন্দ্রবদন নাহি বাঁচিবে—
বধ লাগিবে কাহাকে?
ভণয়ে বিদ্যাপতি তন মন দিয়া
শুন গুণমতী নারী—
আজি আসিছে হরি গোকুলে রে,
পথে চলো ঝটঝারি। ৬৪

২৮

গগন গরজে ঘন ঘোর,
কখন আসিবে প্রভু মোর!
উদিল পঞ্চবাণ,
এখন বাঁচে না মোর প্রাণ!
করিব কোন্ প্রকার?
যৌবন হইল জীবনের কাল। ৬৫

২৯

মাধব মাসে মাধবতিথিতে
অবধি করিয়া প্রভু গেল।
কুচযুগশম্ভু পরশি হাসি কহল,
তাই প্রতীতি মোর হইল।
অবধি শেষ হইল, সময় বেয়াপিত—
জীবন বহি গেল আশে।

গ্রিয়র্সনের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত
বিদ্যাপতি-পদের অনুবাদ

তখনকার বিরহেই যুবতী বাঁচে না,
মাধবমাসে কী করে!
ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস গোঁয়াইল,
দিবস দিবস করি মাসে!
দিবস দিবস করি বরষ গোঁয়াইল—
এখন জীবন কোন্ আশে!
আম্রমঞ্জরী ধরে—মন মোর গহ্বর (আঁধার)—
কোকিলশব্দ হইল মন্দ!
এমন বয়স ত্যেজি প্রভু পরদেশ গেল!
পিইল কুসুম মকরন্দ—
কুঙ্কুম চন্দন অগ্নি লাগাইল,
কে কহে শীতল চন্দ্র!
প্রভু বিদেশে অনেককে রক্ষা করিতেছেন—
বিপদের সময়েই ভালো মন্দ চেনা যায়। ৬৬

৩০

মোহন, মধুপুরে বাস—
আমি যাইব তার পাশ।
রাখিল কুব্জার স্নেহ—
ত্যেজিল আমার স্নেহ!
কত দিন তাকাইব বাট—
গেছে সে যমুনার ঘাট।
সেখানেই থাকুক দৃঢ় করি—
দরশন দিক একবার। ৬৮

৩১

আশালতা লাগাইনু
নয়নের নীর সিঞ্চিয়া।
তাহার ফল এখন তরুণতা প্রাপ্ত হই[ল,]
আঁচলের তলে আর সামলায় না।
কাঁচার মতো প্রভু আমায় দেখিয়া গে[ল]—
তার মন হইল কুয়াশাসমান।
দিনে দিনে ফল তরুণ হইল
ইহা সে মনে জ্ঞান করে না?
সকলকারই পরদেশবাসী প্রভু
স্নেহ স্মরিয়া আসিল—
আমার এমন নির্দয় প্রভু
মনে তার স্নেহ বাড়ে না। ৬৯

৩২

বুঝিনু তাহার ভালো মন্দ।
মন্মথ মন মথে তাহা বিনে সজনী...
তার শত নিন্দা কহ, তবু তার মতো
আমার আর কেহ নাই।
মুছিতে কতই যত্ন কর,
কিন্তু পাষাণের রেখা মোছে না।
যখন দুর্জন কটু ভাষে,
আমার মনের বিরাম হয় না।
রাহুপরাভব অনুভব করিয়া
হরিণ কখনো চাঁদকে ত্যাগ করে না।
যদিও তরণীর (নদী) জল শুখায়,
তবু কমল পাঁককে ছাড়ে না।
যেজন যাহাতে অনুরক্ত,
কী করে তার বাঁকা বিধির ভয়! ৭৫

৩৩

...কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো!
এক দক্ষিণের কাপড় আমি পরিয়া লইলাম...
পিয়াকে কোলে নিয়ে বাজারে চললেম।
হাটের লোকেরা শুধায় 'এ তোর কে হয়'—
এ আমার দেওর নয়, এ আমার ছোটো ভাই নয়,
পূর্বভাগ্যফলে এ আমার স্বামী।
চলো রে পথিক, তুমি আমার ভাই—
আমার সম্বাদ নিয়ে যাও;
বাবাকে বোলো যেন একটা ধেনু গা[ই কেনে]
যে, জামাইকে দুধ খাইয়ে পোষা যায়।
টাকা নেই, গাই নেই—
কী বিধিতে বালক জামাই পোষা! ৭৯

৩৪

'পিয়াসে মরিতেছি আ[মাকে] জল খাওয়াও।'
কে তুমি? কাহার কুল?
বিনা পরিচয়ে পিঁ[ড়ি...] দিই না।
'আমি পথিক রাজকুমার,
ধনীর বিয়োগে সংসার ভ্রমিতেছি।'
তবে বোসো, জল খাওয়াচ্ছি—
যা [খোঁজ?] তাই এনে দিচ্ছি।

শ্বশুর ভাশুর মোর গেল বিদেশ,
স্বামী গেল [তাদের উদ্দেশ?],
ঘরে অন্ধ শাশুড়ি চোখে দেখে না—
ছেলে আমার কথা বোঝে না। ৮০

৩৫

নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ!
গৌরী তাকেই বর করবে এ কেমনে [নির্বাহ] হয়?
কোথায় ভবন, কোথায় অঙ্গন,
কোথা বাপ ভাই!
কোথাও ঘরের ঠাওর (স্থিরতা) নেই—
কাহার/কে করে এমন জামাই!
কে এমন অসুজনতা করিল!
ইহার কেহ পরিবার নাই—
যে ইহার নিবন্ধন করিল সে পঞ্জিকারকে ধিক্!
যার কুল পরিবার কিছুই নাই, ভূত বেতাল পরিজন-
দেখে দেখে শরীর ঝুরিছে—এ হৃদয়শল্য কে সহে!
যে যার বিবাহী আছে
সে তার নাথ হয়—বিধির নির্বন্ধ। ৮১

সংস্কৃত গুরুমুখী ও মরাঠী

তিনটি কবিতা: রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত

তারকাকুসুমচয়
ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি
সাগরে তরঙ্গ তুলি
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে
পর্বতকন্দরে গিয়া
শুভ শঙ্খ বাজাইয়া
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী
চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়।

২

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

৩

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান—
কেবলই মঙ্গল যবে, কেবলই কল্যাণ।
পরমায়ু-অবসানে ভেটিব চরণ,
টুটিবে সত্বর মোর সকল বন্ধন।
সকল বন্ধন মোর হোক অপসৃত—
উতলা হয়েছে, দেব, তাই মোর চিত।
পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার।
ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরান—
সকাতরে চাহি কৃপা, করো পরিত্রাণ।
তুকা ভণে তব কানে পশিবে এ কথা—
দীন-উদ্ধারণ প্রভু, শীঘ্র এসো হেথা।
চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত—
এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত?

রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদসমূহের মূল

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১

পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু
মা মা হিংসীঃ।

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৭. ২০

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩০. ৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ১৬. ৪১

২

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ১৭

৩

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬. ৩

৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২. ১. ১

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

—মুণ্ডক, ২. ২. ৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

—মাণ্ডুক্য, ৭

৫

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভুব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০. ১২১. ২-৬, ৯

৬

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ২-৪

৭

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে
জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ৫

৮

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্রাড়ৃতা বোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতাপরং তু বিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে শ্রিতান্য-
প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি॥

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস
আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি॥

—ঋগ্‌বেদ, ২. ২৮. ৬৯

৯

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬. ৭-৯

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪. ১৭

১০

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৮

১১

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষ-
মভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা-
দুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু॥

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রা-
দভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

—অথর্ববেদ, ১৯. ১৫. ৫-৬

১২

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩. ৮

১৩

সত্যকামোহ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে
ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রোহম্বহমস্মীতি।
সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি।
তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি।
স হোবাচ নাহমেতদ্ বেদ ভো যদ্‌গোত্রোহহমস্মি
অপৃচ্ছং মাতরং
সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোহহং
সত্যকামো জাবালোহস্মি ভো ইতি।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে
ন সত্যাদগা ইতি।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪. ৪

১৪

মা মিং কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব।

—অথর্ববেদ, ১. ৩৪. ৪

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ২

১৫

যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ৩

১৬

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি।

—অথর্ববেদ, ৭. ৩৬. ১

১৭

অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ।...
মামনু প্র তে মনঃ...
পথা বারিব ধাবতু॥

—অথর্ববেদ, ৩. ১৮. ৫-৬

ধম্মপদ

যমকবগ্গো

মনোপুব্বঙ্গমা ধর্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং॥ ১

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥ ২

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং ন্পনয্হন্তি বেরং তেস্পসম্মতি॥ ৪

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥ ৫

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে।
যে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা॥ ৬

স্ভান্পস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েস্ অসংব্তং।
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞ্ং কুসাতং হীনবীরিয়ং।
তং বে পসহতি মারো বাতো র্ক্খং ব দ্ব্বলং॥ ৭

অস্ভান্পস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েস্ স্সংব্তং।
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞ্ং সম্ধং আরব্ধবীরিয়ং।
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং ব পব্বতং॥ ৮

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেস্সতি।
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥ ৯

যো চ বন্তকসাবস্স সীলেস্ স্সমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতি॥ ১০

অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা॥ ১১

সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো।
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা॥ ১২

যথাগারং দ্চ্ছন্নং ব্ট্ঠি সমতিবিজ্ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি॥ ১৩

যথাগারং স্চ্ছন্নং ব্ট্ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি।
এবং স্ভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি॥ ১৪

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো॥ ১৫

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপ্ঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্মোবিস্দ্ধিমত্তনো॥ ১৬

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি।
পাপং মে কতংতি তপ্পতি ভীয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো॥ ১৭

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি।
পুঞ্ঞং মে কতংতি নন্দতি ভীয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো॥ ১৮

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি॥ ১৯

অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী।
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা স ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি॥ ২০

অপ্পমাদবগ্গো

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥ ১

এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা॥ ২

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং॥ ৩

উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো।
সঞ্ঞতস্স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্স যসোঽভিবড্ঢতি॥ ৪

উট্ঠানেনঽপ্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ।
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি॥ ৫

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং ব রক্খতি॥ ৬

মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং।
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং॥ ৭

পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্ঞা পাসাদমারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্ঠো ব ভূম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি॥ ৮

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্সং ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো॥ ৯

অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা॥ ১০

অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা।
সঞ্ঞোজনং অণুং থূলং ডহং অগ্গীব গচ্ছতি॥ ১১

অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা।
অভব্বো পরিহানায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে॥ ১২

চিত্তবগ্গো

ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং।
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো ব তেজনং॥ ১

বারিজো ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো।
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে॥ ২

দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থ কামনিপাতিনো।
চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং॥ ৩

সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কামনিপাতিনং।
চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং॥ ৪

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং।
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা॥ ৫

অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো।
পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি॥ ৬

অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহতচেতসো।
পুঞ্ঞপাপপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং॥ ৭

কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোজেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিয়া॥ ৮

অচিরং বত য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি।
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং॥ ৯

দিসোদিসং যন্তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং।
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে॥ ১০

ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে॥ ১১

পুপ্ফবগ্গো

কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি॥ ১

সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি॥ ২

ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে॥ ৩

পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘো ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥ ৪

পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং॥ ৫

যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠয়ং।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে॥ ৬

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ॥ ৭

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো॥ ৮

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো॥ ৯

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহূ।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং॥ ১০

মহাভারত। মনুসংহিতা

১

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা
রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব ১৪০.৫৬

২

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৪.৩৯

৩

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥

যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

—মনুসংহিতা, ৪.১৭২-৭৪

কালিদাস-ভবভূতি

কুমারসম্ভব ॥ তৃতীয় সর্গ

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ॥ ২৫

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥ ২৬

সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥ ২৭

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥ ২৮

মৃগাঃ প্রিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীর্মর্মরপত্রমোক্ষাঃ॥ ৩১

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ॥ ৩৫

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ ৩৬

অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥ ৩৭

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিতপত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥ ৩৮

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥ ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে॥ ৪২

দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ॥ ৪৩

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধানবত্যাম্।
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ॥ ৪৪

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে॥ ৪৫

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্॥ ৪৬

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ॥ ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৮

কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ॥ ৪৯

স্মরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৫১

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥ ৫২

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥ ৫৪

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকস্য॥ ৫৫

সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥ ৫৬

তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস॥ ৫৭

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম॥ ৫৮

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্॥ ৬০

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ॥ ৬১

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়॥ ৬২

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্॥ ৬৩

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ॥ ৬৪

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্॥ ৬৫

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্॥ ৬৬

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ ৬৭

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্তবিলোচনেন॥ ৬৮

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্॥ ৬৯

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥ ৭০

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥ ৭১

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥ ৭২

কুমারসম্ভব ॥ সূচনা

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

—কুমারসম্ভব, ১. ১

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥ ১

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥ ২

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ॥ ৩

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ ৪

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাম্ আফলোদয়কর্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ আনাকরথবর্ত্মনাম্॥ ৫

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥ ৬

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥ ৭

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥ ৮

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥ ৯

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥ ১০

—রঘুবংশ, ১. ১-১০

রঘুবংশ ॥ অষ্টম সর্গ

কৃতবত্যসি নাবধীরণা-
মপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং
জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে॥ ৪৮

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥ ৫২

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্-
চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুতস্-
ত্বদুপাবর্তনশঙ্কি মে মনঃ॥ ৫৩

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্-
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ॥ ৫৪

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥ ৫৫

শশিনং পুনরেতি শর্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ॥ ৫৬

নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে
মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং
বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্॥ ৫৭

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে॥ ৫৮

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ॥ ৬৫

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥ ৬৬

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ ৬৭

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্-
মম সর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৬৯

মেঘদূত ॥ সূচনা

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ॥
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥ ১

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ ২

১

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১০

২

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৮

৩

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৯

৪

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ৩১

৫

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ৯

৬

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্-
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১১

৭

উগ্গলিঅদব্ভকবলা মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১২

৮

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৪

৯

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৮

১০

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিও সি ণং কহং॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫. ১০

১১

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করণীম্॥

—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২. ১

১২

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

—মালতীমাধব-প্রস্তাবনা

১৩

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষিণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

—উত্তররামচরিত, ১. ১০

১৪

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

—উত্তররামচরিত, ৬. ৫

ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ কবিগণ

১

সূতো বা সূতপুত্রো বা
যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

—ভট্টনারায়ণ : বেণীসংহার, ৩. ৩৭

২

ইতরপাপফলানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ২

৩

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্-
তত্র মৌনং হি শোভনম্।

—বররুচি : নীতিরত্ন, ১১

৪

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণস্-
কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ১৩

৫

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

বররুচি : নীতিরত্ন, ৮

৬

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

—ঘটকর্পর : নীতিসার, ১৩

৭

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসে তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহম্।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক ত্বং কাহং ক চ জলপাতঃ॥

—পূর্বচাতকাষ্টক, ৪

৮

উপকর্তুং যথা স্বল্পঃ
সমর্থো ন তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি
সততং ন তু বারিধিঃ॥

—কুসুমদেব : দৃষ্টান্তশতক, ১৩

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নির্‌-
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

—কবিভট্ট : পদ্যসংগ্রহ, ৭

১০

সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং
শিলালিখিতমক্ষরম্‌।
অসদ্ভিঃ শপথেনাপি
জলে লিখিতমক্ষরম্‌॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

১১

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্‌।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ১০

১২

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনস্য পূর্বার্ধপরার্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্‌।

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ৭৮

১৩

শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্মদাসাঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায়॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ১

১৪

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলমেব কেবলম্‌।
অতএব নিপীয়তেঽধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ৮৫

১৫

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বম্॥

—বানরাষ্টক, ২

১৬

যা স্বসদ্মনি পদ্মেঽপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্ভতে
ইন্দিরা মন্দিরেঽন্যেষাং কথং তিষ্ঠতি সা চিরম্॥

—শারঙ্গধরপদ্ধতি, ৪৭১

১৭

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
যয়া বদ্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ॥

—ভর্তৃহরিসুভাষিতসংগ্রহ, ৪০৫

১৮

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্-
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১. ১

১৯

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ৫. ১০

২০

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১০. ২

২১

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাম্।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী॥

—রূপগোস্বামী : হংসদূত, ১১৫

২২

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্র॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৩

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ॥

—অমরুক : অমরুশতক, ৬০

২৪

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৫

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

ত্রিবিক্রমভট্ট : নলচম্পূ, ৭. ৪৯

২৬

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ম্
অন্যোঽন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্॥

জগন্নাথপণ্ডিত : ভামিনীবিলাস, শৃ, ৪৬

২৭

হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৮

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৯

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং
তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ
ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

—বল্লভদেব : সুভাষিতাবলী, ৭০৭

৩০

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ
বিধিবশেন বিদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে॥

—ভ্রমরাষ্টক, ৯

৩১

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং
গীতং গায়তি বানরঃ॥

—চাণক্য : চাণক্যশতক, ৮৯

৩২

দানং প্রিয়বাক্‌সহিতং জ্ঞানমগর্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্যম্‌।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্‌॥

—নারায়ণ পণ্ডিত : হিতোপদেশ

৩৩

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্‌-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥

—নবরত্নমালা

৩৪

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কর্ম নোৎপাদয়েৎ ফলম্‌।

—নবরত্নমালা

পালি-প্রাকৃত কবিতা

১

বণ্ণগন্ধগুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরিপাদসরোরুহে।
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং।

—বৌদ্ধ এদাহিল্লা

২

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মনহরণ
কণঅ পিঅরি ণচই
বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর বিত্থর হিঅলা
পিঅলা নিঅলং ণ আবেই॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গল

মরাঠী : তুকারাম

১

মাঝিয়ে মনীচা জাণা হা নির্ধার।
জিবাসি উদার জালোঁ আতাঁ॥
তুজবিণ দুজেঁ ন ধরীঁ আণিকা।
ভয় লজ্জা শংকা টাকিয়েলী॥
ঠাযীঁচা সংবন্ধ তুজ মজ হোতা।
বিশেষ অনন্ত কেলা সন্তীঁ॥
জীবভাব তুঝ্যা ঠেবিয়েলা পায়ীঁ।
হেঁ চি আতাঁ নাহীঁ লাজ তুম্হাঁ॥
তুকা ম্হণে সন্তীঁ ঘাতলা হাবালা।
ন সোডীঁ বিঠ্ঠলা পায আতাঁ॥

২

নামদেবেঁ কেলেঁ স্বপ্নামাজী জাগেঁ।
সবেঁ পাণ্ডুরংগে যেউনিয়াঁ॥
সাংগিতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ব।
বাউগেঁ নিমিত্য বোলোঁ নকো॥
মাপ টাকী সল ধরিলী বিঠ্ঠলেঁ।
থাপটোনি কেলেঁ সাবধান॥
প্রমাণাচী সংখ্যা সাংগে শত কোটী।
উরলে শেবটীঁ লাবী তুকা॥

৩

দ্যাল ঠাব তরি রাহেন সংগতী।
সন্তাঁচে পংগতী পায়াঁপাশী॥
আবডীচা ঠাব আলোঁসে টাকুন।
আতাঁ উদাসীন ন ধরাবেঁ॥
সেবটাঁল স্থল নীচ মাঝী বৃত্তি।
আধারেঁ বিশ্রান্তী পাবঈন॥
নামদেবা পায়ীঁ তুক্যা স্বপ্নীঁ ভেটী।
প্রসাদ হা পোটী রাহিলাসে॥

৪

মজচি ভোঁবতাঁ কেলা যেণেঁ জোগ।
কায় যাচা ভোগ অন্তরলা॥
চালোনিয়াঁ ঘরা সর্ব সুখেঁ য়েতী।
মাঝী তোঁ ফজীতী চুকেচি না॥
কোণাচী বাঈল হোঊনিয়াঁ বোঢ়ূ।
সংবসারীঁ কাঢ়ূ আপদা কিতী॥
কায় তরী দেঊঁ তোড়তীল পোরেঁ।
মরতীঁ তরী বরেঁ হোতেঁ আতাঁ॥
কাঁহীঁ নেদী বাঁচোঁ ধোবিয়েলেঁ ঘর।
সারবাবয়া ঢোরশেণ নাহীঁ॥
তুকা ম্নণে রাণ্ড ন করিতাঁ বিচার।
বাহূনিয়াঁ ভার কুন্থে মাথাঁ॥

৫

কায় নেণোঁ হোতা দাবেদার মেলা।
বৈর তো সাধিলা হোঊনি গোহো॥
কিতী সর্বকাল সোসাবেঁ হেঁ দুঃখ।
কিতী লোকাঁ মুখ বাঁসূ তরী॥
ঝবে আপুলী আঈ কায় মাঝেঁ কেলেঁ।
ধড় যা বিট্টলে সংসারা চেঁ॥
তুকা ম্নণে যেতী বাঈলে আসড়ে।
ফুন্দোনিয়াঁ রড়ে হাঁসে কাঁহীঁ॥

৬

গোণী আলী ঘরা।
দাণে খাউ নেদী পোরাঁ॥
ভরী লোকাণ্ডী পাঁটোরী।
মেলা চোরটা খাণোরী॥
খবললী পিসী।
হাতা ঝোম্বে জৈসী লাঁসী॥
তুকা ম্নণে থোটা।
রাণ্ডে সণ্ডিতাচা সাঁটা॥

আঁতা পোরা কায় খাসী।
গোহো ঝালা দেবলসী॥
ডোচকে' তিম্বী ঘাতল্যা মালা।
উদমাচা সাণ্ডী চালা॥
আপল্যা পোটা কেলী থোর।
আমচা নাহী' যেসপার॥
হাতী' টাল তোণ্ড বাসী।
গায় দে উলী' দেবাপাশী'॥
আতাঁ আম্‌হী কর‍্‌ কায়।
ন বসে ঘরী' রানা জায়॥
তুকা ম্হণে আতাঁ ধীরী।
আজ্‌নী নাহী' জালে' তরী॥

৮

বরে' ঝালে' গেলে'।
আজী অবঘে' মিলালে'॥
আতাঁ খাঈন পোটভরী
ওল্যা কোরড্যা ভাকরি॥
কিতী তরী তোণ্ড।
যাঁশী' বাজব্‌ মী রাণ্ড॥
তুকা বাইলে মানবলা।
ছিথ্‌ কর্‌নিয়াঁ বোলা॥

৯

ন করবে ধন্দা।
আইতা তোণ্ডী' পড়ে লোন্দা॥
উঠি তে' তে' কুটিতে' টাল।
অবঘা মাণ্ডিলা কোলাহল॥
জিবন্তচি মেলে।
লাজা বাট্‌নিয়াঁ প্যালে॥
স'বসারাকড়ে।
ন পাহাতী ওস পড়ে॥
তলমলতী যাণ্ড্যা রাণ্ডা।
ঘালিতী জীবা নাঁবে' ধোণ্ডা॥
তুকা ম্হণে বরে' ঝালে'।
ঘে গে বাইলে লিহিলে'॥

১০

কোণ ঘরা যেতে' আম্‌চ্যা কাশালা।
কায় জ্যাচা ত্যালা নাহী' ধন্দা॥
দেবাসাঠী' ঝালে' ব্রহ্মাণ্ড সোইরে'।
কোঁবল্যা উত্তরে' কায় বে'চে॥

মানে পাচারিতাঁ নব্হে আরাণূক।
ঐসে যেতী লোক প্রীতীসাঠী॥
তুকা হ্মণে রাণ্ডে নাবড়ে ভূষণ।
কাঁতলেঁসেঁ শ্বান লাগে পাঠী॥

১১

আহ্মী জাতোঁ আপল্যা গাঁবা।
আমূচা রামরাম ঘ্যাবা॥
তুমচী আমচী হে চি ভেটী।
যেথূনিয়াঁ জন্মতুটী॥
আতাঁ অসোঁ দ্যাবী দয়া।
তুমচ্যা লাগতসেঁ পায়াঁ॥
যে তাঁ নিজধামীঁ কোণী।
বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল বোলা বাণী॥
রামকৃষ্ণ মূখীঁ বোলা।
তুকা জাতো বৈকুণ্ঠালা॥

১২

ঘরিণি দারিণি সূখী তুহ্মি নান্দা।
বডিলাঁসি সাঙ্গা দণ্ডবত॥
মধাচিয়ে গোড়ী মাশী ঘালি উড়ি।
গেলি প্রাপ্তঘড়ী পূন্হা নয়ে॥
গঙ্গোচা তো ওঘ সাগরাসী গেলা।
নাহিঁ মাগেঁ আলা পরতোনী॥
ঐসিয়া শব্দাচা বরা হেত ধরা।
উপকার করা তুকয়াবরী॥

১৩

পতাকাণ্ডা ভার মৃদঙ্গাচা ঘোষ।
জাতী হরিদাস পংঢরীসী॥
লোকাণ্ডী পংঢরী আহে ভূমীবরী।
আহ্মা জাণেঁ দূরী বৈকুণ্ঠাসী॥
কাঁহীঁ কেল্যা তুহ্মা উমজেনা বাট।
হ্মনূনি বোভাট করূনি জাতোঁ॥
মাগেঁ পূঢেঁ রডাল করাল আরোলী।
মগ কদাকালীঁ তুকা ন য়ে॥

১৪

সখে সজ্জনহো ঘ্যারে রামনাম।
সঙ্গে এতো কোণ নিশ্চয়েসী॥
আমূচে গাবীণ্ডে জরী রত্ন গেলে।
নাহিঁ সাংগীতলে হ্মাল কোণী॥

স্মাণোনীয়া জরী তুম্হা করিতোঁ ঠাওয়েং।
ন কলে তরী জাওয়ে পঢ়ে বাটে॥
ইতক্যাবরী রহাল জরী তুম্‌হি মাগে।
তুকা নিরোপ সাঙ্গে বিঠোবাশিং॥

১৫

তুকা উতরলা তুকীং।
নবল জালেং তিহীং লোকীং॥
নিত্য করিতোঁ কীর্তন।
হেং চি মাঝেং অনুষ্ঠান॥
তুকা বৈসলা বিমানীং।
সন্ত পাহাতী লোচনীং॥
দেব ভাবাচা ভুকেলা।
তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা॥

হিন্দী : মধ্যযুগ

১

গুরুচরণনকী আশা।
গুরুকৃপা ভব নিশা সিরাণী
দীপত জ্ঞান উজালা।
কারী কমরিয়া গুরু মোহি দীনী,
নাম জপনকো মালা।
জল পীবন কো তুম্বী দীনী
আসন্ চরণন পাসা।
গুরুচরণনকী আশা॥

—গোরখনাথের অন্যতম শিষ্য

২

করবোঁ মৈং কবন বহানা
গবন হমরো নিয়রানা।
সব সখিয়নমেং চুনরী মোরী মৈলী—
দুজে পিয়া ঘর জানা।
এক লাজ মোহী শাস ননদকী—
দুজে পিয়া মারে তানা।
পিয়াকে পগিয়া রঙ্গী জোনা রঙ্গমে
হমরো চুনরিয়া রঙ্গানা॥

—কবীর

শিখ ভজন

১

এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল সাঁবল
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সুরজ বরৈ নিরমল দীপা
তেরো জগমন্দির উজার এ।

২

বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ॥
অমল কমল বিচ
উজল রজনী বিচ
কাজর ঘন বিচ
নিশ আধিয়ারা বিচ
বীণ রণন সুনায়ে।
বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ॥

সংযোজন

মৈথিলী : বিদ্যাপতি

১

নায়িকা সঁ দূতি উক্তি

কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে।
বিকল ভ্রমর নহিঁ পাবথি বাসে॥
ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ।
তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামেঁ॥
ও মধুজীব তোঁহে মধু রাসে।
সাঁচি ধরিঅ মধু মনহিঁ লজা সে॥
অপনহুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তোঁ পয় জীবে।
অধর সুধা রস জোঁ পয় পীবে॥ ২

২

নায়ক সং দূতি বচন

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কয়লি জত সুন্দরি
কামিনি করু কে আনে॥
...
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মন পরম তরাসে।
সে সুবদনি কর ঝপইতি ফণি মণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে॥
...
কাম প্রেম দুহু এক মত ভয় রহু
কখনে কী ন করাবে॥ ৭

৩

নায়ক সং নায়িকা বচন

রাহু মেঘ ভয় গরসল সূর।
পথ পরিচয় দিবসহিং ভেল দূর॥
নহিং বরিসয় অবসর নহিং হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহিং কোএ॥
...
এহি সংসার সারবস্তু এহ।
তিলা এক সঙ্গম জাব জিব নেহ॥ ১৯

৪

রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন

বদন মিলায় ধয়ল মুখ মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল
পীবি অমিও মকরন্দা॥ ৩৭

৫

সখী সং নায়িকা বচন

সমদ্র ঐসনি নিসি ন পারিঅ ওরে।
কখন উগত মোর হিত ভয় সূরে॥ ৩৮

৬

নায়ক ও মুগ্ধা নায়িকা মিলন

মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী।
লোভিত মধুকর কৌসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী॥
...
আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলিক নামে॥
...
চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি
মেদনি দেল উপেখে।
...
এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দু পুনি তীনি ন হোঈ।
কুচ জুগ পাঁচ পাঁচ শশি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঈ॥
আকুল অলপ বেয়াকুল লোচন
আঁতর পুরল নীরে।
মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিশি ফীরে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
জামিনি জিব দয় গেলী॥ ২৯

৭

সখী সঁ নায়িকা বচন

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলহুঁ তনিকর অন্তে॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তেঁ তরু রহলি ছপাঈ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তেঁ হম পরম অন্যাঈ॥
জেঁতাহিঁ নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তেঁহি অধর করু দংশে॥

লেলি ভরল কুম্ভ তেঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ উর্ধ শ্বাস ন বাকে ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জনু হোঈ ॥ ৩৯

৮

ননদি সঁ নায়িকা বচন

ননদী সরূপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার ব্যভিচার বুঝৈবহ
সাসু করয়বহ রোসে ॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
করয় চাহলি অবতংসে।
রোষ কোষ সঁ মধুকর ধাওল
তেঁহি অধর করু দংশে ॥
সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু
হেরি নহি সকলহু আগু।
সাঁকর বাট উবটি হম চললহু
তেঁ কুচ কণ্টক লাগু ॥
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহি থাকয়
তেঁও খসল কেশ পাসে।
সখি জন সঁ হম পাছু পড়লহু
তেঁ ভেল দীর্ঘ নিশাসে ॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
তাঁথিহু উতর হম দেলা।
অমরখ তাহি ধৈরজ নহি রহলৈ
তেঁ গদ গদ সুর ভেলা ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু বর জউবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ।
ননদী সঁ রস রীতি বচাওব
গুপুত বেকত নহি হোঈ ॥ ৪০

৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

একহি নগর বসু মাধব সজনী
পর ভাবিনি বস ভেল।

অভিনব এক কমল ফুল সজনী·
দোনা নীমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখাএল সজনী
রসময় ফুলল নেত্রার।
বিধি বস আজ আএল ছথি সজনী
এত দিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহিঁ পতিআয়॥ ৪৩

১০

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

লোচন অরুণ বুঝল বড় ভেদ।
রৈনি উজাগরি গরুঅ নিবেদ॥
ততহিঁ জাহ হরি ন করহ লাথ।
রৈনি গমৌলহ জনিকেঁ সাথ॥
কুচ কুঙ্কুম মাখল হিঅ তোর।
জনি অনুরাগ রাগি কর গোর॥
আনক ভূষণ লাগল অঙ্গ।
উকুতি বেকত হোঅ আনক সঙ্গ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বজবহু বাধ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ॥ ৪৪

১১

নায়িকা সঁ দূতি বচন

কমল ভ্রমর জগ অছএ অনেক।
সভ তঁহ সে বড় জাহি বিবেক॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার।
অবসর থোড়হু বহুত উপকার॥
মধু নহিঁ দেলহ রহলি কি থাগি।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি॥
অতি অতিশয় ওলনা তুঅ দেল।
জাব জীব অনুতাপক ভেল॥
তোহেঁ নহিঁ মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভলো মন্দ হোঅ মন্দ সমাজ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দূতি কহ গোএ।
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নহিঁ হোএ॥ ৪৫

১২

নায়িকাক প্রতি সখিক প্রবোধন

ধন জৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরঙ্গে॥
সুঘটিত বিহ বিঘটাবে।
বাঁক বিধাতা কী ন কবাবে॥
ঈও ভল নহি রীতী।
হঠেঁ ন করিঅ দূরি পূরুব পিরীতি॥
সচ কিত হেরয় আসা
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা॥
নয়ন তেজয় জল ধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা॥
জকরা জাঁস রীতি।
দূরহুক দূর গেলেঁ দো গুন পিরীতি॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে॥ ৪৬

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহথি উদেস॥
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস॥
কান কুণ্ডল হাথ গোল।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন পিয়া হসি বোল॥
একহিঁ বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেস গেল॥ ৪৭

১৪

নায়িকা কৃত স্বদুখ বর্ণন

এক দিন ছলি নব রীতি রে।
জল মিন জেহন পিরীতি রে॥
একহিঁ বচন ভেল বীচ রে।
হসি পহু উতরো ন দেল রে॥
একহিঁ পলঙ্গ পর কান্‌হ রে।
মোর লেখ দূর দেশ ভান রে॥

জাহি বন সিকিও ন ডোল রে।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে॥
ধরব জোগিনিআক ভেস রে।
করব মে পহুক উদেস রে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন করে নিদান রে॥ ৪৮

১৫

পরকীয়া নায়িকা সং নায়ক বচন

পূর্বক প্রেম ঐলহু তুঅ হেরি।
হমরা অবৈত বৈসলি মুখ ফেরি॥
পহিল বচন উতরো নহি দেলি।
নৈন কটাক্ষ সং জিব হরি লেলি॥
তুঅ শশিমুখি ধনি ন করিঅ মান।
হমহু ভ্রমর অতি বিকল পরান॥
আস দেই ফেরি ন করিঐ নিরাসে।
হোহু প্রসন হে পুরহ মোর আসে॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু পরমানে।
দুহু মন উপজল বিরহক বানে॥ ৪৯

১৬

নায়িকা সং নায়ক বচন

মানিনি আব উচিত নহি মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগাইছি
জাগল পয় পচোবান॥
জুড়ি রইনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহি আন।
এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহি হোএ সে জান॥
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
জেকর অধর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওলি
ভূখল তুঅ জজমান॥
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ শম্ভু নিরমান।
আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি
করু ধনি সরবস দান॥
দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ৫০

১৭

নায়িকা বিলাপ

মাধব ঈ নহি॰ উচিত বিচারে।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি
সে কিঅ করু ব্যভচারে॥
প্রাণহু তাহি অধিক কয় মানব
হৃদয়ক হার সমানে।
কোন পরিযুক্তি আন কৈ॰ তাকব
কী থিক হুনক গেআনে॥
কৃপিন পুরুখ কৈ॰ কেও নহি॰ নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।
নিজ ধন অছৈতি নৈ উপভোগব
কেবল পরহিক আসে॥
ভনহি॰ বিদ্যাপতি সুনু মথুরাপতি
ঈ থিক অনুচিত কাজে।
মাঁগি লাএব বিত সে যদি হোয় নিত
অপন করব কোন কাজে॥ ৫১

১৮

হরি স॰ নায়িকা বচন

আজু পরল মোহি কোন অপরাধে।
কিঅ ন হেরিঐ হরি লোচন আধে॥
আন দিন গহি গুম লাৰিঅ গেহা।
বহু বিধি বচন বুঝাএব নেহা॥
মন দৈ রুসি রহল পহু সোঈ।
পুরখক হৃদয় এহন নহি॰ হোঈ॥
ভনহি॰ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান॥ ৫২

১৯

সখী স॰ নায়িকা বচন

মাধব কি কহব তিহরো গেআনে।
সুপহু কহলি জব রোস কয়ল তব
কর মুনল দুহু কানে॥
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তে॰ কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন কয়মহিন হম সনি কে ধনি
কর স॰ পরসমনি গেলা॥

জোঁ হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধী।
কৌসল করতল বাহুঁ লতা লয়
দৃঢ় কয় রাখিতহুঁ বাঁধী॥
ই সুমিরিঐ জব জং ন মরিঐ তব
বুঝি পড় হৃদয় পথানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরু
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥ ৫৩

২০

সখী সং নায়িকা বচন

কি কহব আহে সখি নিঅ অগেআনে।
সগরো রইনি গমাওলি মানে॥
জখন হমর মন পরসন ভেলা।
দারুণ অরুণ তখন উগি গেলা॥
গুরু জন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হম আকুল ভেলী॥
অধিক চতুরপন ভেলহুঁ অজ্ঞানী।
লাভক লোভ মুরহু ভেল হানী॥
ভনহিং বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহিং রোসে॥ ৫৪

২১

নায়িকা-কৃত স্বদুখ বর্ণন

মাধব তোঁ হে জনি জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ রভস লয় জৈবহ
লৈবহ কোন সনেসে॥
বনহিং গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হিরা মনি মানিক একো নহিং মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও ন ভেল পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কৈসে পুরত মন মোরা॥
পহু সঙ্গ কামিনি বহুত সোহাগিনি
চন্দ্র নিকট জৈসে তারা।
ভনহিং বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
অপন হৃদয় ধরু সারা॥ ৫৫

২২

নায়িকা বিরহ

মোহি তেজি পিআ মোর গেলাহ বিদেশ।
কৌনি পর খেপব বারি বএস॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস॥
সুমরি সুমরি চিত নহী রহে থীর।
মদন দহন তন দগধ শরীর॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কী করত নাহ দৈব ভেল বাম॥ ৫৬

২৩

নায়িকা বিরহ

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল॥
উঠলি চিহায় বৈসলি সির নায়।
চহু দিস হেরি হেরি রহলি লজায়॥
নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥ ৫৭

২৪

নায়িকা বিরহ

মাধব হমর রটল দুর দেস।
কেও ন কহে সখি কুশল সনেস॥
জুগ জুগ জিবথু বসথু লখ কোস।
হমর অভাগ হুনক কোন দোস॥
হমর করম ভেল বিহ বিপরীত।
তেজলনুহি মাধব পুরবিল প্রীত॥
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুখ কেঁ আন নহিঁ জান॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম॥ ৫৮

২৫

নায়িকা বিরহ

মন পরবস ভেল পরদেস নাহ।
দেখি নিশাকর তন উঠ ধাহ॥
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেশ কন্ত॥
সুমরি সনেহ গেহ নহি আব।
দারুন দাদুরে কোকিল রাব॥
সসরি সসরি খসু নিবিবন আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝু নৃপ রাঘব নব পচোবান॥ ৬১

২৬

নায়িকা বিরহ

প্রথম একাদস দৈ পহু গেল।
সেহো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল।
রতি অবতার বয়স মোর ভেল।
তৈও নহি পহু মোর দরসন দেল॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুন সব জোর॥
চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ।
চানন লাগ বিথম সর সোএ॥
ভনহি বিদ্যাপতি গুনবতি নারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি॥ ৬২

২৭

উধব স গোপী বচন

চানন ভেল বিথম সর রে
ভূখন ভেল ভারী।
সপনহু হরি নহি আএল রে
গোকুল গিরধারী॥
একসর ঠাঢ়ি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী॥
জাহু জাহু তোঁহে উধব হে,
তোঁ হে মধুপুর জাহে।
চন্দ্র বদন নহি জীউতি রে
বধ লাগত কাহে॥

ভনহি' বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুনমতি নারি।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝটঝারি॥ ৬৪

২৮

সখী স' নায়িকা বচন

গগন গরজি ঘন ঘোর
(হে সখি) কখন আওত পহু মোর॥
উগলন্হি পাঁচোবান
(হে সখি) অব ন বচত মোর প্রান॥
করব কওন পরকার
(হে সখি) জোবন ভেল জিব কাল॥ ৬৫

২৯

নায়িকা বিরহ

মাধব মাস তীথি ছল মাধব
অবধ করিএ পহু গেলা।
কুচ জুগ সম্ভু পরসি হসি কহলন্হি
তে' পরতীতি মোহি ভেলা॥
অবধি ওর ভেল সময় বেআপিত
জীবন বহি গেল আসে।
তখনুক বিরহ জুবতি নহি' জীউতি
কি করত মাধব মাসে॥
ছন ছন কয় ক' দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কয় বরখ গমাওলি
আব জিবন কোন আসে॥
আম মজর ধরু মন মোর গহবর
কোকিল সবদ ভেল মন্দা।
এহন বএস তেজি পহু পরদেস গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা॥
কুমকুম চানন আগি লগাওল
কেও কহে সীতল চন্দা।
পহু পরদেস অনেক কে' রাখথি
বিপতি চিন্হিঐ ভল মন্দা॥ ৬৬

৩০

সখী সং নায়িকা বচন

মোহন মধুপুর বাস
(হে সখি) হমহু জাএব তনি পাস॥
রখলন্হি কুবজাক নেহ
(হে সখি) তেজলন্হি হমরো সনেহ॥
কত দিন তাকব বাট
(হে সখি) রটলা জমুনাক ঘাট॥
ওতহি রহথু দৃঢ় ফেরি
(হে সখি) দরসন দেথু এক বেরি॥ ৬৮

৩১

সখী সং নায়িকা বচন

আস লতা [হম] লগাওলি সজনী
নৈনক নীর পটায়।
সে ফল অব তরুণত ভেল সজনী
আঁচর তর ন সমায়॥
কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনী
তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরুণত ভেল সজনী
পহু মন ন করু গেআন॥
সভ কের পহু পরদেস বসি সজনী
আএল সুমিরি সিনেহ।
হমর এহন পহু নিরদয় সজনী
নহিং মন বাঢ়য় নেহ॥ ৬৯

৩২

সখী সং নায়িকা বচন

কোন গুন পহু পরবস ভেল সজনী
বুঝলি তনিক ভল মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনী
দেহ দহয় নিশি চন্দ॥
কহ ও পিশুন শত অবগুন সজনী
তনি সম মোহি নহিং আন।
কতেক জতন সং মেটাবিঅ সজনী
মেটয় ন রেখ পখান॥
জং দুরজন কটু ভাখয় সজনী
মোর মন ন হোঅ বিরাম।

অনুভব রাহু পরাভব সজনী
হরিন ন তেজ হিম ধাম॥
জইও তরণি জল শোখয় সজনী
কমল ন তেজয় পাঁক।
জে জন রতল জাহি সঁ সজনী
কি করত বিহ ভয় বাঁক॥ ৭৫

৩৩

নায়িকা বচন পথিক সঁ

পিআ মোর বালক হম তরুণী।
কোন তপ চুকলোঁহ ভেলোঁহ জননী॥
পহির লেলি সখি এক দছিনক চীর।
পিআ কেঁ দেখৈতি মোর দগধ শরীর॥
পিআ লেলি গোদ কঁ চললি বজার।
হটিআক লোগ পুছে কে লাগু তোহার॥
নহিঁ মোর দেওর কি নহিঁ ছোট ভাঈ।
পুরব লিখল ছল স্বামী হমার॥
বাট রে বটোহিআ কি তোঁহী মোর ভাঈ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনে' জাহু॥
কহিহুন ববা কিনয় ধেনু গাঈ।
দুধবা পিলায় কঁ পোসত জমাঈ॥
নহিঁ মোরা টকা অছি নহিঁ ধেনু গাঈ।
কৌনে বিধি পোসব বালক জমাঈ॥ ৭৯

৩৪

পরকীয়া নায়িকা ও নায়ক সঁ প্রত্যুত্তর

সুন্দরি হে তোঁ সুবুধি সেআনি।
মরী পিআস পিআবহু পানি॥
কে তোঁ থিকাহ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহিঁ দেব পিঢ়ি পানী॥
থিকহুঁ পথুকজন রাজ কুমার।
ধনিক বিওগে ভরমি সংসার॥
আবহ বৈসহ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ সে দেব আনি॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস॥
সাসু ঘর আন্হরি নৈন নহিঁ সুঝ।
বালক মোর বচন নহিঁ বুঝ॥ ৮০

৩৫

মৈনা কৃত শিব বর্ণন

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তনিকাঁ কেহন বিবাহ।
সে অব করব গোরী বর
ঈ হোএ কতয় নিবাহ॥
কতয় ভবন কত আগন
বাপ কতয় কত মাএ।
কতহু ঠওর নহি ঠেহর
কেকর এহন জমাএ॥
কোন কয়ল এহ অসুজন
কেও ন হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধৃক থিক সে পজিআর॥
কুল পরিবার একো নহি জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোএ তন
কে সহে হৃদয়ক সাল॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধরহু মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহী
তনিকাঁ সেহ পৈ নাহ॥ ৮১

সংস্কৃত গুরুমুখী ও মরাঠী

১

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকামং।
হিণ্ডীরপাণ্ডররুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে॥
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্‌বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশংখচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে॥

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৮ শক

২

গগন মৈ থালু রবি-চন্দু দীপক বনে।
তারিকামণ্ডল জনক মোতী॥
ধূপু মলআনলো পবণু চবরো করে।
সগল বনরাই ফুলন্ত জোতী॥

কৈসী আরতী হোই
ভবখণ্ডনা তেরী আরতী।
অনহতা সবদ বাজন্ত ভেরী॥

—নানক : গুরুগ্রন্থসাহেব

৩

কই তো দিবস দেখেন মী ডোলা
কল্যাণ মঙ্গলামঙ্গলাচে॥
আয়ুষ্যাচ্যা শেরটী পায়াসবে ভেটী।
কলিবরে তুটী জাল্যা স্বরে॥
সরো হে সঞ্চিত পদবীচা গোরা
উতাবীল দেবা মন জালে॥
পাউল্যাপাউলী করিতাঁ বিচার।
অনন্ত বিকার চিন্তা অঙ্গী॥
ম্হণউনি ভয়াভীত হোতো জীব।
ভাকিতসে কীব অট্টহাসে॥
তুকা ম্হণে হোইল আইকিলে কানী।
তরী চক্রপাণী ধাঁব ঘালা॥
দুঃখাচ্যা উত্তরী আলাবিলে পায়।
পাহাণ তে কায় অজুন অন্ত॥

—তুকারাম

পরিশিষ্ট ৪

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
 চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
 লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
 পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
 আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
 দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক-সিংহদুয়ারে
 জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজসভাসদ
 তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
 মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর।
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
 হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?
ছেড়েছি ধরম, তা ব'লে ধরম
 ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই।
নাহিক করম, লজ্জা শরম,
 জানি নে জনমে সতীর প্রথা—
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
 ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা?

সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
 অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী—
 সে কি নগরীর নাট্যশালা?
মনে হল সেথা অন্তরগ্লানি
 বুকের বাহিরে বাহিরি আসে।
ওগো বনভূমি, মোরে ঢাকো তুমি
 নবনির্মল শ্যামল বাসে।
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ,
 লজ্জিত জনে করুণা ক'রে
তোমার সহজ অমলতাখানি
 শতপাকে ঘেরি পরাও মোরে।

হোথায় আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের পীত আলোক-জ্বালা,
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা।
রতননিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,
মদির-শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে।
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদ-রাতের—
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে।
তবু তবু ওগো কুসুমভগিনী,
এবার বুঝিতে পেরেছি মনে,
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব-অচলে উষার মতো,
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।
মনে হল মোর নবজনমের
উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি।

তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
পঞ্চম সুরে ধরিল গান—
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনি-বালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজলতলে বাজিল শিলা—
ভগবান ভানু রক্তনয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশু-সম
　　চাহিল কুমার কৌতূহলে,
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
　　পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তিকিরণ
　　দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
　　হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
　　দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি,
বন্দনাগান রচিলা কুমার
　　জোড় করি করকমল দুটি।
করুণ কিশোর কোকিলকণ্ঠে
　　সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন
　　পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
　　হয় নি রচিত নারীর তরে.
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
　　নির্জন গিরিশিখর-'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
　　নীল নির্বাক্ সিন্ধুতলে—
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
　　শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
　　অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
　　ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।

ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
　　করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি,
কহিনু, "হে মোর প্রভু তপোধন,
　　চরণে আগত অধম দাসী।"
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
　　মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি বসি যুগল চরণ
　　মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
　　ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো,
তাপসকুমার চাহিলা, আমার
　　মুখপানে করি বদন নত।

প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
　　সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
　　বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
　　সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
　　উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
　　কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রে
　　বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
　　"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃতসরস,
　　তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"
হেসো না মন্ত্রী, হেসো না, হেসো না,
　　ব্যথায় বিঁধো না ছুরির ধার,
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
　　অবমান তুমি কোরো না আর।
মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
　　স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
　　শুনি নি এমন সত্যবাণী।
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
　　স্পর্ধা আমার কভু এ নহে,
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
　　ঋষির রসনা মিছে না কহে।
বৃদ্ধ, বিষয়বিষজর্জর,
　　হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,
নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে,
　　আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
　　এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃতসরস আমার পরশ,
　　আমার নয়নে দিব্য বিভা।
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
　　মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
　　আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ,
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
বহুদিন মোর প্রমোদনিশীথে
যত শত দীপ জ্বলিয়াছিল—
দূর হতে দূরে—এক নিশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল।
প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।
মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি,
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক্‌।
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্মে ফিরায়ে নিক।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি,
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারি দিক হতে ঘেরিল আসি।

বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি—
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস,
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি।
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না, নিয়ো না
হে মোর অনল, তপের নিধি,
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি।
ধিক্ রমণীরে ধিক্ শত বার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্।
রমণীজাতির ধিক্কার-গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।
ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্না-লতিকা-সমা
কহিনু তাপসে, "পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি।"
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে,
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি।"
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি।
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,
"আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা।
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।

দাও মোর হাতে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি?
নাহয় দেবতা আমাতে নাই—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে তো তাই।
এক দিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন?
পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা।
দেবতার লীলা করি সমাপন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা।
হাসো হাসো তুমি হে রাজমন্ত্রী,
লয়ে আপনার অহংকার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা,
ফিরে লও তব পুরস্কার।
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে।
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ, স্মরণ ক'রে—
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।

৯ কার্তিক ১৩০৪

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়; সেইমতো বনানীর ছায়ে

স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্‌বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগতরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত,
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তার উদ্দেশ—
তরুণগরুড়সম কী মহৎক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি-'পরে।
নমস্কার করি কবি শুধাইলা সঁপিয়া আসন,
"কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্ত্যে আগমন?"
নারদ কহিলা হাসি, "করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো—বোলো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহা সংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান।
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?'"

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য, অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জনগান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান;—সেইমতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত-উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিশ্বাস?
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি,
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ—
যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

ভগবন্‌, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা",
কহিলা বাল্মীকি, "তবু, নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্নহেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

পরিশিষ্ট ৫

ক-খ

রাজা রামমোহন রায়

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে
১৯৩৪

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নবউদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি মন্দির রচনা উপলক্ষে
২৪ ভাদ্র ১৩৪৫

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
১৩৪২

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তি শয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে, জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।
সে প্রার্থনা পুরায়েছ হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নব যুগসাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
১৩৪৫

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

জীবন-ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়
সংসার-যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা-আচ্ছাদনতলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।
নির্বিচল ছিলে সত্যে হে. নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য
১৩৪৪

স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁর মহিমা ঘোষিল নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়,
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়।

আশুতোষ স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন উপলক্ষে
১৯৩৪

আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্‌বরেষু

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্তধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্য রাজ্যের জাগরণ
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্‌বারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখী ডোর।

দ্বিসপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে
১৩৪২

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান।

পরলোকগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য
১৯২৫

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে।

দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
১৯৩৫

চার্লস এন্ডরুজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু চরণে তাঁর করি নমস্কার।

দীনবন্ধু এন্ডরুজের শান্তিনিকেতনে প্রথম যোগদান উপলক্ষে

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য
১৯৩৮

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৪
জগদীশচন্দ্র বসুর বিলাত প্রবাসকালে রচিত (১৯০০-০২?)

বরণ

সবাই যাহারে ভালোবেসেছিল
তারে তুমি কোল দিলে—
কারো ভালোবাসা পায় নি যে জন
তুমি তারে পরশিলে!
ইহসংসারে ভিখারীর মতো
বঞ্চিত ছিল যে জন সতত
করুণ হাতের মরণে তাহারে
বরণ করিয়া নিলে।
শিরে দিলে তার শীতল হস্ত,
ঘুচিল সকল জ্বালা।
তাপিত বক্ষে পরালে তাহার
জীবন-জুড়ানো মালা।
রাজা মহারাজ যেথা ছিল যারা
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া
নিলে তারে এ নিখিলে।

কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)

মাতৃবন্দনা

হে জননি, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ।

মাতঃ পুণ্যময়ী মাতৃভূমি
চিনায়ে দিয়েছ তুমি,
তোমা হতে জানিয়াছি নিখিল-মাতারে।
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি—
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে,
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।

জননি, তোমার মঙ্গল-মূর্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্তি
অমর্ত্য জগতে।
তোমার আশিসদৃষ্টি করিছে আলোকবৃষ্টি
সংসারের পথে।
তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন গো মোদের চিত্ত চরণে জোগায় নিত্য
কুসুমচন্দন।

...

হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে,
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে।
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে,
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে।
মোদের উৎসব-মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস।
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিস-করতল
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল।

...

ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ, মা, চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পূজাঞ্জলি।

আগমনী, ১৩২৬

আমার হৃদয়ে অতীতস্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জেলেছ, নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো—
এসেছি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-উপলক্ষে রচিত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কল্যাণীয়েষু

ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, "একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,
আমার বক্ষের স্নেহ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।"
হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমাগান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৪২

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার

ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী,
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি',
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার
ধর্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার॥

শান্তিনিকেতন
১৫ ভাদ্র ১৩৪২

কালীঘাটে পশুবলি বন্ধের জন্য অনশনব্রত-কালে অভিনন্দন

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারানী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দের তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা-হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ন।
তাহাদের চিঠি আন্‌মনাদের আসে জানালার পার্শ্বে,
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে— চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারি ছন্দে,
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্য,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা, কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা-অজানার মাঝখানটাতে নাংনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাফিসের বন্দী।
মর্ত্যের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু হাল খবরের অংশ,
হায় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন,
আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ
৫ আষাঢ় ১৩৪৫

মধুসন্ধায়ী

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পার'
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে,
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে।
ডাকযোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।
পদ্যশিখরের পানে কবি মধু-সখা
উড়েছিল মধুগন্ধে, গদ্য উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
প্রয়োজনে। দুরারোহ তব আসনের
ঠাঁই-বদলের আমি করিতেছি আশা,
সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা।

১১ মার্চ ১৯৪০

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত

কয়েক মাসের খেয়ালের খেতে
ফসল যা ফলেছিল
তখনো সেদিন গাঁয়ের বাহিরে
ধরণীর কোলে ছিল।
তুমি সঞ্চয় করি
আঁঠি বেঁধে দিয়ে ভরি নিলে খেয়াতরী।
ঘাটে এনে দিলে তারে
ব্যাপারী দলের দ্বারে।
কী পারানি দিয়ে পুরাব তোমার সাধ,
আমার দিনের শেষের কড়িতে
লহো এ আশীর্বাদ।

২৫ বৈশাখ ১৩৪৭

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে 'নবজাতক' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

হে বন্ধু নূতন ক'রে
আরোগ্যের স্বাদ দিলে মোরে
পুরাতন কাল হতে নূতন কী রস
আজি দিল সঙ্গের পরশ।
অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা,
তোমার বুদ্ধির বিচিত্রতা,
ভূয়ো দর্শনের তব দান
বন্ধুত্বেরে করে মূল্যবান।

নবোদিত প্রভাতে যেমন
শিখরে শিখরে হয় আলোর ক্রমশ পরশন
তেমনি আঁধার গুহা হতে
ফিরে যবে আসি মুক্ত সংসারের স্রোতে
জীবনের সার্থকতা একে একে নূতন আলোকে
ফিরে আসে চোখে।

৭ পৌষ ১৩৪৭

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে 'রোগশয্যায়' গ্রন্থ উপহারদানকালে লিখিত

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ওই যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

পরিশিষ্ট ৬

The Child

'What of the night?' they ask.
No answer comes.
For the blind Time gropes in a maze and knows not
its path or purpose.
The darkness in the valley stares like the dead
eye-sockets of a giant,
the clouds like a nightmare oppress the sky,
and the massive shadows lie scattered like the torn
limbs of the night.
A lurid glow waxes and wanes on the horizon,—
is it an ultimate threat from an alien star,
or an elemental hunger licking the sky?
Things are deliriously wild,
they are a noise whose grammar is a groan,
and words smothered out of shape and sense.
They are the refuse, the rejections, the fruitless failures
of life,
abrupt ruins of prodigal pride,—
fragments of a bridge over the oblivion of a vanished
stream,
godless shrines that shelter reptiles,
marble steps that lead to blankness.
Sudden tumults rise in the sky and wrestle
and a startled shudder runs along the sleepless
hours.
Are they from desperate floods
hammering against their cave walls,
or from some fanatic storms
whirling and howling incantations?
Are they the cry of an ancient forest
flinging up its hoarded fire in a last extravagant
suicide,
or screams of a paralytic crowd scourged by lunatics
blind and deaf?
Underneath the noisy terror a stealthy hum creeps up
like bubbling volcanic mud,

a mixture of sinister whispers, rumours and slanders, and hisses of derision.
The men gathered there are vague like torn pages of an epic.
Groping in groups or single, their torchlight tattoos their faces in chequered lines, in patterns of frightfulness.
The maniacs suddenly strike their neighbours on suspicion
and a hubbub of an indiscriminate fight bursts forth echoing from hill to hill.
The women weep and wail,
they cry that their children are lost in a wilderness of contrary paths with confusion at the end.
Others defiantly ribald shake with raucous laughter
their lascivious limbs unshrinkingly loud,
for they think that nothing matters.

There on the crest of the hill
stands the Man of faith amid the snow-white silence,
He scans the sky for some signal of light,
and when the clouds thicken and the nightbirds scream as they fly,
he cries, 'Brothers, despair not, for Man is great.'
But they never heed him,
for they believe that the elemental brute is eternal
and goodness in its depth is darkly cunning in deception.
When beaten and wounded they cry, 'Brother, where art thou?'
The answer comes, 'I am by your side.'—
But they cannot see in the dark
and they argue that the voice is of their own desperate desire,
that men are ever condemned to fight for phantoms in an interminable desert of mutual menace.

3

The clouds part, the morning star appears in the East,
a breath of relief springs up from the heart of the earth,
the murmur of leaves ripples along the forest path,
and the early bird sings.
'The time has come,' proclaims the Man of faith.
'The time for what?'
'For the pilgrimage.'
They sit and think, they know not the meaning,
and yet they seem to understand according to their desires.
The touch of the dawn goes deep into the soil
and life shivers along through the roots of all things.
'To the pilgrimage of fulfilment,' a small voice
whispers, nobody knows whence.
Taken up by the crowd
it swells into a mighty meaning.
Men raise their heads and look up,
women lift their arms in reverence,
children clap their hands and laugh.
The early glow of the sun shines like a golden garland
on the forehead of the Man of faith,
and they all cry: 'Brother, we salute thee!'

4

Men begin to gather from all quarters,
from across the seas, the mountains and pathless wastes,
They come from the valley of the Nile and the banks of the Ganges,
from the snow-sunk uplands of Thibet,
from high-walled cities of glittering towers,
from the dense dark tangle of savage wilderness.
Some walk, some ride on camels, horses and elephants,
on chariots with banners vieing with the clouds of dawn,
The priests of all creeds burn incense, chanting verses
as they go.

The monarchs march at the head of their armies,
lances flashing in the sun and drums beating loud.
Ragged beggars and courtiers pompously decorated,
agile young scholars and teachers burdened with
learned age jostle each other in the crowd.
Women come chatting and laughing,
mothers, maidens and brides,
with offerings of flowers and fruit,
sandal paste and scented water.
Mingled with them is the harlot,
shrill of voice and loud in tint and tinsel.
The gossip is there who secretly poisons the well
of human sympathy and chuckles.
The maimed and the cripple join the throng with the
blind and the sick,
the dissolute, the thief and the man who makes a
trade of his God for profit and mimics the
saint.
'The fulfilment!'
They dare not talk aloud,
but in their minds they magnify their own greed,
and dream of boundless power,
of unlimited impunity for pilfering and plunder,
and eternity of feast for their unclean gluttonous
flesh.

5

The Man of faith moves on along pitiless paths strewn
with flints over scorching sands and steep
mountainous tracks.
They follow him, the strong and the weak, the aged
and young,
the rulers of realms, the tillers of the soil.
Some grow weary and footsore, some angry and
suspicious.
They ask at every dragging step,
'How much further is the end?'
The Man of faith sings in answer;
they scowl and shake their fists and yet they cannot
resist him;

the pressure of the moving mass and indefinite
hope push them forward.'
They shorten their sleep and curtail their rest,
they out-vie each other in their speed,
they are ever afraid lest they may be too late for their
chance
while others be more fortunate.
The days pass,
the ever-receding horizon tempts them with renewed
lure of the unseen till they are sick.
Their faces harden, their curses grow louder and
louder.

6

It is night.
The travellers spread their mats on the ground
under the banyan tree.
A gust of wind blows out the lamp
and the darkness deepens like a sleep into a swoon.
Someone from the crowd suddenly stands up
and pointing to the leader with merciless finger
breaks out:
'False prophet, thou hast deceived us!'
Others take up the cry one by one,
women hiss their hatred and men growl.
At last one bolder than others suddenly deals him a
blow.
They cannot see his face, but fall upon him in a fury
of destruction
and hit him till he lies prone upon the ground his
life extinct.
The night is still, the sound of the distant waterfall
comes muffled,
and a faint breath of jasmine floats in the air.

7

The pilgrims are afraid.
The women begin to cry, the men in an agony of
wretchedness
shout at them to stop.

Dogs break out barking and are cruelly whipped into
silence broken by moans.
The night seems endless and men and women begin to
wrangle as to who among them was to blame.
They shriek and shout and as they are ready
to unsheathe their knives
the darkness pales, the morning light overflows
the mountain tops.
Suddenly they become still and gasp for breath as they
gaze at the figure lying dead.
The women sob out loud and men hide their faces in
their hands.
A few try to slink away unnoticed,
but their crime keeps them chained
to their victim.
They ask each other in bewilderment,
'Who will show us the path?'

The old man from the East bends his head and says:
'The Victim.'
They sit still and silent.
Again speaks the old man,
'We refused him in doubt, we killed him in anger,
now we shall accept him in love,
for in his death he lives in the life of us all, the
great Victim.'
And they all stand up and mingle their voices and sing,
'Victory to the Victim.'

8

'To the pilgrimage' calls the young,
'to love, to power, to knowledge, to wealth
overflowing,'
'We shall conquer the world and the world beyond
this,'
they all cry exultant in a thundering cataract of
voices,
The meaning is not the same to them all, but only the
impulse,
the moving confluence of wills that recks not death
and disaster.

No longer they ask for their way,
no more doubts are there to burden their minds
or weariness to clog their feet.
The spirit of the Leader is within them and ever
beyond them—
the Leader who has crossed death and all limits.
They travel over the fields where the seeds are sown,
by the granary where the harvest is gathered,
and across the barren soil where famine dwells
and skeletons cry for the return of their flesh.
They pass through populous cities humming with
life,
through dumb desolation hugging its ruined past,
and hovels for the unclad and unclean,
a mockery of home for the homeless.
They travel through long hours of the summer day,
and as the light wanes in the evening they ask
The man who reads the sky:
'Brother, is yonder the tower of our final hope
and peace?'
The wise man shakes his head and says:
'It is the last vanishing cloud of the sunset.'
'Friends,' exhorts the young, 'do not stop.
Through the night's blindness we must struggle
into the Kingdom of living light.'
They go on in the dark.
The road seems to know its own meaning
and dust underfoot dumbly speaks of direction.
The stars—celestial wayfarers—sing in silent chorus:
'Move on, comrades!'
In the air floats the voice of the Leader:
'The goal is nigh.'

9

The first flush of dawn glistens on the dew-dripping
leaves of the forest.
The man who reads the sky cries:
'Friends, we have come!'
They stop and look around.
On both sides of the road the corn is ripe to the
horizon,

—the glad golden answer of the earth to the
morning light.
The current of daily life moves slowly
between the village near the hill and the one
by the river bank.
The potter's wheel goes round, the woodcutter brings
fuel to the market,
the cow-herd takes his cattle to the pasture,
and the woman with the pitcher on her head
walks to the well.
But where is the King's castle, the mine of gold,
the secret book of magic,
the sage who knows love's utter wisdom?
'The stars cannot be wrong,' assures the reader of the sky.
'Their signal points to that spot.'
And reverently he walks to a wayside spring
from which wells up a stream of water, a liquid light,
like the morning melting into a chorus of tears
and laughter.
Near it in a palm grove surrounded by a strange hush
stands a leaf-thatched hut,
at whose portal sits the poet of the unknown shore, and
sings:
'Mother, open the gate!'

10

A ray of morning sun strikes aslant at the door.
The assembled crowd feel in their blood the primaeval
chant of creation:
'Mother, open the gate!'
The gate opens.
The mother is seated on a straw bed with the babe on
her lap,
Like the dawn with the morning star.
The sun's ray that was waiting at the door outside
falls on the head of the child.
The poet strikes his lute and sings out:
'Victory to Man, the new-born, the ever-living.'
They kneel down,— the king and the beggar, the saint
and the sinner,

the wise and the fool,— and cry:
'Victory to Man, the new-born, the ever-living.'
The old man from the East murmurs to himself:
'I have seen!'

—

শিরোনাম-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ — পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

—

কয়েকটি বিশেষ মুদ্রণপ্রমাদের উল্লেখ

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০	১৯	মুখর	মুখের

তৃতীয় খণ্ড

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	২০	..ও জানে।	..ও জানে না।
৩৬	২৫	কথা	ক্বথা
৭৯	২৯	আকাশের	আকাশে
১২৯	২৮	আজিকাল	আজিকার
১৫৮	১৮	জলৎ-ধারা	জ্বলৎ-ধারা
২১৮	৩০	প্রাচীকে	প্রাচীনকে
২৬৫	১৫	খাকে	থাকে
৩৩৬	১০	মণিখানির	মণিখনির
৩৪৩	৮	নিত্য যে	নিত্য যেন
৯১২	২৬	সনাতম্	সনাতনম্
১০৩৫	১	মানব	মানস

Rabindra-Rachanavali, Tritiya Khanda, Kavita: Collected Works of Rabindranath Tagore (1861-1941), Volume Three, Poems, Government of West Bengal, Calcutta, 1983.
25 cm. × 16 cm.; pp. [12] + 1348; 13 Illustrations.